হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

১৪

সূচিপত্র

রাত্রির যাত্রী

॥ এক ॥

রাত্রির যাত্রী

আমি খবরের কাগজের এই খবরটি পড়ে শোনালুম:

বিচিত্র হত্যাকাণ্ড!

'যুদ্ধ বাধিয়াছে ইউরোপে, অন্ধকারে ভুগিতেছে কলিকাতা নগরী।

কালা আদমির দেশে আসিয়াছে কালো অন্ধকার, বলিবার কথা কিছুই নাই।

রাত্রে এখানে গ্যাসের আলোকস্তম্ভগুলো একেবারে না নিবিয়া রাজধানীর মুখরক্ষা নিজেদের নামরক্ষা করে বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় পথিকদের হইতে প্রায়-প্রাণান্ত।

নগর-পিতারা যেটুকু আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার সাহায্যে অন্ধকারকে আর ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে যেসব মারাত্ম রহস্য আত্মগোপন করিয়া থাকে, চর্মচক্ষু তাহাদের আবিষ্কার করিতে পারে না।

অলিগলিগুলো হইয়া উঠিয়াছে অধিকতর ভয়াবহ। কলিকাতায় বড়ো বড়ো রাজপ আছে গুটি-কয়েক; কিন্তু অলিগলির সংখ্যা হয় না। এখানকার গ্যাসপোস্টগুলোর প্রধা কর্তব্য যেন, আলোককে ব্যঙ্গ করা। একটা দেশলাইয়ের কাঠির মুখে যতটুকু আলো ধ তাদের সম্বল তার বেশি নয়। গলির গ্যাসপোস্টগুলো যেন পূর্ণগ্রহণের চাঁদের ভূমিকা অভিনয় করিতে চায়।

এই বিভীষিকাময় ছায়া-মায়ার মধ্যে কলিকাতা শহরে বেড়াইতে আসিয়াছে এক বিভীষ রাত্রির যাত্রী! তার নাম-ধাম কেহ জানে না, ঘটনাস্থলে সে রাখিয়া যায় কেবল এক-একট রক্তাক্ত মৃতদেহ এবং একখানা করিয়া অত্যাশ্চর্য visiting card!

গত ২১শে জুলাই তারিখে প্রথম ঘটনাটি ঘটে।

ডাক্তার মোহিনীমোহন দত্ত রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে রোগী দেখিবার জন্য 'ফোন বিশেষভাবে আহূত হন। রোগীর ঠিকানা ছিল ২৫ নং বিশু বসুর লেনে। অত রা মোহিনীবাবু প্রথমে বাহিরে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। তখন তাঁহাকে ডবল ভিজিটের লো দেখানো হয়।

বিশু বসুর লেনের মুখে গিয়া মোহিনীবাবু নিজের মোটর হইতে নামিয়া পড়েন, কার গলির ভিতরে গাড়ি ঢুকে না। 'ব্ল্যাক আউটে'র মহিমায় কলিকাতার বড়ো রাস্তাতে আজকাল পথিক দুর্লভ, সুতরাং বিশু বসুর লেনের মতো ছোটো গলি যে অত রা জনশূন্য ছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর কী ঘটে, স্বচক্ষে কেহ তাহা দেখে নাই।

ঘণ্টাদুয়েক অপেক্ষা করিবার পর মোহিনীবাবুর ড্রাইভার তাহার মনিবের খোঁজে গলির ভিতরে প্রবেশ করে। এবং খানিক দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিতে পায় মোহিনীবাবুর মৃতদেহ।

তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল পথের উপরেই। তাঁহার বক্ষের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত।

এবং সব-চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হইতেছে, লাশের পাশেই পাওয়া গিয়াছে একখানা তাসের পাঞ্জা! তাহার পাঁচটা ফোঁটার মধ্যে একটা ফোঁটা ছুরি দিয়া কাটিয়া লওয়া হইয়াছে!

পুলিশ খোঁজ লইয়া জানিয়াছে যে, বিশু বসুর লেনের মধ্যে কুড়ির বেশি বাড়ির নম্বর নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে ২৮শে জুলাই তারিখে।

এই রাত্রেও ১টার সময়ে ডাক্তার এন. বসু 'ফোনে' এক জরুরি ডাক পান। ডাক আসে ৩০ নং মণিলাল মিত্রের লেন হইতে। এই গলিটিও অত্যন্ত সংকীর্ণ—দুইজন মানুষ পাশাপাশি চলিতে পারে না।

এখানেও হইয়াছে একই-রকম সাংঘাতিক দৃশ্যের অভিনয়।

ডাক্তার বসুর ফিরিতে অসম্ভব বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার মোটরচালক গলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং পথের উপরে আবিষ্কার করে প্রভুর মৃতদেহ! তাঁহারও বক্ষের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত এবং দেহের নিকটে পাওয়া গিয়াছে একখানা তাসের পাঞ্জা!

নূতনত্বের মধ্যে কেবল এই যে, এবারে তাসের পাঁচ ফোঁটার মধ্যে দুইটি ফোঁটা ছুরি দিয়া কাটিয়া লওয়া হইয়াছে!

এবারেও পুলিশের খোঁজে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মণি মিত্রের লেনে ৩০ নম্বরের বাড়ি নাই।

এই দুইটি অদ্ভুত হত্যার মধ্যে যে-সকল সাদৃশ্য আছে, তাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। দুইজন হত ব্যক্তিই চিকিৎসক, দুইজনেই আহূত হইয়াছেন 'ফোনে', মধ্য রাত্রে এবং এমন এক নম্বরের বাড়িতে যাহার অস্তিত্ব নাই! দুই বারেই হত ব্যক্তির দেহের পাশে বা কাছে পাওয়া গিয়াছে তাসের পাঞ্জা!

ইহা যে একই হত্যাকারীর কীর্তি, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উপরি উপরি দুই চিকিৎসককে হত্যা করা হইল কেন? পুলিশের তদন্তে জানা গিয়াছে যে, হত ব্যক্তিদের কোনও শত্রু নাই এবং তাঁহাদের মৃত্যুতে কাহারও লাভবান হইবারও সম্ভাবনা নাই। মৃত ব্যক্তিদের কাছ হইতে কোনও মূল্যবান দ্রব্য বা টাকার ব্যাগও চুরি যায় নাই—সুতরাং চুরি বা রাহাজানিও হত্যার উদ্দেশ্য নহে।

আর এক প্রশ্ন: দুই বারেই ঘটনাস্থলে তাসের পাঞ্জা পাওয়া গিয়াছে কেন? এবং প্রথম বারে একটা ফোঁটা ও দ্বিতীয় বারে দুইটা ফোঁটাই বা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে কেন?

পুলিশ এ সব প্রশ্নের কোনওই সদুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না।'

ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় শ্রবণ করছিল হেমন্ত।

শখের গোয়েন্দা হেমন্তের পরিচয় এখানে নূতন করে দেবার দরকার নেই। যাঁরা এখনও তাকে চেনেন না, তাঁরা 'অন্ধকারের বন্ধু' নামে উপন্যাস পাঠ করতে পারেন।*

আমার পড়া শেষ হল। কিন্তু হেমন্ত কোনও কথা কইলে না, কেবল দুই চোখ মুদে ফেললে।

আমি বললুম, 'কী হে, এই একটু আগেই তুমি অভিযোগ করেছিলে যে, খবরের কাগজে কোনও খবরের মতন খবর পাওয়া যায় না। এ ঘটনা দুটোও কি উল্লেখযোগ্য নয়?'

হেমন্ত চোখ খুলে ধীরে ধীরে বললে, 'হ্যাঁ, উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আলোচনাযোগ্য নয়।'

—'কেন?'

—'খবরের কাগজের রিপোর্টের ভিতরে থাকে পাঠকদের সময় কাটাবার উপাদান। আর আসল সূত্র থাকে পুলিশের হাতে। মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী, তার চেয়ে এসো বন্ধু, এক চাল দাবা খেলা যাক।'

॥ দুই ॥
তাসের তৃতীয় পাঞ্জা

সেদিনও চলছে আমাদের চিরন্তন দাবা খেলা।

আমি রোজ সকালেই হেমন্তের বাড়িতে এসে চা পান করতুম। তারপর আমাদের মধ্যে সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা চলত। তারপরেই শুরু হত খেলা। হেমন্ত তাস খেলাকে ঘৃণা করত। বলত, 'ও হচ্ছে মেয়েলি খেলা!'

সেদিন আমার বোড়ের চালে হেমন্তের দাবা যখন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, তখন হঠাৎ মধু চাকর এসে খবর দিলে, 'এক দঙ্গল পুলিশের লোক এসেছে।'

হেমন্ত একমনে দাবাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেবার উপায়-চিন্তা করতে করতে বললে, 'হ্যাঁ, তাদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে বই কি!'

এই অসংলগ্ন কথা শুনে মধু হতভম্বের মতন মুখ করে বললে, 'কী বললেন বাবু?'

আমি হো হো করে হেসে উঠে বললুম, 'ওহে কাদের সাপওয়ালা, দাবাকে ছেড়ে মধুর কথা ভালো করে শোনো! তুমি কাদের জন্যে জলখাবারের আয়োজন করতে বলছ?'

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, 'ওই যে, মধু বললে না, কারা এসেছে? সকালবেলায় বাড়িতে অতিথি এলে শুধু-মুখে ফিরিয়ে দিতে নেই!'

আমি আরও জোরে অট্টহাস্য করে বললুম, 'মধু কী বলছে জানো? এক দঙ্গল পুলিশের লোক এসেছে।'

বিপদগ্রস্ত দাবার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমন্ত বললে, 'পুলিশ? কেন?'

মধু বললে, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

---

*হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর একাদশ খণ্ড দেখুন।

খেলায় বাধা পড়ল বলে একটু বিরক্ত স্বরে হেমন্ত বললে, 'কে দেখা করতে চায়, নিয়ে আয়।'

ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন ধড়াচূড়াপরা একটি সুদীর্ঘ ভদ্রলোক। মুখে হামবড়াই ভাব। সুবৃহৎ ভুঁড়ি। তাঁকে আমি কোনওদিন দেখিনি, তবে পোশাক দেখে বুঝলুম, তিনি কোনও থানার ইনস্পেকটার।

হেমন্ত মৃদু হেসে বললে, 'আসুন, নমস্কার। আপনি ভূপতিবাবু তো? আপনাকে বোধহয় ইনস্পেকটার সতীশবাবুর সঙ্গে দেখেছি?'

—'আমাকে ভোলেননি বলে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সতীশবাবুর পরামর্শেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'আমার এ সৌভাগ্যের কারণ কী?'

—'ডাক্তার এম সি বিশ্বাসকে কাল রাত্রে কে বা কারা খুন করে গেছে।'

হেমন্ত সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বলেন কী, আবার ডাক্তার খুন!'

ভূপতিবাবু বললেন, 'কেবল খুন নয়, এবারে আবার পাওয়া গিয়েছে সেই অদ্ভুত তাসের পাঞ্জা, তার তিনটে ফোঁটা কাটা!'

হেমন্ত কিছু বললে না, গুম হয়ে কী ভাবতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এবারেও কি ফোনেই ডাক্তার বিশ্বাসকে ডাকা হয়েছিল?'

—'না, হত্যাকারী এবারে পদ্ধতি বদলেছে। সে নিজেই গাড়ি নিয়ে ডাক্তার বিশ্বাসকে ডাকতে এসেছিল।'

হেমন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারী নির্বোধ নয়। সে জানে, বার বার একই পদ্ধতিতে কাজ করলে তাকে ধরা পড়তে হবে।....আচ্ছা ভূপতিবাবু, সব কথা আমাকে সংক্ষেপে বলতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

ভূপতিবাবু বললেন, 'আপত্তি কী মশাই, আমি তো আপনার কাছেই সাহায্য-ভিক্ষা করতে এসেছি!'

'আপনারা হচ্ছেন পাকা রুই-কাতলা-জাতীয় পুলিশ কর্মচারী। আমার মতন চুনোপুঁটির কাছ থেকে আপনারা কী আশা করেন?'

ভূপতিবাবু ডান হাত তুলে তাঁর ঝুলে-পড়া লম্বা গোঁফের প্রান্তে একবার মোচড় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা হচ্ছি পেশাদার পুলিশ, শখের গোয়েন্দাদের চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার মূল্য যে বেশি, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই। তবে কিনা, ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীও শ্রীরামচন্দ্রের সেতু নির্মাণে সাহায্য করেছিল, আর সতীশবাবুও বললেন, এসব ব্যাপারে আপনার মাথা নাকি খেলে ভালো, তাই আমার এখানে আসা।'

উচ্ছ্বসিত হাসি চাপতে চাপতে হেমন্ত বললে, 'বেশ, বেশ, এসেছেন যখন, ভালো করে বসুন। চা ইচ্ছা করেন?'

ভূপতিবাবু নিজের বিপুল বপুখানি চেয়ারের উপরে ন্যস্ত করলেন, চেয়ার করে উঠল আর্তস্বরে প্রতিবাদ। তারপর বললেন, 'চা, না চা-টা?'

—'চা বলেন, টা বলেন, সবই আসতে পারে। 'টোস্ট' তো আসবেই, তা ছাড়া সিদ্ধ

ডিম, 'এগপোচ', 'ওমলেট'—এমনকি হুকুম দিলে 'চিকেন স্যান্ডউইচে'রও অভাব হবে না।'

একগাল হেসে ভূপতিবাবু বললেন, 'বাহবা কী বাহবা! আপনার বাড়িটি দেখছি তো লোভনীয়! এইজন্যেই সতীশবাবু আপনার এত ভক্ত—হুঁ, বুঝেছি! উত্তম, আপনি যেসব পদার্থের নাম করলেন, আমি তার কোনওটিকেই ছাড়তে রাজি নই!'

মধুকে ডেকে হেমন্ত খাদ্যতালিকা বুঝিয়ে দিলে।

ভূপতিবাবু বললেন, 'আর দেখুন, এক 'কাপ' চায়ে আমার গলা ভেজে না। আমার দেহখানি দেখছেন তো?'

—'নির্ভয় হোন, মধু চায়ের কেটলিটাই এখানে এনে হাজির করবে।'

ভূপতিবাবুর দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মধু প্রস্থান করলে।

—'এইবারে ভূপতিবাবু, আপনার কাহিনি বলুন।'

—'আপাতত বলবার কথা খুব বেশি নেই!...হুঁ, শুনুন। কাল রাত প্রায় বারোটার সময়ে ডাক্তার এম সি বিশ্বাসের বাড়িতে মস্ত একখানা মোটরে চড়ে এক ভদ্রলোক আসেন—'

—'ট্যাক্সি নয়?'

—'না, দরোয়ান বলে বাড়ির গাড়ি। সাদা রং। ভদ্রলোক ডাক্তার বিশ্বাসকে তখনই যাবার জন্যে জেদ করেন। কেস হচ্ছে প্রসব-বেদনার, রোগিণী নাকি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার বিশ্বাস নারী-রোগে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ, রাত্রে এ-রকম কেস প্রায়ই তাঁর কাছে আসে। কিন্তু কাল তাঁর মোটরের কল বিগড়ে গিয়েছিল বলে তিনি আগন্তুকের গাড়িতেই চড়ে রোগী দেখতে যান। তারপর আর তিনি বাড়িতে ফেরেননি।'

—'আগন্তুক ঠিকানা দিয়েছিল?'

—'হয়তো ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে দিয়েছিল, কিন্তু আর কেউ জানে না।'

—'তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন?'

—'ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ানের কাছে পেয়েছি। লোকটা বয়সে বুড়ো, তার মাথায় লম্বা পাকা চুল, মুখে পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে ধোঁয়াটে রঙের চশমা, পরনে সেকেলে লম্বা কোর্তা আর কাপড়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। সে চলে ধনুকের মতো দুমড়ে পড়ে, খুব কুঁজো হয়ে। দরোয়ান এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি।'

—'আগন্তুকের গাড়ি চালাচ্ছিল কে? সে নিজে, না ড্রাইভার?'

—'ড্রাইভার।'

—'আপনারা খুনের কথা কখন জানতে পারেন?'

—'কাল রাত দুটোর সময়ে। বাগবাজারের খালের ধার দিয়ে আসতে আসতে এক কুলি সর্বপ্রথমে ডাক্তার বিশ্বাসের লাশ দেখতে পায়। সে তখনই ঘাঁটির পাহারাওয়ালাকে খবর দেয়। তারপর খবর পাই আমরা। মৃতদেহটা খালের ধারে খুব নির্জন এক জায়গায় পড়ে ছিল—তার বুকে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। লাশের পাশেই ছিল তাসের পাঞ্জা।'

—'লাশ কি সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

—'না। একে রাত তায় 'ব্ল্যাক আউটে'র দিন, আমরা এখনও লাশ ভালো করে পরীক্ষা করিনি। জানেন তো, কাল সন্ধ্যার সময়ে বেশ খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল, লাশের চারিদিকের ভিজে জমির কাদার উপরে দেখলুম অনেক পায়ের দাগ। আজ সকালে সমস্ত মন দিয়ে দেখব বলে, একটা সেপাইকে পাহারায় বসিয়ে লাশ সেইখানেই রেখে এসেছি।'

—'বেশ করেছেন। ওই মধু চা আর টা এনেছে, চটপট আপনার কর্তব্য সেরে নিন্।'

আহার্যগুলোর উপরে একবার লুব্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে ভূপতিবাবু বললেন, 'আমার কিছুমাত্র দেরি হবে না হেমন্তবাবু! আমি লিলিপুটের পুঁচকে বাসিন্দা নই, এ ক-খানা ডিশ তো আমার পক্ষে নস্য!'

সত্যই তাই! আমরা দুজনে সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূপতিবাবু এক-একবার আকর্ণবিশ্রান্ত হাঁ করেন, আর এক-একটা ডিম, 'এগপোচ', 'ওমলেট', 'স্যান্ডউইচ', ও 'টোস্ট' একেবারে তাঁর গলদেশের তলদেশে তলিয়ে যায়! দুই-তিন চুমুকে এক এক পেয়ালা চা সাবাড়! তিন পেয়ালা চা উড়িয়ে তিনি মুখ মোছবার জন্য রুমাল বার করলেন।

হেমন্ত বললে, 'রবিন, প্রথম ডাক্তার খুন হয় কবে?'

—'একুশে জুলাই।'

—'হুঁ। দ্বিতীয় খুন হয় আঁটাশে জুলাই। আর কাল গেছে আগস্ট মাসের চার তারিখ। জুলাই মাস শেষ হয় একত্রিশ তারিখে।'

—'তুমি কী হিসেব করছ?'

—'কিছু না! এখন ওঠো, ভূপতিবাবুর আহারপর্ব সমাপ্ত।'

॥ তিন ॥

তদন্ত

ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহ যে-জায়গায় পড়েছিল, তার খুব কাছেই বাগবাজারের খাল। কলকাতার এই উত্তর-সীমান্তে আজকাল আংশিক 'ব্ল্যাক আউটে'র রাতে বারোটার পর লোক-চলাচল একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছে বললেই হয়। এ-রকম জায়গায় খুন বা রাহাজানির সুবিধা যথেষ্ট।

যে-সেপাই পাহারা দিচ্ছিল ভূপতিবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাশের কাছে কেউ আসেনি তো?'

পাহারাওয়ালা বললে, 'না হুজুর।'

—'আসুন হেমন্তবাবু, তাহলে আমাদের পরীক্ষা শুরু করা যাক। আগে লাশ দেখবেন, না পায়ের দাগ?'

—'পায়ের দাগ।'

—'বেশ, আমরা দুজনেই দেখি আসুন। পরে আলোচনা করা যাবে।'

দুজনেই মাটির উপরে হেঁট হয়ে পায়ের দাগ পরীক্ষায় নিযুক্ত হল, আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কাপড়ে-ঢাকা মৃতদেহের দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমি হচ্ছি সাহিত্যিক, গল্প ও কবিতা লেখা আমার কাজ—নরহত্যা ও ডাকাতি প্রভৃতি হচ্ছে আমার কাছে কল্পনাতীত, অমানুষিক ব্যাপার। ওই কাপড়ের তলায় যে ক্ষত-বিক্ষত ও জীবনহীন জীবের দেহটা ভয়াবহ ভাবে আড়ষ্ট হয়ে আছে আমার কাব্যপ্রিয় কোমল মন সেটা ভেবেই শিউরে উঠতে লাগল।

মিনিট-কয়েক পরেই ভূপতিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্যাস, আমার এ পেশাদার চোখ যা দেখবার, সব দেখে নিয়েছে! হেমন্তবাবু, আপনার আরও কত দেরি?'

হেমন্ত একবার মুখ তুলে হেসে বললে, 'এসব কাজে আমি হচ্ছি নাবালক মাত্র, আমার দেখা শেষ হতে সময় লাগবে।' বলেই সে একখানা 'ম্যাগনিফায়িং গ্লাস' ও একটা 'ফুট' বার করে আবার জমির উপরে উপুড় হয়ে পড়ল।

—'আরে মশাই, অত তোড়জোড় করছেন কেন, এ যে মশা মারতে কামান পাতা! এখানে এমন-কিছু উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য নেই! ওই তো শখের গোয়েন্দাদের বিটকেল বাতিক—বজ্র আঁটন, ফসকা গেরো!'

হেমন্ত নিরুত্তর মুখে নিজের কাজেই নিযুক্ত হয়ে রইল।

শেষটা ভূপতিবাবু যখন রীতিমতো অধীর হয়ে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, হেমন্ত তখন গাত্রোত্থান করে বললে, 'আপনি এখানে কী দেখেছেন ভূপতিবাবু?'

—'যা দেখা যায়! তিন জোড়া পায়ের দাগ। তার মধ্যে এক জোড়া দাগ খালি পায়ের।'

—'মাপ করবেন, ঠিক হল না। এখানে চারজন মানুষের পদচিহ্ন আছে।'

—'প্রমাণ?'

—'বলছি। খালি পায়ের চিহ্ন ছেড়ে দিন। ওগুলো নিশ্চয়ই সেই কুলির, যে সর্বপ্রথমে লাশ আবিষ্কার করেছে।'

—'কী করে জানলেন?'

—'খালি পায়ের চিহ্নগুলো ভালো করে দেখুন। নানা স্থানে এগুলো জুতোর দাগের উপরে গিয়ে পড়েছে। তার কারণ, জুতোর মালিকরা এখানে পদচিহ্ন ফেলে চলে যাবার পরেই কুলিটা ঘটনাস্থলে এসেছিল। সে প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে পা ফেলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর লাশ দেখে সভয়ে দীর্ঘ পদবিক্ষেপ করে প্রাণপণে ছুটে পালায়—দেখুন, খালি পায়ের চিহ্নগুলো এদিকে কত তফাতে তফাতে পড়েছে।'

—'হুঁ, হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু আর তিনজন লোকের পায়ের দাগ কোথায়?'

—'ভূপতিবাবু, আমি 'ফুট' দিয়ে মেপে এখানে তিন জোড়া জুতো-পরা পায়ের দাগ পেয়েছি। এক জোড়া জুতোর মাপ লম্বায় কিছু-কম নয় ইঞ্চি আর চওড়ায় কিছু-বেশি তিন ইঞ্চি, আর এক জোড়া জুতোর মাপ লম্বায় নয় ইঞ্চি আর চওড়ায় সওয়া তিন ইঞ্চি। হঠাৎ দেখলে এই দু-জোড়া পায়ের দাগ প্রায় একরকম বলে মনে হয়—মেপে না দেখলে আমারও ভ্রম হতে পারত।'

—'আর এক জোড়া পায়ের দাগ সম্বন্ধে আপনার কী মত?'

—'পরে বলছি। আগে দেখা যাক, এই দুজন লোক এখানে এসে কী করেছিল? দেখুন, ডান দিক হতে পরস্পরের কাছ থেকে প্রায় আড়াই ফুট তফাতে তফাতে থেকে এরা যে এখানে এসেছে, এই পায়ের দাগগুলো দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই ভাবে আসবার সময়ে তাদের পদচিহ্নগুলো খুব গভীর ভাবে কাদার ভিতরে বসে গিয়েছে। আবার, এই উলটোমুখো পদচিহ্নগুলোর উৎপত্তি হয়েছে তখন, তারা যখন এখান থেকে ফিরে গিয়েছে; এ দাগগুলো গভীরও নয়, পরস্পরের কাছ হতে মাপ-করা দূরে-দূরেও থাকেনি। এথেকে কী প্রমাণ হয় বলুন।'

—'আপনিই বলুন না।'

—'ওদের পা আসবার সময়ে এমন গভীর ভাবে কাদার ভিতরে বসে গিয়েছিল কেন জানেন? ওরা কোনও ভারী জিনিস বহন করে এনেছিল।'

—'তার মানে?'

—'এক্ষেত্রে ভারী জিনিস মানে আর কী হতে পারে? ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহ!'

ভূপতিবাবু সচকিত স্বরে বললেন, 'তাহলে আপনি কি বলতে চান, ডাক্তার বিশ্বাসকে এখানে খুন করা হয়নি?'

—'আমার তো সেইরকম সন্দেহ হয়।'

ভূপতিবাবু তাড়াতাড়ি মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হলেন, হেমন্ত তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, 'পদচিহ্নের ইতিহাস আর একটু বাকি আছে। এখানে চতুর্থ যে-ব্যক্তির পায়ের দাগ দেখছি, সে কিঞ্চিত অসাধারণ।'

—'কীরকম?'

—'সে মাথায় অন্তত ছয় ফুট উঁচু। সে হয়তো ন্যাটা, —অর্থাৎ ডান হাতের কাজ করে বাঁ হাত দিয়ে।'

—'পায়ের দাগের ভিতর থেকে আপনি এই অপূর্ব আবিষ্কার করেছেন?' বলেই ভূপতি হো হো করে হেসে উঠলেন।

হেমন্ত কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললে, 'তার হাতে ছিল একগাছা মস্ত মোটা লাঠি।'

—'আর তার ডান চোখ ছিল কানা, আর বাঁ গালে ছিল একটা জড়ুল! কী বলেন?'

—'না, অতটা বেশি বলতে পারি না। এইবারে যা বলেছি তার ব্যাখ্যা শুনুন। প্রথমত, এই পায়ের দাগগুলো লক্ষ করে দেখুন। এদের প্রত্যেকটার মাপ কত জানেন? লম্বায় প্রায় এগারো ইঞ্চি আর চওড়ায় চার ইঞ্চিরও বেশি। যার পা এত বড়ো, তার বেঁটে হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়, প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানে কতখানি করে ফাঁক রয়েছে দেখছেন? রীতিমতো দীর্ঘ লোক ছাড়া কেউ এত তফাতে পা ফেলে না।'

—'আচ্ছা, এটাও যেন মেনে নিলুম। কিন্তু কী করে জানলেন সে ন্যাটা আর মোটা লাঠি নিয়ে বেড়ায়?'

—'খুব সহজেই। ভালো করে দেখলে আপনিও বলতে পারতেন!...চেয়ে দেখুন। কাদার ওপরে প্রত্যেক বড়ো বাঁ পায়ের দিকে একটা করে গোল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?'

—'হুঁ।'

—'ওগুলো হচ্ছে লাঠির দাগ। চিহ্নগুলোর আকার দেখেই বলা যায় লাঠিগাছা বেশ মোটা। ওই পদচিহ্নের অধিকারী যদি আর পাঁচজনের মতো ডান হাতে লাঠি ধরত, তাহলে মাটিতে লাঠির দাগ পড়ত ডান পায়ের দিকে। এখানে তা পড়েনি বলেই হয়তো সে ন্যাটা।'

ভূপতিবাবু চমৎকৃত ভাবে হেমন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মশাই, আমাকে মাপ করুন। এতক্ষণ পরে বুঝলুম, আমাদের সতীশবাবু আপনার প্রশংসায় কেন এমন পঞ্চমুখ!'

হেমন্ত বললে, 'এইবারে মৃতদেহে হস্তার্পণ করা যাক।'

ভূপতিবাবু এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের উপর থেকে আবরণটা তুলে নিলেন।

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির মৃতদেহ। যদিও অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে, তবু অনেকক্ষণ আগে মারা পড়েছেন বলে তাঁর মুখের ভাব আবার প্রশান্ত হয়ে এসেছে।

হেমন্ত বললে, 'দেখছেন ভূপতিবাবু, মাটির উপরে রক্তের দাগ নেই?'

—'না। এখানে হত্যাকাণ্ড হলে মাটির উপরে নিশ্চয়ই রক্তের দাগ থাকত। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। ভদ্রলোককে মারা হয়েছে অন্য জায়গায়। কিন্তু কোথায়?'

—'হয়তো গাড়ির ভিতরেই!'

—'হতেও পারে, না হতেও পারে।'

—'ডাক্তার বিশ্বাসের বাড়ি কোথায়?'

—'কালীঘাটের কাছে।'

—'আর এটা হচ্ছে বাগবাজারের খালের ধার। গভীর রাত্রি, রাস্তায় আধা-অন্ধকার, পথিক নেই, সুদীর্ঘ পথ, দ্রুতগামী মোটর। হত্যাকারী কাজ সারবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। তারপর একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে লাশ ফেলে দিয়ে তারা সরে পড়েছে।'

—'অসম্ভব নয়।'

হেমন্ত এগিয়ে গিয়ে দেহের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, 'বুকের উপরে দু-জায়গায় অস্ত্রের দাগ। কিন্তু কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে?'

ভূপতিবাবু বললেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদাগারের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, এর আগের দুই ডাক্তারেরই হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে, পেনসিল-কাটা ছুরির মতন সরু কোনও অস্ত্র! তবে তার ফলাটা ছুরির চেয়ে বেশি লম্বা।'

হেমন্ত আঙুল দিয়ে শুকনো রক্তের চাপ সরিয়ে মৃতদেহের ক্ষতস্থান পরখ করে বললে, 'হ্যাঁ, যে অস্ত্রের আঘাতে ডাক্তার বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, তারও ফলা পেনসিল-কাটা ছুরির চেয়ে চওড়া নয়।'

ভূপতিবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যে বললেন এখানে তিন জোড়া জুতো-পরা পায়ের চিহ্ন দেখেছেন, তাদের মধ্যে ডাক্তার বিশ্বাসের পায়ের দাগ নেই তো?'

—'অসম্ভব। কাপড়ের তলা থেকে মৃতদেহের পা বেরিয়ে ছিল। আমি আগেই লক্ষ করে

দেখেছি, ডাক্তার বিশ্বাসের জুতোর তলায় একটুও কাদার চিহ্ন নেই, সুতরাং এখানকার জমির উপরে তিনি পদার্পণও করেননি।'

'আমার মনে হয়, মৃতদেহের ভিতর থেকে আর নূতন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই।'

—'আপনি লাশের কাপড়-জামা পরীক্ষা করেছেন?'

—'হ্যাঁ, কাল রাতেই। পকেটবুক, মণিব্যাগ, সোনার হাতঘড়ি—কিছুই হারায়নি। এ হত্যাকাণ্ডেরও কারণ অর্থলোভ নয়। আর কেন, এইবারে লাশ সরিয়ে ফেলতে হুকুম দি—কী বলেন?'

হেমন্ত জিজ্ঞাসার কোনও জবাব না দিয়ে আবার যেন নিজের মনেই বললে, 'মৃতদেহের বুকের উপরে পাশাপাশি দুটো ক্ষতচিহ্ন! ডাক্তার বিশ্বাস তাহলে প্রথম আঘাতেই মরেননি—হয়তো হত্যাকারীর সঙ্গে দু-এক মুহূর্ত ধস্তাধস্তি করেছিলেন।'

—'কিন্তু ধস্তাধস্তি করেও বাঁচতে পারেননি।'

হেমন্ত হঠাৎ মৃতদেহের মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতখানা তুলে ধরলে। তারপর জোর করে মুঠি খুলে বার করলে একগোছা পাকা চুল! বললে, 'ভূপতিবাবু, এই দেখুন ধস্তাধস্তির ফল!'

—'হত্যাকারীর মাথার পাকা চুল?'

হেমন্ত আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে চুলগুলো দেখতে দেখতে একটু হেসে বললে, 'না ভূপতিবাবু, এ হচ্ছে মরা চুল!'

—'সে আবার কী?'

—'অর্থাৎ পরচুল।'

—'অ্যাঁ?'

—'হ্যাঁ! ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ান যে-বৃদ্ধকে দেখেছিল, খুব-সম্ভব তারই মাথায় আর মুখে ছিল পরচুল। হত্যাকারী হয়তো বয়সে যুবক, আত্মগোপন করবার জন্যে সে গিয়েছিল ছদ্মবেশে। পদচিহ্ন দেখে আমি যে সুদীর্ঘ ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছি, সেই-ই হয়তো পাকা পরচুল পরে বুড়ো সেজেছিল। আর নিজের দীর্ঘতা লুকোবার জন্যেই কুঁজো হয়ে দুমড়ে পড়ে চলা-ফেরা করেছিল।'

—'দরোয়ানের আর-একটা কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না।'

—'কী?'

—'আপনি বলছেন হত্যাকারীদের দলে ছিল তিনজন লোক। দরোয়ান বলে গাড়িতে ড্রাইভার আর সেই বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

—'নিশ্চয়ই ছিল। অন্ধকারে দরোয়ান গাড়ির ভিতরটা দেখতে পায়নি। যাক, এটা খুব বড়ো কথা নয়। সেই তাসের পাঞ্জা এখানে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

—'সেখানা কালই আমি নিয়ে গিয়েছি।'

—'ভূপতিবাবু, এখানে আমার আর কোনও কর্তব্য নেই, কিন্তু আপনার কিছু কাজ এখনও বাকি আছে।'

—'আবার কী কাজ?'

—'ওই তিন জোড়া জুতো-পরা পদচিহ্নের প্লাস্টারের ছাঁচ তোলবার ব্যবস্থা করুন। পরে কাজে লাগতে পারে।'

—'তা যেন করব, কিন্তু আপনি এই হত্যার উদ্দেশ্য কিছু ধরতে পারলেন কি?'

—'আমি জাদুকর নই ভূপতিবাবু, এত তাড়াতাড়ি অতটা পারি না। আচ্ছা, নমস্কার! এসো রবিন।'

॥ চার ॥

চতুর্থ আক্রমণ

এর পর কয়েকদিন কেটে গেল। অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডগুলো সম্বন্ধে হেমন্ত আর কোনও কথাই তুললে না। আমি তার স্বভাব জানতুম। সে যখন কোনও বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করে এবং সে-সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে না পারে, তখন তা নিয়ে কেউ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে অত্যন্ত চটে যায়। কাজেই আমি কিছুই জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম না।

কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চলছে ঠিক একভাবেই। হেমন্ত সম্পূর্ণ সহজ ভাবেই চা ও টা খেত, খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা করত, দাবা খেলত, আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুত, নিজের লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ত বা রসায়নাগারে ঢুকে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়ে থাকত। বাহির থেকে দেখলে কেহ-ই ভাবতে পারত না যে, তার মনে অন্য কোনও ভাবনা আছে। কিন্তু আমি তাকে খুব চিনি। আমি বেশ জানি অন্য কোনও কাজের সঙ্গেই এখন তার মস্তিষ্কের সত্যিকার যোগ নেই—সে লোকের চোখের সামনে করছে এক কাজ, কিন্তু তার মনের মধ্যে বাস করছে অন্য চিন্তা। যতদিন না সমস্যার সমাধান হবে ততদিন তার এই ভাবেই যাবে! অর্থাৎ যা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে তা নিয়ে কোনওই উচ্চবাচ্য করবে না!

এ-সময়টায় তার প্রকৃতিরও কতকটা পরিবর্তন হত। স্বভাবত তার প্রকৃতি সরস ও মধুর। কিন্তু কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তায় নিযুক্ত থাকলে এবং মীমাংসায় উপস্থিত হতে না পারলে সে হয়ে উঠত অত্যন্ত রূঢ়ভাষী এবং কথায় কথায় বাধিয়ে দিত রসাতল-কাণ্ড। কাজেই যাতে তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে না যায়, সেজন্যে আমাদের সর্বদাই সাবধান হয়ে থাকতে হত।

কিন্তু পুলিশের ভূপতিবাবু তো এত শত জানতেন না; তিনি বার বার ফোন করে, লোক পাঠিয়ে এবং নিজে আনাগোনা করে হেমন্তকে মুহুর্মুহু জ্বালাতন করে তুললেন। হেমন্ত শেষটা অসুস্থতার ভান করে তাঁর বা তাঁর লোকের সঙ্গে দেখা করত না।

আজ ক-দিন পরে হেমন্তকে বেশ প্রফুল্ল দেখছি। সে দু-খানার বদলে তিনখানা 'টোস্ট' নিলে, ডবল-ডিমের ওমলেটও চাইলে দুই বার—তার এই ক্ষুধাবৃদ্ধি নিশ্চিন্ততার লক্ষণ।

আমি ঠাট্টার সুরে বললুম, 'কী হে ভায়া, তুমিও মহাজন ভূপতিবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাও নাকি?'

হেমন্ত বলে উঠল, 'অসম্ভব! আমি চেষ্টা করলে হয়তো তোমার মতন সাপ্তাহিক কাগজের কবি হয়ে উঠতে পারি, কিন্তু হাজার বার মাথা খুঁড়লেও এক বারের জন্যেও ভূপতিবাবুর মতন উদর-পিশাচ হতে পারিব না!'

চা-পানের পর খবরের কাগজ পড়া। তারপর দাবা খেলার পালা।

অভ্যাসমতো আমি দাবার ছকের দিকে হাত বাড়াতেই হেমন্ত ইজিচেয়ারে চিত হয়ে পড়ে, দুই হাতলে দুটো পা তুলে দিয়ে বললে, 'আজ আর খেলা নয় রবিন, আজ খালি গল্প!'

আমি একেবারে আসল কথা পেড়ে বললুম, 'ওঃ, আজ যে দেখছি ভারী ফুর্তি! ভূপতিবাবুর 'কেস'টার কোনও কিনারা করতে পেরেছ বুঝি?'

হেমন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'এরই মধ্যে কিনারা কী হে? তুমিও কি আমাকে অসাধ্য সাধন করতে বলো? নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার মানেই কি নদী পার হওয়া? আমি বেশ বুঝতে পারছি, পুলিশ জলে ঝাঁপ দিয়েছে সাঁতার-না-জানা লোকের মতো, কাজেই হাবুডুবু খেয়ে মরছে; আমি একটু-আধটু সাঁতার জানি, তাই বড়োজোর বলতে পারি যে, প্রায় মাঝ-নদীতে এসে পড়েছি। কিন্তু কিনারা? নদীর কিনারা এখনও অনেক দূরে ভাই, অনেক দূরে!'

আমি চেয়ারখানা হেমন্তের আরও কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম, 'সাঁতার দিয়ে তুমি মাঝ-নদীতে এসে পড়েছ তো? বেশ, তোমার সাঁতার-কাহিনি শুনতে চাই।'

—'এখনও বলবার সময় হয়নি। কারণ নদীর ওপার এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার একটা নিরাশার কাহিনি শোনো। আজ আগস্ট মাসের কত তারিখ?'

—'বারোই।'

—'আমার কী ধারণা হয়েছিল জানো? আজ সকালে খবরের কাগজে কোনও রোমাঞ্চকর খবর ছাপা হবে—কারণ কাল গিয়েছে এগারো তারিখ। কিন্তু আমাকে হতাশ হতে হয়েছে।'

আমি চকিত স্বরে বললুম, 'তুমি কীরকম রোমাঞ্চকর খবরের প্রত্যাশা করছিলে?'

—'বলব না। অর্থাৎ বলে বোকা বনব না। মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করে আমি কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি তার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত একেবারে বাজে! রবিন, আমার আত্মশ্লাঘায় ঘা লেগেছে! আমার কাছ থেকে তুমি আর কিছু জানতে চেয়ো না। এ মামলায় আমার অন্য সিদ্ধান্তগুলোও হয়তো এমনি বাজে হয়ে দাঁড়াবে। আমি প্রকাশ্যে বোকা বনতে ভালোবাসি না।'

টেবিলের উপরে দু-খানা প্রকাণ্ড আকারের ইংরেজি গ্রন্থ পড়েছিল—Encyclopedia of Good Health বা Home Doctor! আজ ক-দিন ধরে দেখছি হেমন্ত এই বইখানা নিয়ে বার বার নাড়াচাড়া করছে। আমিও তার এক খণ্ড নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম।

খানিক পরেই হেমন্ত যেন আপন মনেই বললে, 'এ দেশের অপরাধীরা 'রোমান্টিক' বা উৎকট কল্পনারসিক হতে পারে না কেন, এই ভেবে মাঝে মাঝে আমার ভারী দুঃখ হয়।

তারা কেবল লোভ বা হিংসা বা রাগের বশেই খুনখারাপি করে, ওর মধ্যে কিছুমাত্র 'রোমান্স' নেই। ইউরোপে গিয়ে দেখেছি, সেখানে 'রোমান্টিক' অপরাধীর ছড়াছড়ি।'

আবার কথা কইবার সুযোগ পেয়ে আমি বই থেকে মুখ তুলে বললুম, 'তুমি কীরকম অপরাধীর কথা বলছ হেমন্ত?'

—'ধরো, অমর হত্যাকারী জ্যাক দি রিপারের কথা। বিলেতে যখন তাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে জাল ফেলা আর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তখন পুলিশের বড়োসাহেবের কাছে জ্যাক হঠাৎ একখানা চিঠি লিখে জানালে যে, 'অমুক জায়গায় অমুক সময়ে গেলে তুমি আমার দেখা পাবে।' বলা বাহুল্য, বড়োসাহেব যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলেন। রাজপথে লোকারণ্য। হঠাৎ একজন অতি-সাধারণ পথিক পথ চলতে চলতে তাঁর সামনে থেমে পড়ে একটা ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে। বড়োসাহেব কোনওরকম সন্দেহের কারণ না পেয়ে তাকে ঠিকানা বলে দিলেন। পথিক চলে গেল। বড়োসাহেব নিজের ঘড়ি বার করে দেখলেন, ঠিক এই সময়েই জ্যাকের আসবার কথা। তখন তাঁর চমক ভাঙল, বুঝলেন ওই পথিকই জ্যাক ছাড়া আর কেউ নয়! তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর খোঁজে ছুটলেন—কিন্তু জ্যাক তখন ভিড়ের ভিতরে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে!...রবিন, একেই বলি আমি 'রোমান্টিক ক্রিমিন্যাল'। হ্যাঁ, সেকালে এ দেশেও এই শ্রেণির অপরাধী ছিল। বিশুডাকাত, তান্তিয়া ভিল প্রভৃতির গল্প পড়ে দেখো, রীতিমতো 'রোমান্সে'র গন্ধ পাবে!'

আমি বললুম, 'হঠাৎ 'রোমান্টিক' অপরাধীদের নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বলো দেখি?'

—'কারণ যে-মামলা হাতে পড়েছে, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'রোমান্সে'র আঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে।'

—'যথা?'

—'এই তাসের পাঞ্জার কথা ভেবে দ্যাখো। যেখানে খুন হয় সেখানেই পাওয়া যায় একখানা করে পাঞ্জা—আর তার এক-একটা ঘর কাটা! তুমি বলবে একে রহস্যময়, আমি বলব 'রোমান্টিক'!'

—'এর মধ্যে কি আর কোনও অর্থ নেই?'

—'নিশ্চয়ই আছে! খানিক খানিক অনুমান করতেও পেরেছি, কিন্তু এখনও রহস্যোদ্‌ঘাটনের সময় হয়নি।'

হেমন্ত আবার মুখে লাগালে তালা-চাবি। আমিও আবার ঝুঁকে পড়লুম কেতাবের দিকে। এইভাবে গেল মিনিট-পনেরো।

তারপর হেমন্ত বললে, 'যদি এই মামলার একটা কিনারা হয়, তাহলে ওই তাসের পাঞ্জাগুলোকে স্মরণীয় করবার জন্যে এখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিছুই করবে না। কিন্তু ইউরোপের ধারা স্বতন্ত্র।'

আমি বললুম, 'ইউরোপের পুলিশ ওই তাসের পাঞ্জা নিয়ে কী করত?'

—'মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখত।'

—'মিউজিয়মে?'

—'হ্যাঁ, Museum of Crime বা অপরাধের জাদুঘর! আমি যখন অপরাধতত্ত্ব শেখবার জন্যে কালাপানি পার হয়েছিলুম, তখন ইংল্যান্ডের, ফ্রান্সের আর অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে দেখেছিলুম এইরকম সব মিউজিয়ম—সাধারণ লোকের জন্যে নয়, কেবল পুলিশ বিভাগের জন্যে। তাদের মধ্যে সাজানো আছে নানা বিখ্যাত মামলার অসাধারণ আর উল্লেখযোগ্য জিনিস। সেসব দেখলে অপরাধীদের মনোবৃত্তির বিষয়ে কতই শিক্ষা পাওয়া যায়! অনেক জিনিস হয়তো খুবই তুচ্ছ—কিন্তু তাদের পিছনে আছে হয়তো এমন ভয়াবহ ইতিহাস যে, শুনলেও সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে যায়। মূর্তিমান দুঃস্বপ্নেরও অভাব নেই। লন্ডনের বিখ্যাত পুলিশ কার্যালয় 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে'র জাদুঘরের একটা হল-এ দেখলুম, লম্বা লম্বা অনেকগুলো তাকে সারি সারি সাজানো 'প্লাস্টারে'র মানুষের মুখের পর মুখ। যে-ইনস্পেকটার আমাকে সব দেখাচ্ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এসব কাদের মুখ?' তিনি অল্প একটু হেসে বললেন, 'ওদের গলার দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন!' তাকিয়ে দেখলুম। প্রত্যেক মুখের গলা বেড়ে একটা করে গোল দাগ—যেন কোনও কঠিন বন্ধনী তাদের গলার ভেতরে চেপে বসে গেছে! ন্যাড়ামাথা কঠোর মুখগুলো আমার পানে তাকিয়ে আছে দৃষ্টিহীন স্থির চক্ষে! তার সঙ্গে ওই গলার দাগ! আমার বুকের মধ্যে জাগল বিভীষিকার শিহরন!'

—'কেন হেমন্ত?'

—'সেগুলোর প্রত্যেকটা হচ্ছে হত্যাকারীর মুখ! ফাঁসিকাঠে ঝুলে তারা প্রাণত্যাগ করবার পরেই মৃতদেহগুলো নামিয়ে 'প্যারিস প্লাস্টার' দিয়ে তাদের মুখের ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়েছিল!'

হেমন্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বৈঠকখানার বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ হল, তারপরেই বেগে প্রবেশ করলে ভূপতিবাবু, তাঁর মুখ-চোখ অত্যন্ত উত্তেজিত!

হেমন্ত একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এ কী ভূপতিবাবু, আপনার মুখের চেহারা ভগ্নদূতের মতো কেন?'

—'ভয়ানক কাণ্ড! কাল রাত একটার সময়ে ডাক্তার সুনীল চৌধুরির ওপরে মারাত্মক আক্রমণ হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন!'

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে উদ্দীপিত কণ্ঠে হেমন্ত বললে, 'রবিন, রবিন! তাহলে আমার সিদ্ধান্তই ঠিক! কাল গেছে আগস্ট মাসের এগারোই তারিখ, আমি জানতুম এমনি একটা কিছু হবেই।

ভূপতি হতভম্বের মতো বললেন, 'আপনি জানতেন কাল আবার তাসের পাঞ্জা খেলা হবে! কী করে জানলেন?'

হেমন্ত তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত স্বরে বললে, 'ওকথা এখন যেতে দিন। তাহলে এবারের ডাক্তারবাবু বেঁচে গিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু আহত হয়েছেন—যদিও সাংঘাতিক ভাবে নয়।'

—'আর যে তাঁকে আক্রমণ করেছিল?'

—'পালিয়েছে।'

—'কিন্তু কাগজে এ খবরটা বেরোয়নি তো?'

—'তারা এখনও খবর পায়নি।'

—'বেশ, এখন স্থির হয়ে বসে সব কথা খুলে বলুন দেখি।' এই বলে হেমন্ত আবার ইজিচেয়ারের উপর বসে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

সিগারেট কেসের কীর্তি

ভূপতিবাবু বলতে লাগলেন :

'ডাক্তার সুনীল চৌধুরির বাড়ি তালতলায়। আপনারা সকলেই নিশ্চয় তাঁর নাম শুনেছেন, কারণ তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক।

কাল রাত সোয়া বারোটার সময়ে একখানা সাদা রঙের মস্ত মটরগাড়িতে চেপে একটি লোক তাঁকে জরুরি কেসের জন্যে ডাকতে আসে। লোকটার একমাত্র ছেলে নাকি তেতলা থেকে পড়ে গিয়েছে, এখনই তাকে দেখতে যেতে হবে। তার চেহারার যে-বর্ণনা পেয়েছি, তার সবটাই ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ানের বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। সেই লম্বা ও পাকা চুল, দাড়ি-গোঁফ, সেই ধনুকের মতন দুমড়ে-পড়া কোলকুঁজো দেহ, চোখে ধোঁয়াটে-রঙের চশমা।

সুনীলবাবুর পরমায়ুর জোর খুব। প্রচুর অর্থলোভেও তখনই লোকটার সঙ্গে তার গাড়িতেই যেতে রাজি হননি—গেলে ডাক্তার বিশ্বাসের মতন তাঁকেও নিশ্চয় জ্যান্ত অবস্থায় আর গাড়ির ভিতর থেকে বেরুতে হত না।

তাঁর নারাজ হওয়ার কারণ, তখন তিনি অন্য একটা জরুরি 'কেস' দেখতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আগন্তুককে তিনি বললেন, 'আপনার ঠিকানা রেখে যান। এই 'কেস'টা দেখে আমি নিজের গাড়িতেই আপনার ওখানে যাব।'

অগত্যা আগন্তুক ঠিকানা দিয়ে গেল—পঁয়ত্রিশ নম্বর সুবোধ মজুমদার লেন।

ডাক্তার চৌধুরি যখন সুবোধ মজুমদার লেনে গিয়ে পৌঁছলেন রাত তখন প্রায় একটা। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। গলির ভিতরটা পাতালের মতন অন্ধকার—আজকালকার নিবু নিবু গ্যাসপোস্টও যেটুকু আলো দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সেখানে তাও ছিল না। আমার বিশ্বাস, এ কাজ হত্যাকারীদেরই।

কিন্তু ডাক্তার চৌধুরির কাছে ছিল 'টর্চ', তিনি গাড়ি থেকে নেমে সেইটে জ্বেলেই গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গলিটা খানিক পরেই মোড় ফিরে গিয়েছে। ডাক্তার চৌধুরি ঊর্ধ্বমুখে 'টর্চে'র আলোতে বাড়ির নম্বর খুঁজতে খুঁজতে যেই সেই মোড়ের কাছে গিয়েছেন, অমনি কে একজন আচমকা বাঘের মতন তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায়-অবরুদ্ধ তীব্র স্বরে বললে—'প্রতিশোধ',

তারপরে সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর বুকের উপরে করলে অস্ত্রাঘাত! কিন্তু তিনি সেই প্রথম আঘাতটা সামলে গেলেন আশ্চর্য উপায়ে। তাঁর বুকপকেটে ছিল একটা পুরু রুপোর ভারী সিগারেট কেস, আততায়ীর ছোরা বা ছুরি তার উপরেই বাধা পেয়ে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল!

ডাক্তার চৌধুরি সভয়-বিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে গেলেন—কিন্তু পরমুহূর্তে হল দ্বিতীয় আক্রমণ! কিন্তু সেবারের অস্ত্র এসে পড়ল তাঁর বাম হাতের উপরে—সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আর্ত চিৎকার করে উঠে আততায়ীকে করলেন সজোরে এক পদাঘাত।

অন্ধকারে একটা ভারী দেহের পতনশব্দ হল—তারপরেই তিনি শুনলেন, দুই-তিন জন লোক যেন বেগে ছুটে গলির ভিতর-দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। মারামারির সময়ে তাঁর হাতের 'টর্চ'টা মাটির উপরে ঠিকরে পড়ে গিয়েছিল, তাই সেটা জ্বেলে তিনি শত্রুদের কারুকে দেখবার সুযোগও পেলেন না।

এদিকে তাঁর চিৎকার শুনে গলির বাসিন্দারা জেগে নীচে নেমে এল। আলো জ্বেলে তন্ন-তন্ন করে চারিদিক খোঁজা হল, কিন্তু আক্রমণকারীরা তখন একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে।

সেই খোঁজাখুঁজির সময়ে দেখা গেল, ঘটনাস্থলে পড়ে রয়েছে একখানা তাসের পাঞ্জা, আর তার চারটে ফোঁটা কেটে বার করে নেওয়া!

বলা বাহুল্য, সুবোধ মজুমদার লেনে পঁয়ত্রিশ নম্বর বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

আমি বললুম, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে! একটা তুচ্ছ সিগারেট কেস করলে ডাক্তারবাবুর প্রাণরক্ষা!'

ভূপতিবাবু বললেন, 'আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, এবারে ডাক্তার চৌধুরি প্রাণে মারা পড়েননি, কিন্তু তবু পাওয়া গিয়েছে তাসের পাঞ্জা!'

হেমন্ত বললে, 'ও-জন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই। হত্যাকারী নিশ্চয়ই আগে থাকতে তাসের পাঞ্জার ফোঁটা কেটে প্রস্তুত হয়ে আসে। আর হত্যাকাণ্ডের আগেই সেখানা ঘটনাস্থলে নিক্ষেপ করে।'

ভূপতিবাবু বললেন, 'কিন্তু এমন আজগুবি কাণ্ড তো কখনও শুনিনি বাবা! করবি তো মানুষ খুন, তার সঙ্গে আবার তাস খেলা কেন? আর এই পাঞ্জার ফোঁটাগুলো কেটে নেওয়ারই বা অর্থ কী?'

হেমন্ত বললে, 'হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে বুঝতে পারলেই এর অর্থ বুঝতে দেরি হবে না।'

—'উদ্দেশ্য? হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য আমি ঠিক ধরে ফেলেছি।'

—'তাই নাকি?'

—'তা নয়তো কী। হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য বুঝে বুঝে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম যে!... তা না পারলে কি আমাদের কাজ চলে মশাই? ব্যাপারটা কী জানেন? এই খুনেবেটাদের পিছনে আছে একদল হাতুড়ে ডাক্তার! পাস-করা ডাক্তারদের জন্যে তাদের অন্ন একেবারে মারা যেতে বসেছে দেখেই তারা এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। একদল গুন্ডা ভাড়া করেছে পাস-করা ডাক্তারদের একে একে সরাবার জন্যে। উদ্দেশ্য তো বুঝেছি হেমন্তবাবু, তবু এই তাসের পাঞ্জার মানে বুঝতে পারছি না তো।'

আমি দেখলুম, হেমন্তের চোখ ও ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন দুর্জয় হাসির

উচ্ছ্বাস! কিন্তু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে উচ্ছ্বাসকে দমন করে সে উঠে পড়ল। তারপর পাঞ্জাবিটা পরতে পরতে বললে, 'ভূপতিবাবু, দয়া করে আমাকে এখনই একবার ডাক্তার চৌধুরির কাছে নিয়ে যেতে পারবেন?'

—'তা আর পারব না কেন?'

হেমন্ত আমাকেও সঙ্গী হবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

॥ ছয় ॥
মোহনলালের নিমন্ত্রণ

ডাক্তার সুনীল চৌধুরি একখানা কৌচের উপরে বসে ছিলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কম হবে না। বেশ বলিষ্ঠ দেহ। বাম হাতের উপরে ব্যান্ডেজ।

তাঁর সামনের দু-খানি আসনে হেমন্ত ও ভূপতিবাবু, সবপিছনে আমি।

সুনীলবাবুর নিজের মুখে হেমন্ত কল্যকার কাহিনি আর-একবার শ্রবণ করলে। কিন্তু নূতন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'মি. চৌধুরি, আক্রমণকারী যে ছোরা মারবার আগে 'প্রতিশোধ' কথাটি উচ্চারণ করেছিল, এ বিষয়ে আপনার কোনওই সন্দেহ নেই তো? মনে রাখবেন, কেবল এই প্রশ্ন করবার জন্যেই আমি আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি!'

ডাক্তার চৌধুরি বললেন, 'শুনতে আমার কিছুমাত্র ভুল হয়নি। সে-লোকটা চাপা অথচ এমন ভয়ানক তীব্রস্বরে 'প্রতিশোধ' কথাটা উচ্চারণ করেছিল যে, তা আমার কানে এসে ঢুকেছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। না, আমার শুনতে ভুল হওয়া অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব!'

—'তাই যদি হয়, তাহলে বলুন দেখি মি. চৌধুরি, আপনার এমন শত্রু কে থাকতে পারে, যে আপনার প্রাণবধ করতে চায়?'

ডাক্তার চৌধুরি মিনিট-কয়েক নীরবে চিন্তা করে বললেন, 'আমার এমন কোনও শত্রু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

—আচ্ছা, যে-লোকটি আপনাকে ডাকতে এসেছিল, তাকে দেখে আপনার চিনি-চিনি বলে মনে হয়নি?'

—'না।'

—'আমার বিশ্বাস, সে পরচুল পরে ছদ্মবেশে আপনার কাছে এসেছিল।'

—'তাহলে তাকে চিনব কেমন করে বলুন? তার চোখ দেখলেও যদি-বা কিছু ধরা যেত, কিন্তু সে-উপায়ও ছিল না। ধোঁয়াটে-রঙের চশমার আড়ালে তার চোখদুটো ছিল প্রায় অদৃশ্য। তবে একটা কথা বলতে পারি। সেই বৃদ্ধের দেহ বেঁকে দুমড়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় সে বোধহয় ছ-ফুটের কম উঁচু হবে না!'

ভূপতিবাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ধন্যি, হেমন্তবাবু, ধন্যি! পায়ের দাগ দেখে আপনি তো ঠিকই আঁচ করেছিলেন!'

ডাক্তার চৌধুরি বললেন, 'সে-লোকটার হাতে ছিল একগাছা মোটা লাঠি!'

ভূপতিবাবা বললেন, 'আরে, আরে, হেমন্তবাবুর কথার সঙ্গে এও যে মিলে যাচ্ছে! মি. চৌধুরি, আপনি লোকটার আর কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ। সে লাঠি নেয় বাঁ হাতে।'

ভূপতিবাবু অতীব বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন।

হেমন্ত বললে, 'ভূপতিবাবু, মি. চৌধুরি যে তাসের পাঞ্জাখানা কুড়িয়ে পেয়েছেন, সেখানা আপনার কাছে আছে?'

—'না, থানায় আছে। কিন্তু তার মধ্যে তৃতীয় তাসখানার মতন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।'

—'তৃতীয় তাসখানায় যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল, এ কথা তো আমায় বলেননি!'

—'ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহের পাশ থেকে রাত্রে যখন তাসখানা পাই, তখন তার একটা বিশেষত্ব আমার চোখে পড়েনি। পরের দিন সকালবেলায় আপনার সঙ্গে তদন্ত সেরে থানায় ফিরে গিয়ে দেখি, তাসের গায়ে রয়েছে অল্প-একটু রক্ত মাখা একটা বুড়ো-আঙুলের আভাস! এ কথাটা আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছি, ক্ষমা করবেন।'

হেমন্ত অভিযোগের স্বরে বললে, 'এতবড়ো কথাটা ভুলে যাওয়া আপনার উচিত হয়নি। সে-তাসখানা থানায় গেলে দেখতে পাব?'

—'না হেমন্তবাবু, তাসখানা সেই দিনই আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি 'ফোটোমাইক্রোগ্রাফি'র সাহায্যে আঙুলের enlarged ছাপ তোলবার জন্যে। ছবিও উঠেছে, কিন্তু কলকাতার কোনও অপরাধীরই আঙুলের সঙ্গে এ ছবির আঙুল মিলল না। তবে বাইরের সব জায়গাতেও ছবি পাঠানো হয়েছে, ফলাফল আজ-কালের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে।'

—'যাক, এতটা যখন করেছেন, তখন আমার আর কোনও অভিযোগ নেই।'

ভূপতিবাবু বাহাদুরি দেখাবার সুবিধা পেলে ছাড়বার ছেলে নন। গর্বিত স্বরে বললেন, 'আবার বলি হেমন্তবাবু, আমরা হচ্ছি গিয়ে পেশাদার পুলিশের লোক! কাঁচা কাজ আমার কাছে পাবেন না!'

ঠিক সেই সময়ে ঘরের ভিতরে যে-যুবকটি প্রবেশ করলে, তাকে আমি আর হেমন্ত দুজনেই খুব চিনি। সে হচ্ছে মোহনলাল, দশম শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত সে আমাদের স্কুলের সহপাঠী ছিল। তারপর আমরা ভরতি হই প্রেসিডেন্সি কলেজে, আর সে যায় বিদ্যাসাগর কলেজে। আজ নয়-দশ বৎসর পরে তার সঙ্গে আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

মোহনলাল আমাদের দেখেই চিনতে পারলে। বিস্মিত-আনন্দে ছুটে এসে বললে, 'এ কী, রবিন! হেমন্ত! এতকাল পরে দেখা। তোমরা এখানে যে?' তারপরেই ধড়াচুড়োপরা ভূপতিবাবুকে দেখেই সে বললে, 'ও, শুনেছি বটে, হেমন্ত আজকাল মস্তবড়ো ডিটেকটিভ হয়েছে!'

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'আমিও শুনেছি, তুমিও বড়ো কম মস্তবড়ো অ্যাটর্নি হওনি!'

হেমন্তের একখানা হাত চেপে ধরে মোহনলাল বললে, 'বেশ ভাই, বেশ! স্বীকার করা

গেল, আমরা দুজনেই মস্তবড়ো হয়েছি। তারপর, কেমন আছ বলো দেখি? রবিন, তুমিও ভালো তো?'

দুজনেই মানলুম, আমরা কেহই মন্দ নেই।

হেমন্ত বললে, 'কিন্তু তোমাকে এখানে দেখতে পাব বলে তো আশা করিনি। ব্যাপার কী? কারুর অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?'

মোহনলাল বললে, 'না, আমি এসেছি মি. চৌধুরির খবর নিতে। কাল ওঁর মাথার ওপর দিয়ে যে বিপদের ঝড় বয়ে গেছে, তাই শুনেই আমি ছুটে এসেছি। আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী ওঁরই চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা।' স্ত্রীর কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুখখানি বিমর্ষ হয়ে এল।

আমি বললুম, 'মোহনলাল, তোমার স্ত্রী মারা গিয়েছেন শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। শুনেছিলুম, তুমি ঈশানপুরের বিখ্যাত দানশীল জমিদার পরমানন্দ রায়চৌধুরির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেছিলে?'

—'একমাত্র কন্যা নয় রবিন, একমাত্র সন্তান। তাকে হারিয়ে আমার শ্বশুরমশাইয়ের যে-অবস্থা হয়েছে, দেখলে দুঃখে প্রাণ গলে যায়। আজ তিন মাস হল আমার স্ত্রী স্বর্গে গিয়েছেন। মি. চৌধুরি তাঁকে ঠিক নিজের মেয়ের মতন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করেছেন, ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও শোধ হবে না।'

ডাক্তার চৌধুরি দুঃখিত ভাবে বললেন, 'কিন্তু আমার সমস্ত যত্ন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাঁকে আমি বাঁচাতে পারিনি।'

মোহনলাল বললে, 'তাঁর জন্যে আপনি দায়ী নন। ভগবানের মার, কে বাধা দিতে পারে? সকলই আমার অদৃষ্ট।'

ভূপতিবাবু গাত্রোত্থান করে বললেন, 'আপনারা আলাপ করুন, আমি বিদায় হই। আমার অনেক কাজ বাকি—নমস্কার।'

ডাক্তার চৌধুরির কাছে গিয়ে মোহনলাল বললে, 'আপনি এখন কেমন আছেন? বড়ো বেশি আঘাত লেগেছে কি?'

ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার চৌধুরি বললেন, 'আঘাত সামান্য নয় বটে, তবে প্রাণে মারা পড়িনি বলে ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিই।'

মোহনলাল বললে, 'কে এই পাষণ্ড, যে আপনার মতন লোককেও হত্যা করতে চায়?'

—'আপনার বন্ধু মি. হেমন্ত চৌধুরিও সেই কথা জানবার জন্যে চেষ্টা করছেন।'

—'আমার শ্বশুরমশাইও আপনার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।'

—'তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মোহনলাল, তোমার সন্তানাদি কী?'

—'একটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারাই এখন তাদের দাদামশাইয়ের ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ। আমিও তাদের চোখের আড়াল করতে পারি না বলে শ্বশুরমশাই কলকাতায় বালিগঞ্জে এসে বাসা নিয়েছেন। রোজ সন্ধেবেলায় আমার বাড়িতে এসে নাতি-নাতনিকে খানিকক্ষণের জন্যে কোলে করে খেলা না করলে তাঁর প্রাণ যেন বাঁচে না।'

এইরকম আরও দু-চার কথার পর আমরাও উঠে বিদায় গ্রহণ করলুম।

রাস্তায় নেমে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি মোহনলালও ডাক্তার চৌধুরির বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

সে হন হন করে এগিয়ে আমাদের সামনে এসে বললে, 'হেমন্ত, রবিন। কাল সন্ধ্যার সময়ে আমার বাড়িতে তোমাদের দুজনের 'ডিনারে'র নিমন্ত্রণ রইল।'

হেমন্ত একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ কেন?'

—'নিমন্ত্রণটাই বড়ো নয়। তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় পরামর্শ আছে।'

—'গোপনীয় পরামর্শ?'

—'হ্যাঁ, বিশেষ গোপনীয় পরামর্শ। কলকাতা এই যে ডাক্তারের পর ডাক্তার হত্যা হচ্ছে, এ-সম্বন্ধে তোমাকে আমি গোটা-কয়েক দরকারি কথা বলতে চাই। শুনেছি এসব মামলার ভার নিয়েছ নাকি তুমিই?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে নিশ্চয়ই যেয়ো।'

—'যাব। তোমার ঠিকানা?'

—'দশ নম্বর শরৎ পাল রোড।

॥ সাত ॥

হত্যাকারীর নাম-ঠিকানা

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে গাড়ির ভিতরে উঠে বসে হেমন্ত বললে, 'মোহনলালের সঙ্গে দেখা হয়নি প্রায় এক যুগ! তার বিবাহেও সে আমাদের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি। আমরাও যদি বিবাহ করতুম, মোহনলালের কথা মনে পড়ত কি না সন্দেহ! তবু সে এ খবর রাখলে কেমন করে?'

—'কী খবর?'

—'আমি ডিটেকটিভ?'

—'হেমন্ত, তুমি যে এখন একজন নামজাদা লোক।'

—'জনসাধারণের কাছে নয়। আমি কাজ করি সকলের চোখের আড়ালে, শখের খাতিরে—খবরের কাগজে আমার নাম পর্যন্ত বেরোয় না।'

—'কিন্তু পুলিশ আর অপরাধীরা তোমাকে মিত্র আর শত্রু বলে চিনে ফেলেছে। তাদের কাছে এখন তুমি অত্যন্ত বিখ্যাত।'

—'কিন্তু মোহনলাল পুলিশের লোকও নয়, অপরাধীও নয়।'

একটু থেমে হেমন্ত আবার বললে, 'তারপর দ্যাখো। ডাক্তার চৌধুরির বাড়িতে যেতে যেতে ভূপতিবাবু কী বললেন, শুনেছ তো? খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কবল থেকে

নিস্তার পাবার জন্যে ডাক্তার চৌধুরি কালকের ব্যাপারটা একেবারে চেপে গিয়েছেন। এমন-কী যে-গলিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার বাসিন্দারা তাঁর নাম পর্যন্ত জানে না। তবু এত সকালে দুর্ঘটনার কথা মোহনলাল কোন সূত্রে জানতে পারলে?... বড়োই আশ্চর্য কথা রবিন, বড়োই আশ্চর্য কথা।'

এতক্ষণ পরে হেমন্তের এই বিস্ময় স্পর্শ করলে আমার চিত্তকেও। সত্যকথা, এসব ব্যাপার তো মোহনলালের জানবার কথা নয়!

হেমন্ত আবার বললে, 'দ্যাখো রবিন, এই ভূপতি লোকটাকে আমার ভালো লাগছে না।'

—'আমারও না।'

—'ইনস্পেক্টার সতীশবাবুর সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাই, কিন্তু ভূপতির সঙ্গে কাজ করা কঠিন। এই দ্যাখো না, তৃতীয় তাসের উপরে রক্তাক্ত আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, এ-কথা সে আমাকে একবারও বলেনি।'

—'বললে তো, ভুলে গেছে।'

—'শোনো কেন! এতবড়ো কথা পুলিশের লোক ভোলে না।'

—'তবে?'

—'ইচ্ছে করে চেপে গেছে। ভেবেছিল এই এক প্রমাণেই করবে কেল্লা ফতে! সবাইকে দেখাবে, আমি পারলুম না, কিন্তু সে নিজে করলে খুনিকে গ্রেপ্তার!'

—'তবে সে তোমার সাহায্য নিতে এসেছে কেন?'

—'বাধ্য হয়ে। নিশ্চয়ই সতীশবাবুর কথায়। সতীশবাবু একে তাঁর চেয়ে 'সিনিয়ার', তার উপরে এবারের গেজেটে দেখলুম, তিনি আসছে মাস থেকে হবেন 'অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার'। কাজেই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।...কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো রবিন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভূপতির এত লুকোচুরি ব্যর্থ হবে। ভারতবর্ষের কোথাও এই তাসের আঙুলের ছাপের জোড়া পাওয়া যাবে না—অর্থাৎ ভূপতি প্রমাণ করতে পারবে না যে, কোনও জানাশোনা দাগি অপরাধী এইসব ডাক্তারকে খুন করেছে।'

—'তোমার এমন দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ কী? তুমি কি কোনও মীমাংসায় এসে উপস্থিত হয়েছ?'

—'তা হয়েছি বই কি। নানা প্রমাণের মাঝখানে আমি যে সূত্র গেঁথে চলেছি, তা যে কম-জোরি নয় এটা বুঝতে আমার বাকি নেই। গতকল্য এগারোই তারিখে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে আজ সকালেই নিরাশায় আমার মন ভরে গিয়েছিল, এ কথা তুমি জানো। ভেবেছিলুম, আমার সব ধারণাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপরেই ভূপতির মুখে যখন কালকের দুর্ঘটনার কথা শুনলুম তখন আমার গভীর নিরাশার মধ্যে জ্বলল ফের আশার বাতি।'

আমি সাগ্রহে বললুম, 'বলো কী হেমন্ত! তাহলে তুমি কি সত্যের সন্ধান পেয়েছ?'

—'পেয়েছি।'

—'কে এই অপরাধী?'

—'তার নাম এখনও জানি না।'

—'তার ঠিকানা জেনেছ তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়, কোথায়?'

—'অন্ধকারে।'

—'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

—'না, সত্যিকথা বলছি।'

—'তাহলে তুমি অপরাধীর নাম বা ঠিকানা কিছুই জানো না?'

—'উঁহু।'

—'তবে তোমার এতটা আশার কারণ কী?'

—'মানুষ যে আশাবাদী। আশাই যে তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্বল।'

—'কিন্তু তোমার আশায় যদি ছাই পড়ে?'

—'ভয় নেই, তখন আমি কাঁদব না।'

—'কিন্তু শত্রু হাসবে।'

—'হাসতে দাও বন্ধু, হাসতে দাও। শত্রুকেও যে হাসাতে পারে সার্থক তার জীবন!'

আমি রাগ করে বললুম, 'ভূপতিকে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু তুমি হচ্ছ অসহনীয়!'

হেমন্ত বিপুল কৌতুকে অট্টহাস্য করে উঠল। হাসতে-হাসতেই বললে, 'ভায়া হে, অসহনীয় হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ! তপ্ত সূর্যও অসহনীয়, কিন্তু মানুষ তবু তাকে ভালোবাসে। এও জানি বন্ধু, যতই অসহনীয় হই, তুমিও আমাকে ভালোবাসতে ছাড়বে না। যাক ও-সব কথা, এই আমরা শরৎ পাল রোডে এসে পড়েছি। এখন খুঁজে দেখতে হবে আমাদের 'ডিনার' অপেক্ষা করছে কোন বাড়িতে!'

॥ আট ॥

তাসের পাঞ্জার গুপ্তকথা

মোহনলালের বাড়িতে গিয়ে মোহনলালের দেখা পেলুম না। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন একটি গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক—পরনে তাঁর খদ্দরের মোটা চাদর জামা কাপড়। দাড়ি-গোঁফ কামানো।

বললেন, 'এসো বাবা, এসো। তোমাদের পরিচয় আমি শুনেছি। মোহনলাল আমার জামাই, সুতরাং তোমরাও আমার ছেলের মতো।'

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে তাকালুম। ইনিই ঈশানপুরের ধনকুবের জমিদার পরমানন্দ রায়চৌধুরি! বাংলা দেশের কত হাসপাতাল, কত বিদ্যালয়, কত অনাথ-আশ্রম এবং কত দুর্ভিক্ষপীড়িত ও বন্যাগ্রস্ত জেলা যে এঁর অবারিত ধনভাণ্ডার থেকে কত লক্ষ টাকা সাহায্যলাভ করেছে, তার হিসাব কেউ জানে না।

পরম শ্রদ্ধাভরে আমরা দুজনেই নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

আমাদের আশীর্বাদ করে তিনি বললেন, 'বৈঠকখানায় বসবে এসো। মক্কেলের এক জরুরি কাজে মোহনলালকে হঠাৎ বেরুতে হয়েছে—সে এসে পড়ল বলে। যদিও বুড়ো হয়েছি, তবু মোহনলাল যতক্ষণ না আসে আমিই তোমাদের ভার গ্রহণ করতে পারব। এসো।'

তিনি নিজেকে বুড়ো বলে পরিচিত করলেন বটে, কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছিল চল্লিশ বছরের সবল ব্যক্তির মতো। অবশ্য তারপরে শুনেছিলুম, তিনি নাকি পঞ্চাশ পার হয়েছেন!

বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলুম। একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো-গুছানো ঘরটি। যেমন আলোর বাহার, তেমনি ছবির বাহার, তেমনি সোফা-কৌচ-কার্পেটের বাহার।

আমাদের সোফা-কৌচের উপরে আসন গ্রহণ করতে বলে পরমানন্দবাবু নিজে বসে পড়লেন কার্পেটের উপরে, আসনপিঁড়ি হয়ে।

হেমন্ত কৌচের উপরে বসতে গিয়েই দাঁড়িয়ে উঠে ব্যস্ত ভাবে বললে, 'ওকী, ওকী, আপনি বসবেন ওখানে!'

পরমানন্দবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বললেন, 'আর বাবা, আপনার বলতে সবাই যখন ছিল, তখন আমিও ছিলুম বিলাসী ফুলবাবু। এখন সবাই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে, তাই আমিও ছেড়ে দিয়েছি সমস্ত শখের বাহুল্য। আজ আমার শ্রেষ্ঠ আসন হচ্ছে ধরণী-আসন, শ্রেষ্ঠ আহার হচ্ছে হবিষ্যান্ন, শ্রেষ্ঠ চিন্তা হচ্ছে পরকালের চিন্তা!'

আমি বললুম, 'তবে আমরাও কার্পেটের ওপরে বসব।'

আমরা দুজনেই তাঁর সামনে কার্পেটের উপরেই আসন গ্রহণ করলুম।

তিনি আপত্তি করলেন না। বললেন, 'একালের ছেলেরা এখনও বয়োবৃদ্ধদের সম্মান ভোলেনি দেখে সুখী হলুম।'

তারপর তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হল খানিকক্ষণ। যদিও তিনি গম্ভীর নন, তবু এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মুখে একবারও দেখলুম না এতটুকু হাসির আভাস। পরমানন্দবাবু যেন মূর্তিমান বিষাদ! কথায় কথায় তিনি তাঁর স্বর্গীয় কন্যার প্রসঙ্গ তুললেন কয়েকবার।

বললেন, 'সংসারে আমার শেষ-বন্ধন ছিল ওই মেয়েটি। তাকেও আমি হারালুম—আমার মতন অভাগা আর কেউ নেই। দুটি শিশু নাতি-নাতিনি আছে বটে, কিন্তু তাদের ভরসা আর রাখি না! ওই শিবরাত্রির সলতে দুটি জ্বলতে-জ্বলতেই যেন চোখ বুজতে পারি—এখন এই আমার একমাত্র কামনা!'

এমন সময়ে মোহনলাল এসে হাজির। তাকে দেখেই পরমানন্দবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই তোমাদের বন্ধু এল, আমার পালাও ফুরুল! নাও, এখন ওপরে উঠে বোসো! তোমাদের পাশে কি আমাকে মানায় বাবা? এ যে শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ!' তিনি তালতলার চটি পরে সশব্দে চলে গেলেন।

মোহনলাল কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'ভাই, আমি ছিলুম না বলে তোমরা—'

হেমন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'থাক, তুমি যা বলতে চাও, বুঝেছি। আগে কিছু চায়ের ফরমাজ করো দেখি।'

ভৃত্যকে চা আনতে হুকুম দিয়ে মোহনলাল বললে, 'আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হল?'

আমি হেসে বললুম, 'আমরা তো আলাপ করতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু ওঁর মন তো দেখলুম বিলাপে ভরা।'

—হ্যাঁ, উনি নিজেও সেটা বোঝেন, তাই সমাজে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছেন।'

হেমন্ত বললে, 'কিন্তু চমৎকার চিত্তাকর্ষক লোক! ওঁর অবর্তমানে ঈশানপুরের জমিদারির মালিক হবে কে?'

—'জমিদারির অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে আমার ছেলে, কিন্তু নগদ টাকাকড়ির সমস্তই উনি সাধারণ সৎকার্যে দান করে যেতে চান। এরই-মধ্যে উইলও নাকি হয়ে গেছে।'

আমি বললুম, 'এমন সাধুপুরুষ একালে দেখা যায় না।'

চা এল। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, 'এইবার কাজের কথা হোক। আমার সঙ্গে তোমার কী পরামর্শ আছে?'

মোহনলালের মুখের উপরে একটা কালো ছায়া নেমে এল। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, 'ঠিক পরামর্শ নয় ভাই। একটা কারণে আমি বড়ো বিস্মিত হয়েছি।'

—'কারণটা শুনি।'

—'তাহলে একটু গোড়া থেকেই বলতে হয়। কাল তোমাকে বলেছি, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে আজ তিন মাস। তার আগে প্রায় দেড় বৎসর ধরে তিনি রোগ ভোগ করেছেন, আর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন ডাক্তার সুনীল চৌধুরির চিকিৎসাধীনে।'

—'অসুখটা কী?'

—'অ্যালোপাথরা বলেছেন ক্যানসার, কবিরাজরা বলেছেন অন্য রোগ। রোগ কিছুতেই কমছে না দেখে মি. চৌধুরি আর-চারজন বড়ো বড়ো ডাক্তার এনে একদিন পরামর্শ করলেন। পরামর্শে স্থির হল, অস্ত্রচিকিৎসার দরকার। আমি আর বিশেষ করে আমার শ্বশুরমশাই ছিলুম অস্ত্রচিকিৎসার বিরুদ্ধে। কিন্তু ডাক্তাররা এমন ভয় দেখালেন যে, শেষটা আমাদেরও বাধ্য হয়ে মত দিতে হল। অস্ত্রচিকিৎসার তিন দিন পরে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।'

হেমন্ত বললে, 'অত্যন্ত দুঃখের কথা। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে এখন আর আলোচনা করে লাভ তো নেই।'

—'জানি। কিন্তু আমার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিনি।'

—'তবে?'

—'কলকাতায় ডাক্তারের পর ডাক্তার হত্যা হচ্ছে, আর তুমিই হচ্ছ এই রহস্যময় মামলার প্রধান পরামর্শদাতা।'

—'কে তোমায় বললে?'

—'নামে দরকার নেই। বলো, একথা সত্য কি না?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনজন ডাক্তার মারা পড়েছেন, চতুর্থ ডাক্তার মি. চৌধুরি মারা যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছেন।'

—'আক্রান্ত হতে বাকি আছেন আর-একজন মাত্র।' গম্ভীর স্বরে হেমন্ত বললে।

আমি সবিস্ময়ে হেমন্তের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম। এ কথা তো সে আমার কাছেও প্রকাশ করেনি!

চমকে উঠে বিবর্ণ মুখে মোহনলাল বললে, 'এ কথা তুমিও জানো?'

—'জানি।'

বাধো বাধো গলায় থেমে থেমে মোহনলাল বললে, 'আমার স্ত্রীর জন্যে ডাক্তারদের যে পরামর্শসভা বসেছিল, তাতে কোন কোন চিকিৎসক ছিলেন জানো? মোহিনীমোহন দত্ত, এন বসু, এম সি বিশ্বাস, সুনীল চৌধুরি আর সন্তোষকুমার সেন। তুমি দেখছ হেমন্ত, সেদিন যাঁরা আমার বাড়িতে হাজির ছিলেন, আক্রমণ হয়েছে কেবল তাঁদের উপরেই—বাকি একজন ছাড়া। কিন্তু কে বলতে পারে কবে তাঁরও মাথায় পড়বে খাঁড়া?'

—'হত্যাকারীর দৃষ্টি কবে-যে সন্তোষবাবুর উপরে পড়বে, সেটা আমার অজানা নেই!' হেমন্ত কথাগুলো বললে বেশ সহজ ও শান্ত ভাবেই।

ভয়বিহ্বল চোখে মোহনলাল বললে, 'ভাই, এই আমার গুপ্তকথা। আমি এ রহস্যের কারণ বুঝতে পারছি না। দিন-রাত খালি এই কথা ভাবছি, অথচ কারুর কাছে কিছু প্রকাশ করতেও সাহস পাচ্ছি না। তুমি এর কোনও সদুত্তর দিতে পারো?'

—'সেটা আমার সাধ্যের বাইরে।'

—'অথচ তুমি এত কথা জানো!'

—'অনেক কথাই জানি, কিন্তু আপাতত শেষ কথা বলবার শক্তি আমার নেই। আমার অবস্থা এখন কীরকম জানো! 'পরো দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে-তিমিরে তুমি সেই তিমিরে'।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার শ্বশুরমশাই এ কথা জানেন?'

—'জানেন। তিনি আবার আমারও চেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মন নরম। কেউ একটা পোকা মারলেও তাঁর সহ্য হয় না। তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ভয়ে তিনি খবরের কাগজ পড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন।'

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ডাক্তার সন্তোষকুমার সেনের ঠিকানা কী?'

—'পাঁচ নম্বর মদন ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ।'

ঠিকানাটা পকেটবুকে টুকে নিয়ে হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মোহনলাল, আমার খিদে পেয়েছে।'

—'চলো, খাবার তৈরি।'

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই দেখি, উপরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন পরমানন্দবাবু।

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি বাসায় যাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ বাবা, রাত হল। তোমার বন্ধু দুটিকে ভালো লাগল। ওঁদের আবার দেখতে পেলে খুশি হব।'

পরমানন্দবাবু চলে গেলেন। আমরাও মোহনলালের পিছনে পিছনে চললুম খাবার-ঘরের দিকে।

গাড়িতে উঠে বাড়ি ফেরবার পথে হেমন্তকে বললুম, 'তুমি আগে থাকতেই জানতে, পাঁচজন ডাক্তারের মৃত্যু হবার সম্ভাবনা?'

—'জানতুম বললে ঠিক হবে না, অনুমান করেছিলুম।'

—'অথচ আমার কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করোনি।'

—'এ ব্যাপারটা ক-খ পড়ার মতোন সহজ, আমি আবার প্রকাশ করব কী?'

—'তোমার কাছে সহজ হতে পারে, আমার কাছে নয়।'

—'তুমি যদি ভূপতির দলের লোক হও, আমি কী করব বলো? একদিন তোমাকে আমি ইঙ্গিতও দিয়েছিলুম যে, এই মামলার অপরাধী হচ্ছে 'রোমান্টিক' বা উৎকট কল্পনারসিক। এমনকি এই রহস্যময় তাসের পাঞ্জার দিকেও তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম, তবু তুমি বুঝতে চেষ্টা করোনি। ঘটনাস্থলে বার বার কেন ওই তাসের পাঞ্জা পাওয়া যায়? আর কোনও ফোঁটার তাস নয়, কেবল পাঞ্জা! কেন প্রথম খুনের পরে তার একটা ফোঁটা, দ্বিতীয় খুনের পর দুটো, তৃতীয় খুনের পর তিনটে ফোঁটা কেটে বার করে নেওয়া হয়? এর কারণ কি এই নয় যে, হত্যাকারী বার বার পাঞ্জা বা পাঁচ ফোঁটার তাস ফেলে গিয়ে এইটেই জানাতে চায় যে, পাঁচজন লোককে হত্যা করাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য? আর এক-একজনকে খুন করার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা ফোঁটা লুপ্ত করে বোঝবার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট সহজ করে দিয়ে গেছে?'

আমার চোখ ফুটল। লজ্জিত স্বরে বললুম, 'ভাই, আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভেবেছিলুম ও তাসের পাঞ্জা হচ্ছে কোনও গুপ্ত দলের সাংকেতিক চিহ্ন!'

—'হ্যাঁ, ও কথা তুমি মনে করতে পারতে, যদি প্রত্যেক বারেই পাওয়া যেত অক্ষত তাসের পাঞ্জা। কিন্তু প্রত্যেক খুনের পরে কাটা ফোঁটার সংখ্যা বাড়ছে দেখেও কেমন করে তুমি অমন ভুল ধারণা করেছিলে?'

—'আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না ভাই, আমি ঘাট মানছি।'

—'না রবিন, এ ঘাট মানার কথা নয়। ভগবান আমাদের দুজনকেই চোখ-কান দিয়েছেন, মানুষের উপযোগী মস্তিষ্ক দিতেও কৃপণতা করেননি। আমরা দুজনে একই সময়ে একই ঘটনাক্ষেত্রে একসঙ্গে চলছি-ফিরছি, সব দেখছি-শুনছি, পরীক্ষা আর আলোচনা করছি। তোমার আড়ালে কিছুই হচ্ছে না, তবু তুমি যদি সত্য উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে সেটা হবে দুঃখের কথা! খালি তুমি নও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই দলে; তারা কান থাকতেও কালা, চোখ থাকতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকতেও নির্বোধ। আমাদের সকলের ভিতরেই আছে অব্যবহৃত শক্তি—সেই শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখো, এই আমার অনুরোধ।'

—আমি জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেলুম না।

একটু চুপ করে থেকে হেমন্ত বললে, 'আজ একটা মস্ত দরকারি ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?'

—'কখন?'

—'যখন আমরা মোহনলালের বৈঠকখানা থেকে খাবার ঘরে যাবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াই, তখন তুমি ছিলে ঠিক মোহনলালের পাশে আর আমি ছিলুম পিছনে—সুতরাং দেখবার সুবিধা ছিল তোমারই বেশি। মোহনলাল যখন তার শ্বশুরের সঙ্গে কথা কইছিল, তখন তুমি কিছু লক্ষ্য করোনি?'

—'না।'

—'রবিন, তোমার ওপরে রাগ করব কী, তুমি হচ্ছ করুণার পাত্র! এতবড়ো স্পষ্ট আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটাও তোমার চোখ এড়িয়ে গেল? ধিক!'

আমি অপরাধীর মতো বললুম, 'তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই! কী আমার চোখ এড়িয়ে গেছে? তুমি কি মোহনলালকেই সন্দেহ করো?'

হেমন্ত ধমক দিয়ে বললে, 'থামো, থামো! আর কোনও কথা তোমার জিজ্ঞাসা করবার অধিকার নেই! যাও, মায়ের কোলে শুয়ে ঝিনুকে করে দুধ খাওগে যাও—আমার সঙ্গে আর বেড়িয়ো না!'

॥ নয় ॥

ক্লোরিন

মোহনলালের বাড়িতে এমন কী রোমাঞ্চকর দৃশ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, গেল-দু-দিন ধরে সেই কথাই ভাবছি আর ভাবছি ক্রমাগত।

কিন্তু কিছুতেই কিছু আন্দাজ করতে পারলুম না।

মোহনলালকে এই ভয়াবহ কাণ্ডে সন্দেহ করবার কোনও কারণ আছে নাকি? তার বাড়ির পরামর্শসভায় যে-পাঁচজন ডাক্তার ছিলেন এবং যাঁরা একবাক্যে মত দিয়েছিলেন তার স্ত্রীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করবার জন্যে, আক্রমণ হয়েছে কেবল তাঁদেরই চারজনের উপরে। এটা কিছু সন্দেহের কথা বটে! তবে অস্ত্রোপচারের পর তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে মোহনলাল বড়োজোর ডাক্তারদের উপরে বিরক্ত হতে পারে। কিন্তু বিরক্তি এক কথা, আর নরহত্যা অন্য কথা। মোহনলালের মতন শিক্ষিত যুবক, এই অদ্ভুত কারণে যে নরহত্যা করতে পারবে, এ কথা স্বপ্নেরও অগোচর।

আর হত্যাকারী হলে মোহনলাল কখনও হেমন্তের কাছে সেদিন অতবড়ো গুপ্তকথাটা জাহির করে ফেলত না। সে যখন জানে যে, হেমন্তই এইসব খুনের মামলার তদারক করছে, তখন সে কি তাকে যেচে ডেকে এনে আত্মপ্রকাশ করে একটা ভীষণ সন্দেহের বোঝা নিজের মাথার উপরে গ্রহণ করতে পারত?

আচ্ছা, অতখানি সরলতা তার ছলনা নয়তো? হয়তো সে বুঝেছে হেমন্তের মতন পাকা ডিটেকটিভের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়, যে-সত্য সে পরে নিজেই আবিষ্কার করে ফেলবে, সে-সম্বন্ধে আগে থাকতে নির্দোষের মতন সাফাই গাইলে অনেকটা নিরাপদ হবার সম্ভাবনা আছে; আর এটাও হয়তো ভেবেছিল যে, তার সরলতায় ভুলে হেমন্ত কথায় কথায় ফাঁস করে ফেলবে—সে কতখানি জানে এবং কতখানি জানে না।

ডাক্তার চৌধুরি বলেন, হত্যাকারী তাঁকে আক্রমণ করবার আগে 'প্রতিশোধ' বলে চাপা গর্জন করে উঠেছিল। এ কথাও যে তো সন্দেহকে চালিত করে মোহনলালের দিকেই।

কয়েকবার ভেবেছিলুম, হেমন্তের কাছে এই প্রসঙ্গটা তুলি। কিন্তু পারিনি, আবার ধমক খেয়ে বোকা বনবার ভয়ে!

আজ সুগম্ভীর মুখে আধিক্যতার ভাব নিয়ে ভূপতিবাবু এসে হাজির। তাঁর মুখ-চোখ ও চলনভঙ্গি বলছে যেন—আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো, হাম মার দিয়া কেল্লা!

ইজিচেয়ার-শায়ী হেমন্ত অর্ধমুদিত নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললে, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আপনি আজ জবরে খবরের রাজা। কিন্তু কোন দিক জয় করলেন?'

—'আগে চাই চা—কারণ গলা শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে চাই টা—কারণ উদর-গহ্বরে নাড়ি-ভুঁড়ি ছাড়া আর যাবতীয় কিছু হজম হয়ে গেছে। চপ-কাটলেট কারি-কোর্মা এমনকি ফাউল-রোস্ট পেলেও আপত্তি করব না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বলেন কী মশাই? এই বৈকালে চায়ের সঙ্গে কারি-কোর্মা-রোস্ট! ও যে ভদ্রসমাজে অবৈধ রীতি—একেবারে অচল!'

—'আমি বাবা গেরস্তের ছেলে, এ খাব না, ও খাব না বলি না! সম্মুখ-দেশে যে-কোনও খাদ্য আবির্ভূত হবে, আমার উদর বলবে—স্বাগত। ভাই হেমন্তবাবু, আজ কী কী আশা করতে পারি?'

—'আপাতত কাটলেট আর টিকিয়া-কাবাব আদেশ করলেই আসতে পারে।'

—'আর পেয়ালা-তিনেক চা?'

—'নিশ্চয়।'

—'বেশ, তাই সই!' ভূপতিবাবু চেয়ারের উপরে যে আসনগ্রহণ করলেন, পাড়ার লোকে সেটা জানতে পারলে!

—'তারপর খবরটা শুনি।'

—'খুনির আঙুলের ছাপের কতকটা কিনারা হয়েছে।'

—'কতকটা মানে?'

—'ওটা কথার কথা আর কী! পাঞ্জাবের একটা পেশোয়ারিরি আঙুলের সঙ্গে আমাদের তাসের পাঞ্জার আঙুল মিলে গেছে।'

—'মিলে গেছে?' সবিস্ময়ে এই কথা বলে হেমন্ত খাড়া হয়ে উঠে বসল।

—'ওই, প্রায় মিলে গেছে আর কী।'

—'ওঃ, প্রায়?' হেমন্ত আবার ইজিচেয়ারের উপরে এলিয়ে পড়ল।

—'অবিশ্যি দু-তিন জায়গায় মেলেনি।'

—'সে আমি বুঝেছি।'

—'না মেলবার কারণও আছে।'

—'আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ। যে-সময়ে পেশোয়ারিটার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়, তখন তার আঙুলটা আহত ছিল।'

হেমন্তের মুখে আবার উত্তেজনার চিহ্ন দেখা দিলে—কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেই পেশোয়ারিটা এখন কোথায়?'

—'তিন মাস আগে সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ে। সেখান থেকে সে যে বর্ধমানে আসে, তাও জানা গিয়েছে। কিন্তু তারপর তার আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বলি, যে বর্ধমানে এসেছে সে কলকাতাতেও আসতে পারে—কী বলেন, তাই নয় কি? কলকাতা পুলিশের টনক নড়িয়ে দিয়েছি—চারিদিকে চলছে খোঁজাখুঁজি। বেটা ধরা পড়ল বলে।'

হেমন্ত বললে, 'কিন্তু এই পেশোয়ারি ভদ্রলোক বেছে বেছে বাঙালি ডাক্তার হত্যা করবে কেন?'

—'তার কারণ তো আগেই দেখিয়েছি। একদল হাতুড়ে ডাক্তার পথ থেকে কাঁটা সরাবার জন্যে গুন্ডা নিযুক্ত করেছে।'

—'গুন্ডারা ঘটনাস্থলে তাসের পাঞ্জা ফেলে যাবে কেন?'

—'ওটা তাদের গুপ্ত দলের সাংকেতিক চিহ্ন। অনেক মাথা খাটিয়ে ভেবে-চিন্তে আমি এই সত্য আবিষ্কার করেছি।'

—'আপনি আর রবিন দেখছি একই মতাবলম্বী।'

আমার দিকে চেয়ে, দুই ভুরু নাচাতে নাচাতে ভূপতিবাবু বললেন, 'তাই নাকি ভায়া, তাই নাকি? এই জন্যেই ইংরেজি প্রবাদে বলে—মহাজনরা একইরকম ভাবনা ভাবেন।' বলেই ঘরের ছাদ-দেওয়াল ফাটিয়ে এমন হা হা রবে চেঁচিয়ে উঠলেন যে, দুটো টিকটিকি প্রাণপণে দৌড় মেরে অদৃশ্য হল কোথায়!

হেমন্ত আমাকে ভূপতিবাবুর দলে ফেলে দিলে বলে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল।

ভূপতিবাবু হাঁকলেন, 'ওরে বাবা মধু, খানা কই রে, খানা কই?'

মধু খাবার হাতে করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে।

হেমন্ত বললে, 'ভূপতিবাবু, বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি ডিটেকটিভরা আঙুলের ছাপকে খুব বেশি আমল দেয় না।'

—'দেয় না নাকি?' একখানা আস্ত কাটলেট অনায়াসে বদন-বিবরে নিক্ষেপ করে ভূপতিবাবু জড়িত স্বরে বললেন, 'তারা গাধা।'

—'গাধার সঙ্গে তাদের কোনও সাদৃশ্য দেখিনি। আঙুলের ছাপকে খুব বেশি আমল না দিলেও তারা অগ্রাহ্য করে না।'

—'তবে?'

—'অপরাধী গ্রেপ্তার করবার জন্যে তারা আঙুলের চেয়ে সুবিধাজনক উপায় আবিষ্কার করেছে।'

ইতিমধ্যে দুই বিরাট গ্রাসে দু-খানা কাটলেট উড়ে গেছে। এইবার টিকিয়া-কাবাবকে আক্রমণ করে ভূপতিবাবু প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'উপায়টা কী শুনি?'

—'কান।'

বিপুল বিস্ময়ে বাকি টিকিয়া-কাবাব খানার কথা ভুলে গিয়ে ভূপতিবাবু বললেন, 'কান? কীসের কান? গাধার কান নাকি?'

—'না, গাধার কানের উপরে দখল আছে কাদের, সেকথা এখন বলে শান্তিভঙ্গ করতে চাই না। ফরাসি ডিটেকটিভদের কারবার কেবলমাত্র মানুষের কান নিয়ে।'

বাকি টিকিয়া-কাবাব খানাকে উদর-ভাণ্ডারে প্রেরণ করে ভূপতিবাবু বললেন, 'আপনার কথা মশাই, বুঝতে পারছি না।'

—'আমি যখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি শহরে বেড়াতে যাই, তখন ফরাসি পুলিশের প্রধান কার্যালয় দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে কেবল পুলিশের লোকের জন্যে একটি মস্ত জাদুঘর আছে। সেই ঘরে ঢুকে প্রথমেই কী চোখে পড়ল জানেন? এক হাত বড়ো একখানা মানুষের কান! সেই কানের এক এক অংশ নীল, লাল, হলদে ও সাদা রঙে আঁকা! এক-একটি অংশ এক-একটি অক্ষরে চিহ্নিত। তার এই রকম কুড়িটি বিভিন্ন অংশ আছে।'

চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালা দ্বিতীয় চুমুকে খালি করে ভূপতিবাবু বললেন, 'বাব্বা! কান নিয়ে এত টানাটানির মানে হয় না!'

—'তাদের মতে, খুব মানে হয়। কারণ তারা বহু পরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছে যে, সারা জগৎ খুঁজলেও একরকম দেখতে দু-খানা কান আবিষ্কার করা অসম্ভব। তাই তারা অপরাধী গ্রেপ্তার করে কান দেখে।'

—'কান টানলেই মাথা আসে বলে?'

—'প্রায় সেই রকমই আর কী। সব দেশেই অপরাধীদের ফোটো তুলে রাখা হয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে আসামি শনাক্ত করবার জন্যে। কিন্তু ফরাসি পুলিশের মতে, এ প্রথা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ পৃথিবীতে অবিকল একই রকম দেখতে একাধিক মানুষের অভাব নেই।'

—'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

—'আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তাদের কিছু আসে-যায় না। তবে আমাকে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হল। কারণ জাদুঘরের অধ্যক্ষ আমাকে দু-খানি ফোটো দেখিয়ে বললেন, 'এই ছবি দু-খানা দেখে আপনার কী মনে হয়?' আমি বললুম, 'এ দেখছি তো একই লোকের দু-রকম ফোটো।' তিনি বললেন, 'না। এ দু-খানা মোটেই একজন লোকেরই ফোটো নয়। দেখছেন, প্রকৃতি কী রকম অবিবেচক? তিনি দুজন মানুষ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন—কিন্তু তাদের মুখ দেখতে অবিকল একরকম! এতে আমাদের—অর্থাৎ গোয়েন্দাদের কতটা বিপদে পড়তে হয় বলুন দেখি? ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে লোক গ্রেপ্তার করলুম, কিন্তু আদালতে প্রমাণিত হল সে আমাদের ফোটোর মানুষই নয়! আসামি খালাস পেয়ে করলে আমাদের নামে মানহানির নালিশ।...তারপর দেখুন, রাস্তায় চলতে চলতে কারুর উপরে সন্দেহ হলেই আমরা তাকে ধরে বলতে পারি না—মশাই, বার করুন তো হাত, আমরা আপনার আঙুলের ছাপ চাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কান হয় আমাদের সহায়।'... বুঝেছেন ভূপতিবাবু, ফরাসি গোয়েন্দারা কান সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশেষজ্ঞ। গোয়েন্দা-পাঠশালায় ভরতি হলেই তাদের কর্ণ সংক্রান্ত শিক্ষা নিতে হবে। তারপর তারা যখন কোনও অপরাধী ধরতে যায় তখন তাদের আসামির কানের বিশেষত্বগুলো বলে দেওয়া হয়। আসামি যে-রকম ছদ্মবেশই ধারণ করুক আর তাদের নাক ঠোঁট চোখ যে-রকমই হোক, ফরাসি গোয়েন্দা

সেসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। সে কারুর মুখের দিকেই তাকায় না। বৃহৎ জনতার ভিতরেও কেবল কান দেখেই আসামিকে চিনতে পারে।'

ভূপতিবাবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'যা! কী যে বলেন!'

—'বিশ্বাস করুন ভূপতিবাবু, এর একটাও আমার বানানো কথা নয়। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, স্বকর্ণে যা শুনেছি, তাই আপনাকে বললুম।'

ভূপতিবাবু বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না, কিন্তু আর কোনও প্রতিবাদ করলেন না। একটু পরেই তিনি বিদায় নিলেন।

হেমন্ত অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কী ভাবলে। তারপর বললে, 'রবিন, ভূপতি ওই পেশোয়ারির কথা বলে আমার মন খারাপ করে দিয়ে গেল। ওর কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এতদিন ধরে যা গড়ে আসছি তার সমস্তটাই ভেঙে পড়ে যাবে তাসের বাড়ির মতো! ভূপতির কাছে আমারও হবে বিষম পরাজয়!'

আমি বললুম, 'দিন-রাত তুমি একই ভাবনা নিয়ে বড়ো বেশি মাথা ঘামাচ্ছ! চলো, মনকে ছুটি দেবার জন্যে আজ একটু বেড়িয়ে আসি।'

—'মন্দ কথা নয়। কিন্তু কোথায় যাই বলো দেখি?'

—'অনেক দিন পরে শিশির ভাদুড়ী আবার 'আলমগীরে'র ভূমিকায় নামবেন। সেখানে গেলে কেমন হয়?'

—'মন্দ কথা নয়। খুনির পরচুলার চেয়ে শিশির ভাদুড়ীর পরচুলা ঢেরবেশি নিরাপদ! ভাদুড়ীর জয় হোক!'

... সে-রাত্রে থিয়েটার ভাঙল রাত প্রায় একটার সময়ে। অভিনয় দেখতে-দেখতেই শুনতে পেয়েছিলুম ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, এক হাঁটু জল। হেমন্তের বাড়ির খানিক আগেই মোটর হল অচল। হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে হেমন্তের বাড়ির সামনে এসে বললুম, 'তুমি তো নিজের আস্তানায় এলে। এখন আমার উপায়?'

—'কেন, তুমিও আমার শয্যার অংশগ্রহণ করবে চলো না!'

অগত্যা তার প্রস্তাবেই সায় দিলুম।

দোতলায় হেমন্তের শয়নগৃহ। বাহির থেকে দরজার শিকল খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই হেমন্ত চিৎকার করে আবার এক লাফ মেরে বাহিরে এসে পড়ল।

আমি চমকে উঠে বললুম, 'কী, কী? অমন করলে কেন?'

দু-হাতে বুক চেপে ছুটে নীচে নামতে নামতে হেমন্ত প্রায় রুদ্ধ-স্বরে বললে, 'পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো!'

হতভম্বের মতো তার পিছনে পিছনে ছুটে নীচে নেমে গেলুম। নীচের দালানে বসে পড়ে হেমন্ত খকখক করে ভয়ানক কাশতে লাগল।

কিছুই বুঝতে পারলুম না—আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনের ভিতরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে লাগল—তার শোবার ঘরে কী আছে? আমরা নীচে পালিয়ে এলুম কার ভয়ে? হেমন্ত অমন ছটফট করছে কেন?

খানিকক্ষণ পরে সে একটু সুস্থ হল।

—'ব্যাপার কী হেমন্ত?'

—'ভগবান রক্ষা করেছেন, আর একটু হলেই প্রাণে মারা পড়তে হত!'

—'কী বলছ তুমি?'

—'ক্লোরিন!'

—'সে আবার কী?'

—'বিষাক্ত গ্যাস!'

—'তোমার ঘরে?'

—'হ্যাঁ, আমার ঘরে। আমি ও-গ্যাস চিনি।'

—'কিন্তু তোমার ঘরে গ্যাস আসবে কোত্থেকে?'

—'সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।' হেমন্ত নীরবে ভাবতে লাগল। তারপরে গম্ভীর স্বরে বললে, 'রবিন, আমরা যাদের খুঁজছি আজ তাদের কেউ এসেছিল আমার বাড়িতে।'

—'সর্বনাশ, বলো কী হে!'

—'খুনি বুঝেছে আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে না পারলে সে নিরাপদ হবে না।'

—'কিন্তু সে গ্যাস ব্যবহার করলে কেমন করে। তোমার ঘরের দরজা তো বাহির থেকে বন্ধ ছিল!'

—'হাঁ। বৃষ্টি পড়ছে বলে মধু জানলাগুলোও বন্ধ রেখেছে। কিন্তু পাশের মাঠের বটগাছ বেয়ে আমার বাড়ির দোতলার ছাদে ওঠা কিছুমাত্র কঠিন নয়। লক্ষ করলেই দেখবে, আমার ঘরের 'ভেন্টিলেটার'গুলো অতিরিক্ত বড়ো। ঘরের ভিতরে হয়তো বিষাক্ত গ্যাস পাঠানো হয়েছে ওই পথেই। খুব-সম্ভব খুনির আবির্ভাব বেশিক্ষণ আগে হয়নি। সে ভেবেছিল আমি ঘরের ভিতরেই ঘুমিয়ে আছি।... রবিন, ভাগ্যে আমি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম! তোমাদের শিশির ভাদুড়ী আমার প্রাণরক্ষা করেছেন!'

বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। খুনি যখন আমাদের চেনে, তখন আমরাও হয়তো তাকে চিনি।... কেবল সাহসী নয়, তার মৌলিকতা ও চাতুর্যও বিস্ময়কর। ক্লোরিন! আমি তার নাম শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার গুণাগুণ কিছু জানি না। হেমন্ত রসায়নবিদ্যায় পণ্ডিত, ও-সমস্ত নিয়ে নিয়মিত নাড়াচাড়া করার অভ্যাস তার আছে—তাই সে এত সহজেই আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। কিন্তু ধন্য এই অজনা হত্যাকারী। ক্লোরিনের সাহায্যে নরহত্যা করবার চেষ্টা এর আগে আর কোনও ভারতীয় খুনি করেছে বলে শুনিনি।

হেমন্ত বললে, 'গত মহাযুদ্ধে জার্মানরাই প্রথমে এই নীলাভ হলদে রঙের সাংঘাতিক গ্যাস প্রথম ব্যবহার করে। ডাক্তারদের ক্লোরোফর্মেও এই গ্যাসের অংশ আছে। ক্লোরিন যাকে মারে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়েই মারে। এই দ্যাখো না, তার সংস্পর্শে আসতে না আসতেই আমারই কী দশা হয়েছে! এখনও আমি ভালো করে নিশ্বাস টানতে পারছি না!'

॥ দশ ॥

মহম্মদের আবির্ভাব ও তিরোভাব

দুপুরবেলায় হস্তদন্তের মতন ঘরের ভিতরে ঢুকেই ভূপতিবাবু বললেন, 'বেটা বড়োই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল মশাই!'

হেমন্ত 'ক্রিমিনলজি'র পাতা ওলটাচ্ছিল, আমি পড়ছিলুম বাইরনের কবিতা।

বইখানা বন্ধ করে হেমন্ত বললে, 'পালিয়ে গেল? কে?'

—'মহম্মদ খাঁ!'

—'ও, আপনার আবিষ্কৃত সেই পেশোয়ারি?'

—খুশি হয়ে একগাল হেসে ভূপতিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, সে আমারই আবিষ্কার বটে। আপনি তো পারলেন না, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকেই আবিষ্কার করতে হল!'

—'তাহলে মহম্মদ খাঁ বহাল-তবিয়তে রাজধানীতেই বিরাজমান? বেশ বেশ, আপনার সিদ্ধান্ত দেখছি আরও দৃঢ় হল!'

—'তা হলই তো! চেষ্টা করলে কী না হয়?'

—'চেষ্টা করলে আরশোলা কি পাখি হতে পারে?'

—'পাখি না হোক উড়তে পারে তো?'

—'সাধু! আপনার যুক্তি অকাট্য।'

—'ঠাট্টা রাখুন, কাজের কথা শুনুন। লোকের মুখে শুনলুম, মহম্মদ টেরিটিবাজারের এক কফিখানায় গিয়ে ঢুকেছে। তখনই লোকজন নিয়ে আমিও সেখানে ছুটলুম। কফিখানায় গিয়ে দেখি, সে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে চেপে ধরতে গেলুম। কেউ তাকে ইশারায় সাবধান করে দিলে কি না জানি না, কিন্তু তার কাছে যেতেই সে আচমকা উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার পেটে মারলে এক লাথি। আমি তো তখনই পপাতধরণীতলে। সে বেটা দৌড় মেরে পিছনের দরজা দিয়ে কোথায় সরে পড়ল।'

—'আর আপনি পেটে হাত বুলোতে বুলোতে থানায় ফিরে এলেন?'

—'হাসছেন বটে, কিন্তু বেটার দৈত্যের মতন চেহারা দেখলে ও-হাসি শুকিয়ে যেত! জানেন না তো, তার লাথিতে কী জোর! আপনারা হচ্ছেন গিয়ে ইজিচেয়ারের বাবুগোয়েন্দা! আমাদের মতন হাতেনাতে আসামি ধরতে হলে টের পেতেন মজাটা!'

—'বসুন, বসুন, বিশ্রাম করুন। একটু শরবত-টরবত খাবেন?'

—'দেখতেই পাচ্ছেন গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি! শরবত পেলে তো বাঁচি!'

শরবত পান করে পাখার তলায় বসে ভূপতিবাবু যখন একটু ঠান্ডা হলেন, হেমন্ত বললে, 'আপনি 'সাইকলজি' পড়েছেন?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে ভূপতিবাবু বললেন, 'কেন বলুন দেখি?'

—'প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারীর উচিত মনোবিজ্ঞান পাঠ করা।'

—'পড়ে কী ঘোড়ার ডিম হবে?'

—'এমন অনেক অপরাধ আছে, মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত না হলে যার গুপ্তকথা বোঝা যায় না। মানুষের মন হচ্ছে এক অদৃশ্য আশ্চর্য জগৎ। সেখানে একই সঙ্গে থাকে ভগবানের আশীর্বাদ আর শয়তানের অভিশাপ। সেখানে কালোকে জড়িয়ে থাকে আলো। সেখানে কুৎসিতের সঙ্গে সুন্দর খেলে লুকোচুরি খেলা। মানুষ সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পূর্ণ মন্দ নয়—ওই দুইয়ে জড়িয়েই মানুষ পূর্ণ আকার পায়। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান হলে বুঝবেন, দানবও করতে পারে দেবতার কাজ, আবার দানব হতেও দেবতার বেশিক্ষণ লাগে না। আপনারা আসামির মনকে কেবল অপরাধী মন বলেই ধরে নেন, গ্রহণ করেন না তাকে মানুষের মন বলে।'

—'বাপ রে, এ যে কাব্যি।'

—'যা বললুম, মনে করে রাখবেন। কেন বললুম, পরে বুঝতে পারবেন। যাক, এ কথা। তাহলে ভূপতিবাবু, আপনার মতে মহম্মদই হচ্ছে আসল অপরাধী?'

—'নিশ্চয়। নইলে সে পালাবে কেন?'

—'এ যুক্তিটাও চমৎকার। কিন্তু একটা মস্ত কথা ভুলবেন না। মৃত ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ান আর ডাক্তার সুনীল চৌধুরির মতে, যে-লোকটা দু-বারই মোটর থেকে নেমেছিল সে হচ্ছে এক কোলকুঁজো বৃদ্ধ, দাড়ি-গোঁফওয়ালা বাঙালি।'

—'মহম্মদ হয়তো ড্রাইভারের পোশাক পরে গাড়ির ভিতরেই থাকে।'

—'সে-ক্ষেত্রেও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, মহম্মদ গ্রেপ্তার হলেও হয়তো আসল হত্যাকারী ধরা পড়বে না!'

—'একজনকে ধরতে পারলে দলের আর-সবাইকে ধরতে কতক্ষণ!'

হেমন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আপনি একটা কথা জানেন?'

—'কী?'

—'ডাক্তার চৌধুরির বাড়িতে সেদিন মোহনলাল নামে আমাদের এক বন্ধুকে দেখেছিলেন, মনে আছে?'

—'আছে।'

—'তিন মাস আগে মোহনলালের স্ত্রী মারা গেছেন।'

—'তাও শুনেছি।'

—'তার স্ত্রী মারা পড়েন অস্ত্রোপচারের পরেই। যে-পাঁচজন ডাক্তার অস্ত্রচিকিৎসা করতে বলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে মোহিনীমোহন দত্ত, এন বসু, এম সি বিশ্বাস, সুনীল চৌধুরি আর সন্তোষকুমার সেন।'

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে ভূপতিবাবু চিৎকার করে বললেন, 'অ্যাঁ, বলেন কী মশাই, বলেন কী?'

—'দেখছেন, মোহনলালের বাড়ির পাঁচজন ডাক্তারের মধ্যে আক্রমণ হয়েছে চারজনেরই উপরে। বাকি আছেন কেবল একজন, তাঁর উপরেও শীঘ্রই আক্রমণ হবে বলে আশা করছি।'

ভূপতিবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আপনি তো বেশ লোক দেখছি! জেনে-শুনেও এতবড়ো কথাটা আমাকে বলেননি, বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে বুঝি? এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন? গোয়েন্দার কাছে বন্ধু নেই, বাপ-মা নেই, ভাই-বোন নেই—কিছু নেই, কিছু নেই। চললুম আমি!'

—'আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান! কোথায় যান?'

—'মোহনলালের খোঁজে।'

—'ঠিকানা না জেনেই?'

—'ঠিক কথা তো! দিন ঠিকানা।'

—'কিন্তু সেখানে গিয়ে কী করবেন?'

—'মোহনলাল কী বলে শুনব।'

—'সে যদি কিছু স্বীকার না করে?'

—'তাকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করব।'

—'কোন প্রমাণে?'

—' 'সার্কামস্টান্সিয়াল এভিডেন্স' দেখে।'

—'দরকার কী অত হাঙ্গামে?'

—'মানে?'

—'আমি বলি খুনিকে হাতেনাতে ধরবার চেষ্টা করুন।'

—'কী করে?'

—'বসুন। তাকে ধরবার উপায় আমি স্থির করেছি।'

—ভূপতিবাবু দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আবার বসলেন।

আমার দিকে ফিরে মুখ টিপে হাসতে হাসতে হেমন্ত বললে, 'বুদ্ধিমান রবিন, একটা বিষয় নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবার সময় পেয়েছ?'

বুঝলুম, হেমন্তের দুষ্ট-বুদ্ধি জেগেছে, সে আমাকে অপদস্থ করবার ফিকিরে আছে। সাবধান হয়ে বললুম, 'কী?'

—'প্রথম খুন হয় কোন তারিখে?'

—'একুশে জুলাই।'

—'তারপর?'

—'আটাশে জুলাই, চৌঠা আগস্ট। ডাক্তার চৌধুরির ওপরে আক্রমণ হয়েছে এগারোই আগস্ট।'

—'গুড বয়। তোমার স্মৃতিশক্তি প্রশংসনীয়। আজ ক-তারিখ?'

—'আঠারোই আগস্ট।'

—'এখন চিন্তা করে দ্যাখো, তারিখগুলোর মধ্যে কী লক্ষ করা উচিত?'

ধাঁ করে মাথায় একটা সত্যের ইঙ্গিত জাগল। এতদিন তারিখগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে আমি কিছু ভাববার চেষ্টা করিনি। আজ হঠাৎ আমার চোখ ফুটল। উত্তেজিত ভাবে বললুম, 'হেমন্ত, হেমন্ত। প্রতি সাত দিনের মাথায় হত্যাকারী একবার করে দেখা দিয়েছে যে!'

—'জিতা রহ। তাহলে তোমার ঘটে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে?'

ভূপতিবাবু বললেন, 'ওঃ, এ লক্ষ্য করা তো খুবই সহজ।'

—'ঠিক। সেইজন্যেই তো বুদ্ধিমানরা সহজকে নিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করেন না। ... কিন্তু রবিন, তুমি এখনও আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দাওনি। আবার বলি, আজ আঠারোই আগস্ট।'

আবার দেখতে পেলুম একটা সাংঘাতিক সত্যকে। আমি সভয়ে বলে উঠলুম, 'কী সর্বনাশ।'

—'কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!' বলেই ভূপতিবাবু এমন ধড়ফড় করে উঠলেন যে, চেয়ারসুদ্ধ দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটির উপরে।

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'একবার কফিখানায়, আর-একবার এখানে। ভূপতিবাবু, এক দিনেই আপনার হল দু-বার পতন। উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত।'

ভূপতিবাবু এতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তাঁর কিছুমাত্র লেগেছে বলে মনে হল না! পড়েই চট করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'হেমন্তবাবু, হেমন্তবাবু! আজই যে হত্যাকারীর আবার আবির্ভূত হবার দিন!'

—'হ্যাঁ, সেইরকমই তো আশা করছি। এ হচ্ছে 'রোমান্টিক' হত্যাকারী! কেবল ডাক্তার মারে, তাসের পাঞ্জা, ছড়ায়, নির্দিষ্ট দিনে দেখা দেয়।' হেমন্ত বললে হাসিমুখে, শান্ত ভাবে।

—'কী আশ্চর্য, এসব জেনেশুনেও আপনি স্থির হয়ে নিশ্চিত ভাবে বসে হাসতে পারছেন?'

—'যখন বিপদের ভয় নেই, হাসব না কেন?'

—'বিপদের ভয় নেই?'

—'কিছুমাত্র না।'

আমি বললুম, 'আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয়, খুনি তাহলে নিশ্চয়ই আজ ডাক্তার সন্তোষকুমার সেনের সঙ্গে দেখা করবে।'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা করবে।'

—'তবু বলছ বিপদের ভয় নেই?'

—'হ্যাঁ। আজ ভোরবেলায় 'ফোনে' সন্তোষবাবুকে সাবধান করে দিয়েছি।'

আমার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল।

একটু আশ্বস্ত হয়ে ভূপতিবাবু বললেন, 'কিন্তু খুনিকে ধরবার ব্যবস্থা করতে হবে তো?'

—'ও-কাজও খানিকটা এগিয়ে রেখেছি। সন্তোষবাবু ব্যাপারটা আজ কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না বলেছেন। সন্ধ্যার পরেই বাড়ির চারিদিকে পুলিশ-পাহারা বসাতে হবে। ভূপতিবাবু, রবিন আর আমি থাকব সন্তোষবাবুর বাড়ির ভিতরে। ভূপতিবাবুর আপত্তি আছে?'

—'আপত্তি? বিলক্ষণ। আমি তো এক পা বাড়িয়েই আছি। মহম্মদ বেটাকে একবার বাগে পেলে হয়—আমার পেটে লাথি মারার সুখ ভোগ করাব।'

—'মহম্মদ এখনও আপনার ঘাড় ছেড়ে নামেনি?'

—'নামবে কী মশাই? দেখবেন, সে বেটা ঠিক ড্রাইভার সেজে গাড়ির ভেতরে বসে আছে।'

—'হবেও বা!'

—'তাহলে এখন আমি তোড়জোড় করিগে যাই?'

—'যান।'

ভূপতিবাবু প্রস্থান করলেন।

হেমন্তের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। শ্রান্ত স্বরে বললে, 'মোহনলালের জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হচ্ছে! কী করব, কর্তব্য!'

॥ এগারো ॥

আঠারোই আগস্ট

মধ্যরাত্রের আগে হত্যাকারী কোনওদিন আত্মপ্রকাশ করেনি, এ কথা জেনেও আমরা একটু তাড়াতাড়িই—অর্থাৎ রাত্রি নয়টার সময়ে বালিগঞ্জের ডাক্তার সন্তোষবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম।

আজ অপরাধী গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা, তবু আমার মনে আনন্দ হচ্ছিল না কিছুমাত্র। বরং মোহনলালের মুখের কথা ভেবে বুকটা ভরে যাচ্ছিল গভীর মায়ায়। শৈশব থেকে কৈশোর কাল পর্যন্ত তার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলো করেছি, সেই সব মধুর স্মৃতিছবি চোখের সামনে জেগে উঠতে লাগল বারংবার। সেই মোহনলালকে আজ এরই মধ্যে দেখতে পেলুম যেন, অসহায়ভাবে ফাঁসিকাঠে দোদুল্যমান! কী ভয়ানক! কেন তার মাথায় চাপল এই নরহত্যার পাগলামি? আহা, তার সদ্যমাতৃহারা ছেলেমেয়ে-দুটির কী দুর্ভাগ্য!

সন্ধ্যার পরেই একদল পাহারাওয়ালা ও একজন সার্জেন্ট সন্তোষবাবুর বাড়ির আশেপাশে চোখের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

একখানা বাগানওয়ালা বাড়ির ফটকের মধ্যে ঢুকে গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। আমরা হেমন্তের মোটরে এসেছি, গাড়ি চালাচ্ছিল হেমন্ত নিজেই।

ভূপতিবাবু নেমে পড়ে বললেন, 'হেমন্তবাবু, আপনার মোটরখানা এইখানেই হাতের কাছে থাক। মোহনলাল ধরা পড়বার পর তার ড্রাইভার যদি গাড়ি ছুটিয়ে পালায়, তাহলে আমরা আপনার মোটরখানা ব্যবহার করতে পারব।'

ভূপতিবাবুর বেশি আগ্রহ দেখছি মহম্মদের জন্যেই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সেই-ই চালিয়ে আসবে মোহনলালের মোটর! দেখা যাক, তাঁর না আমাদের—কার সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়!

সন্তোষবাবু বাইরে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে ভয়ের আভাস, ভাবভঙ্গি জড়োসড়ো।

ভূপতিবাবু বললেন, 'মি. সেন, আপনার বাগানটা বড্ডোবেশি অন্ধকার!'

—'কী করব, সরকারি হুকুম!'

সন্তোষবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম।

প্রথম ঘরখানায় ঢুকে সন্তোষবাবু বললেন, 'এইখানে আমি রোগী দেখি।'

হেমন্ত এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, 'এই পাশের ঘরটায় আমরা থাকতে পারি?'

—'স্বচ্ছন্দে।'

—'ও-ঘরের আলো নিবিয়ে; দরজাটা একটু খোলা রেখে আমরা অপেক্ষা করব। এ ঘরে যে আসবে, আমাদের চোখের উপরেই থাকবে।'

ভূপতিবাবু বললেন, 'অপরাধী ডাক্তারবাবুকে আহ্বান করলেই তিনি পোশাক পরবার জন্যে উপরে যাবেন। তারপরেই আমাদের আক্রমণ!'

সন্তোষবাবু বললেন, 'জরুরি কেসের জন্যে আমার এখানে অনেক রুগি আসে, তাদের আপনারা আসামি বলে ভুল করবেন না তো?'

ভূপতিবাবু গম্ভীর চালে বললেন, 'পুলিশের চোখ অত বোকা নয়। আমরা গোঁফ দেখেই শিকারি বেড়ালকে চিনতে পারি।'

হেমন্ত বললে, 'আসামির স্বরূপ আমরা চিনি, আর ছদ্মরূপের পেয়েছি উজ্জ্বল বর্ণনা। ভয় নেই মি. সেন, আপনার কোনও নিরীহ রুগিকে ধরে আমাদের চালান দিতে হবে না!'

সন্তোষবাবু ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমার বুক কাঁপছে!'

ভূপতিবাবু তাঁর কাঁধের উপরে হাত রেখে বললেন, 'বুককে স্থির করুন। আমরা আছি কী জন্যে?'

আমরা পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হলুম।

ভূপতিবাবু হাতঘড়ি দেখেই বললেন, 'মোটে সাড়ে নটা। এখনও রঙ্গমঞ্চে নায়ক আসতে অনেক দেরি। মি. সেন, কিছু চা-টার ব্যবস্থা হতে পারে?

হেমন্ত বললে, 'মনে রাখবেন মি. সেন! ভূপতিবাবু চায়ের সঙ্গে যোগ করেছেন টা!'

সন্তোষবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'মনে রাখব।'

ভূপতিবাবু বললেন, 'আর শুভস্য শীঘ্রং!'

পাশের ঘরে প্রবেশ করে হেমন্ত বললে, 'এখান থেকে ফটক আর রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়। ভালো কথা।'

খানিক পরে চায়ের সঙ্গে এল ঘরে-তৈরি কচুরি, সিঙাড়া, নিমকি। ভূপতিবাবুর ঠোঁট উপচে বেরিয়ে পড়ল আনন্দের হাসি।

আমার একটুও খেতে ইচ্ছে হল না। হেমন্তেরও তাই। তিন পেয়ালা চা আর তিন থালা খাবার নিয়ে বিপদগ্রস্ত হবার পাত্র ভূপতিবাবু নন। বরং বেড়ে উঠল তাঁর খুশির মাত্রা।

শূন্য পাত্রগুলোর সঙ্গ ত্যাগ করে ভূপতিবাবু যখন গাত্রোত্থান করলেন, রাত তখন সাড়ে-দশটা।

হেমন্ত বললে, 'এইবারে আলো নিবিয়ে দেওয়া যাক।'

ঘর অন্ধকার। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগানের অস্পষ্ট আলোর আভাস। ঘরের বড়ো দেওয়ালঘড়িটা টক টক শব্দে যেন আলাপ করতে চাইছে স্তব্ধতার সঙ্গে।

এর মধ্যেই রাস্তা নির্জন হয়ে পড়েছে। প্রথমে মাঝে মাঝে দু-এক খানা ছুটন্ত মোটরের শব্দ শোনা গেল, তারপর তাও গেল থেমে। কেবল ঝিঁঝিদের ব্যান্ড অশ্রান্ত। দু-এক বার ভেসে আসে পল্লির কোনও কোনও বাড়ির হঠাৎ-জাগা শিশুর কান্না। থেকে থেকে সাড়া দেয় প্যাঁচাদের চেরা কণ্ঠ।

ঘড়িতে বাজল সাড়ে-এগ্যারোটা।

ভূপতিবাবু বললেন, 'উঃ! মশা কামড়াচ্ছে।'

হেমন্ত বিস্ময়প্রকাশ করে বললে, 'বলেন কী! মশার পলকা হুল পুলিশের চামড়াও ভেদ করতে পারছে!'

—'এ বালিগঞ্জের মশা। ভগবান কি শয়তান কিছুই মানে না।'

—'কিন্তু আমি তো জানতুম কলকাতার পুলিশ ভগবান আর শয়তানেরও উপরওয়ালা!'

—'আমরা শখের গোয়েন্দা নই, ঠাট্টার রাজ্যে ভগবানকে নিয়ে টানাটানি করি না।'

—'আপনাদের বন্ধুত্ব কেবল বুঝি শয়তানের সঙ্গে?'

এই কথা-কাটাকাটি হয়তো আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করতে পারতুম, কিন্তু দূরে জাগল একখানা মোটরের শব্দ! তখনই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ হয়ে গেল একেবারে বোবা।

গাড়ির শব্দ যত কাছে আসছে, আমার বুকের তাল হয়ে উঠছে তত দ্রুত!

গাড়ি ফটকের বাইরে এসে থামল। তাহলে সঙ্গীন মুহূর্ত কি উপস্থিত?

আবছা-আলোতে জানলা দিয়ে দেখা গেল, একটা শ্বেতবসন মূর্তি ফটক পার হয়ে ঢুকল বাগানের ভিতরে। পথের উপরে বাজছে তার লাঠি ঠক, ঠক, ঠক!...লাঠির শব্দ থামল গাড়ি-বারান্দার তলায়।

সেখানে অপেক্ষা করছিল সন্তোষবাবুর বেয়ারা। আগন্তুক অতি মৃদু স্বরে কী বললে, বোঝা গেল না।

উত্তরে বেয়ারা বললে, 'ডাক্তারবাবু আছেন। আপনি ভেতরে আসুন, আমি খবর দিচ্ছি।'

আগন্তুক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখতে পেলুম। কিন্তু সরকারি হুকুম তামিল করবার জন্যে ঘরের আলোর উপরে যে চোঙা পরানো হয়েছিল, সে রইল তার আলোকরেখার বাইরেই। তার মুখ স্পষ্ট করে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তার চোখের কালো চশমা, মাথার লম্বা পাকা চুল, মুখের দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি, ধনুকের মতন বেঁকে-পড়া দেহ—এসব বোঝা গেল অল্পবিস্তর। সে যে সন্দিগ্ধ ভাবে আমাদের ফাঁক-করা দরজার পানে বার বার তাকাচ্ছে, এটাও নজর এড়াল না।

ভূপতিবাবু ছিলেন আমাদের পিছনে। আগন্তুককে ভালো করে দেখবার জন্যে তিনি সাগ্রহে এগিয়ে আসতে গেলেন, কিন্তু ঘরের অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে পড়লেন গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে, অত্যন্ত ধুমধাড়াক্কা করে!

এক পলকে আগন্তুকের দুমড়ে-পড়া দেহ চমকে একেবারে সিধা হয়ে উঠল এবং পর-মুহূর্তে সে হল ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য! তারপরেই বাগানের পথে শুনলুম তার ছুটন্ত পদশব্দ!

তিরবেগে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হেমন্ত তার মোটরে 'স্টার্ট' দিতে লাগল এবং আমার পিছনে পিছনে ভূপতিবাবুও দৌড়ে এলেন খুব জোরে 'হুইসিল' বাজাতে বাজাতে।

আমরা মোটরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই হেমন্ত গাড়ি চালিয়ে দিলে—কিন্তু আসামির গাড়িও তখন বেগে ছুটে চলেছে! বাঁশি শুনে তৎক্ষণে নানা গুপ্তস্থান থেকে পাহারাওয়ালারা বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী মোটরের ভিতর থেকে পাঁচ-ছয়টা রিভলভারের গুলি ছুটে এসে তাদের কর্তব্য পালনের উৎসাহকে দিয়েছে প্রচণ্ড বাধা।

আমাদের গাড়ি ফটক পার হতেই একজন সার্জেন্ট ও দুজন পাহারাওয়ালা পা-দানের উপরে লাফ মেরে উঠে পড়ল। চকিতের মধ্যে চলন্ত গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলুম রাজপথে ছটফট করছে একটা পাহারাওয়ালা!

সোজা পথ। প্রায় দেড়শো গজ দূরে দেখা গেল, তীব্রবেগে দৌড়চ্ছে আসামির মোটরখানা!

ভূপতিবাবু হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ক্রমাগত চ্যাঁচাচ্ছেন, 'আরে ও হেমন্তবাবু! আরে আরে, করছেন কী! আরও জোরে চালান—আরও, জোরে, আরও জোরে! হায়, হায়, হায়, হায়, আসামি ভাগল যে!'

মোটরের হুইল ধরে সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে, হেমন্ত ক্রুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, 'থামুন আপনি! আপনার জন্যেই আসামি পালিয়েছে!'

ভূপতিবাবু একেবারে চুপ মেরে গেলেন।

কিন্তু হেমন্তের গাড়িখানা আসামির গাড়ির চেয়ে ঢেরবেশি শক্তিশালী ও বেগবান। দু-খানা গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে তাড়াতাড়ি।

...আসামির গাড়ি এখন বোধহয় চল্লিশ গজের চেয়ে বেশি দূরে নেই।

মিনিট-দেড়েক পরে আগের মোটরখানা হঠাৎ একখানা বাড়ির সামনে থেমে পড়ল—ভিতর থেকে লাফ মারলে একটা মূর্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মোটরখানাও ঠিক সেইখানেই গিয়ে রুদ্ধ করলে গতি। এক সেকেন্ডের মধ্যে আমরাও গাড়ির বাইরে। অস্পষ্ট আলোকে দেখলুম, বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আসামি আমাদের লক্ষ্য করে রিভলভারের ঘোড়া টিপলে—ভূপতিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হুঁসিয়ার!'—কিন্তু কোনও আওয়াজ শোনা গেল না, আসামির রিভলভারে আর গুলি নেই!

হেমন্ত বিদ্যুৎ-বেগে দরজার দিকে ছুটে গেল—আসামিও ভিতরে ঢুকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে এক এক লাফে দু-তিনটে ধাপ পার হয়ে উপরে উঠতে লাগল।

আমি উপরে উঠতে-উঠতেই শুনলুম, দড়াম করে একটা দরজার বন্ধ হওয়ার শব্দ!

দোতলায় গিয়ে দেখি, হেমন্ত একটা বন্ধ দরজার উপরে দুম-দাম লাথি মারছে!

তার প্রবল পদাঘাতে দরজার খিল ভেঙে যেতে দেরি লাগল না।

একটা ঘর। তারও এক দেওয়ালে ওধার থেকে বন্ধ-করা একটা দরজা।

এবার হেমন্তের সঙ্গে আমিও দরজার উপরে পদাঘাত করতে লাগলুম। ভূপতিবাবুও এসে পড়লেন।

আচম্বিতে ঘরের ভিতরে হল রিভলভারের শব্দ। তারপরে শুনলুম, একটা ভারী জিনিসের পতন-শব্দ।

ভূপতিবাবু বললেন, 'ও আবার কে রিভলভার ছোড়ে?'

হেমন্ত হতাশ ভাবে বললে, 'আসামি সে রিভলভারে গুলি ভরবার সময় পেয়েছে। আত্মহত্যা করলে!'

আমি আর বার-দুয়েক পদাঘাত করবার পরই খিল ভেঙে দরজা খুলে গেল।

হেমন্ত বললে, 'রবিন, ঘরের ভিতরে যেয়ো না। ঘরের ভিতরে যেয়ো না। প্রাণে কষ্ট পাবে।'

আমি তখন খোলা দরজার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম, মেঝের উপরে পড়ে আছে যেন একটা স্তূপীকৃত কাপড় বা বস্তা। ও-ঘরটা অন্ধকার, এ-ঘর থেকে ছড়িয়ে-পড়া আলোর আভায় তার বেশি কিছু আর দেখা যাচ্ছে না।

হেমন্তের কথা শুনে ফিরে বললুম, 'চেষ্টা করলে হয়তো মোহনলাল এখনও বাঁচতে পারে! হয়তো ও মারাত্মক ভাবে জখম হয়নি!'

হেমন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'কবলগত শিকারকে নিয়ে তুমি কি বিড়ালের মতো নিষ্ঠুর খেলা খেলতে চাও? ওকে বাঁচিয়ে লাভ কী, ফাঁসিকাঠে ঝুলবে বলে? চলে এসো রবিন, এদিকে সরে এসো—একটা মহৎ প্রাণের এই শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দেখাও এক চরম শাস্তি!'

সত্যকথা। হতভাগ্য মোহনলাল! হেমন্তের সঙ্গে আমি এ-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভূপতিবাবু বললেন, 'হেঁঃ ওসব 'সেন্টিমেন্ট' নিয়ে পুলিশের কাজ চলে না! মহৎ প্রাণের শোচনীয় পরিণাম! খুনির জন্যে দরদ! ধেৎ!'—ইলেকট্রিক টর্চটা জ্বেলে মেঝে-কাঁপানো পা ফেলে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

শুনলুম উৎকট আনন্দে তিনি হত বা আহত মোহনলালকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'বাপু, লীলাখেলা তো সব ফুরুল, এখনও মুখে ওই পরচুলার গোঁফ-দাড়ি কেন? দেখি, শ্রীবদনখানি একবার দেখি!'—তারপরেই শুনলুম ভূপতিবাবুর সচকিত, বিস্মিত চিৎকার—'এ কী ব্যাপার? ও হেমন্তবাবু, এ কে? এ তো মোহনলাল নয়!'

হেমন্ত একটুও বিস্মিত না হয়ে বললে, 'আমি তা জানি।'

—'একে তো আমি চিনি না!'

—'কিন্তু আমি চিনি। উনি হচ্ছেন ঈশানপুরের দানবীর, ধার্মিক জমিদার পরমানন্দ রায়-চৌধুরি!...এসো হেমন্ত, আমরা সরে পড়ি।......ভূপতিবাবু, সব রহস্য যদি বুঝতে চান, কাল সকালে আমার বাড়িতে যাবেন!'

॥ বারো ॥

'স্নায়ুজমনোক্রিয়া'

পরের দিন সকালবেলা। আমাদের চা-পান সমাপ্ত।

হেমন্ত তার নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করলে। তার সামনে গিয়ে বসলুম আমি। আমার পাশে ভূপতিবাবু।

হেমন্ত বললে, 'ভূপতিবাবু, আমি কাল জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি 'সাইকলজি' পড়েন কি না? পুলিশের পক্ষে সেটা অনাবশ্যক বলে আপনি দিলেন ফতোয়া। সেই সম্পর্কে আমি গুটিকয়েক কথা বলেছিলুম, তাও আপনি উড়িয়ে দিলেন 'কাব্যি' বলে। আপনার কিছু মনে আছে, আমি কী বলেছিলুম?'

—'ইয়ে—ওর নাম-কী—কাব্যি-টাব্যি আমার মনে থাকে না। তবে কিছু কিছু ভাসা ভাসা স্মরণ হচ্ছে যেন।...'মানুষের মন নাকি আশ্চর্য এক জগৎ, সেখানে একই সঙ্গে থাকে ভগবানের আশীর্বাদ আর শয়তানের অভিশাপ।.... মনোবিজ্ঞান জানলে নাকি বোঝা যায়, দানবও করতে পারে দেবতার কাজ, আবার দানব হতেও দেবতার বেশিক্ষণ লাগে না'—এমনিতর কী সব বলেছিলেন আপনি।'

হেমন্ত বললে, 'এর মধ্যে আপনি পেয়েছিলেন কেবল 'কাব্যি'—অথচ এর মধ্যেই আছে বর্তমান মামলার সমস্ত রহস্য। পরমানন্দবাবু কেবল দানবীর ছিলেন না, তিনি সারা দেশের শ্রদ্ধা পেয়েছেন পরম সাধু বলে। অথচ তাঁর মতন দেবতার বুকে জেগেছে যে দানবের মন, তিনি ধরা পড়বার আগেই আমি সেটা আন্দাজ করেছিলুম।'

ভূপতিবাবু বললেন, 'মানলুম। কিন্তু আমাদের শেষ কাজ আদালত নিয়ে। আদালতে মশাই, আন্দাজের ঠাঁই নেই। আদালত বলবে—কেন আন্দাজ করেছিলে বাপু? তোমার যুক্তি কী?'

—'তাহলে মনোবিজ্ঞানের রহস্য নিয়ে আমাকে ছোটোখাটো একটি বক্তৃতা দিতে হয়, শুনতে রাজি আছেন?'

—'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। কী আর করব, বলুন?'

ইজিচেয়ার থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরে রক্ষিত 'Encyclopedia of Good Health' এর একখণ্ড তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, 'বিলাতের প্রথম শ্রেণির বড়ো বড়ো চিকিৎসক আর পণ্ডিতদের সাহায্যে এই বিরাট বইখানি লেখা হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৭২ পৃষ্ঠায় 'Obsession' সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, আপনি পরে তা পড়ে দেখবেন। এ-সম্বন্ধে আমি আরও অনেক বই পড়েছি, হাতে-নাতে পরীক্ষাও করেছি। সেইসব অবলম্বন করেই আমি দু-চার কথা বলতে চাই, শুনুন। ......ইংরেজি fixed ideaর বাংলা কী? অচল-প্রতিষ্ঠ বা অটল-ভাবনা। যে-ভাবনা মনের ভিতরে গেঁথে যায়। অস্থায়ী ভাবে সময়ে সময়ে এইরকম ভাবনার দ্বারা আমরা সকলেই আক্রান্ত হই। যেমন ধরুন, হয়তো একটা

গানের কলি এমন নাছোড়বান্দার মতন আমাদের মাথার ভিতরে ঢুকে বসল যে, কিছুতেই তাকে তাড়াতে না পেরে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেই কলিটা মনে মনে বার বার গাইতে আমরা বাধ্য হই! কেউ কেউ অবস্থায় এক দিন, দু-দিন—এমনকি দু-তিন হপ্তা পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়।

'কারুর কারুর মনে fixed idea আরও নানারকম প্রভাব বিস্তার করে। কেউ কেউ হয়তো বাড়ি থেকে পথে বেরিয়েই প্রথমে মনে মনে ছয় বা আট সংখ্যা পর্যন্ত গুনে পদক্ষেপ করে। বিলাতের নামর লেখক ডক্টর জনসন আর এক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি পথে বেরিয়ে থাম পেলেই তার উপরে লাঠি দিয়ে ঘা না মেরে থাকতে পারতেন না। এসব হচ্ছে ছোটো ছোটো নিরাপদ অভ্যাস। পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই এ-রকম অভ্যাসের দাস হতে পারে।

'Obsessional neurosis' বা একজাতীয় স্নায়ুজমনোক্রিয়ার দ্বারা যেসব রোগী আবিষ্ট হয়, তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে গুরুতর। তাদের মনে কোনও অটল ভাবনা এমন সব আবেগ বা ঝোঁকের সৃষ্টি করে, যা সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যে সাধু, তারও মনে আসে হয়তো অটল দুষ্টচিন্তার আবেগ; সে নিজের দুর্বলতায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাণপণে ওই কুচিন্তাকে তাড়াতে চেষ্টা করে; অনেকেই সক্ষম হয়, আবার অক্ষমও হয় কেউ কেউ। এই অবস্থায় কোনও কোনও রোগীকে মাঝে মাঝে সাংঘাতিক অপরাধ করতেও শোনা যায়। অথচ অপরাধ করা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এইসব নির্দিষ্ট চিন্তা প্রায়ই অর্থহীন আর বালকোচিত হয়, রোগী তা বুঝতে পারে তবু তার কবল থেকে নিস্তার পায় না।

'ভূপতিবাবু, আমি খুব সংক্ষেপে যে গোড়ার কথাগুলি বললুম, তা আমার মন-গড়া কথা নয়, বড়ো বড়ো মনোবিজ্ঞানবিদ আর চিকিৎসকরা বহু পরীক্ষা আর আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। এইবারে দেখা যাক, মনোবিজ্ঞানের এই রহস্যের সঙ্গে আমাদের মামলার সম্পর্ক কী।'

ভূপতিবাবু রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'বাব্বাঃ, আপনার 'সাইকলজি'র লেকচার সাঙ্গ হল, বাঁচলুম! এরই মধ্যে আমার মাথা গুলিয়ে উঠেছিল, ও-সব কি আমাদের মগজে ঢোকে মশাই?'

হেমন্ত চেয়ারের উপরে আড় হয়ে চোখ বুজে বলতে লাগল, 'এই ডাক্তারের পর ডাক্তার খুন, প্রতি সাত দিনের মাথায় হত্যাকারীর আবির্ভাব আর ঘটনাক্ষেত্রে তাসের পাঞ্জা নিক্ষেপ দেখেই আমি সন্দেহ করেছিলুম যে, অপরাধী কেবল 'রোমান্টিক' নয়, তার মনে কাজ করছে কোনওরকম fixed idea!

'একটা একটা খুন হয়, আর তাসের কাটা ফোঁটার সংখ্যা বাড়ে আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম পাঞ্জা ছাড়া আর কোনওরকম তাস ব্যবহৃত হয় না। বেশ বুঝলুম খুনি জানাতে চায়, সে পাঁচজন লোককে বধ করবে। প্রশ্ন হতে পারে, এ-রকম ছেলেমানুষি বাহাদুরির কোনও মানে হয় না। উত্তর হচ্ছে, fixed ideaর একটা বড়ো লক্ষণই হচ্ছে অর্থহীন বালকতা।

'উপরি উপরি সপ্তাহে এক বার করে তিন বারে তিনটে হত্যা আর তিন বারই বলি দেওয়া হল এক-একজন ডাক্তারকে! খোঁজ নিয়ে জানলুম, ওই তিন ডাক্তারই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বা কোনও নির্দিষ্ট দলভুক্ত নন। অথচ খুন করছে একজন লোকই। কোনও ডাক্তারের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু চুরি যায়নি, আর তাঁদের মৃত্যুতে কারুরই লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। তখন ব্যাপারটা ঠেকল হেঁয়ালির মতো।

'এ-রকম হয় না, হতে পারে না! প্রত্যেক খুনের পিছনে কোনও-না-কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকেই। কিন্তু এসব খুন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন!

'তখন আমার মাথায় সন্দেহ জাগে, হত্যাকারী কোনওরকম obsession বা স্নায়ুরোগের দ্বারা আক্রান্ত নয় তো? ব্যাপারটা নিয়ে মাথার ভিতরে যতই নাড়াচাড়া করতে লাগলুম, সন্দেহ দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল তত।

'তারপর হল চতুর্থ আক্রমণ। ভাগ্যে 'সিগারেট কেসে'র দৌলতে ডাক্তার সুনীল চৌধুরি বেঁচে গেলেন, তাই তাঁর মুখে শুনতে পেলুম, আক্রমণের আগে হত্যাকারী গর্জন করে বলেছিল—'প্রতিশোধ'!.....কিন্তু কীসের প্রতিশোধ? ডাক্তার চৌধুরি বললেন, তাঁর কোনও শত্রু নেই! তবে হত্যাকারী প্রতিশোধ নিতে চায় কেন? আন্দাজ করলুম, আগেকার তিন খুনের সময়েও নিশ্চয় সে ওই 'প্রতিশোধ' কথাটা উচ্চারণ করেছিল! তবে কি হত্যাকারী তার নিজের কল্পিত কোনও অন্যায় কার্য বা অপরাধের জন্যে পাঁচ-পাঁচ জন ডাক্তারকে খুন করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে? আগে যে-সন্দেহ করেছিলুম, হত্যাকারীর দ্বারা চতুর্থ ডাক্তারকে আক্রমণ দেখে সেই সন্দেহ পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে। আমি দেখতে পেলুম স্পষ্ট আলো।

'তারপর হত্যাকারীকে আবিষ্কার করবার জন্যে আমি কোন পথ অবলম্বন করতুম জানি না, কিন্তু নিয়তি যেন ডাক্তার চৌধুরির বাড়িতে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন আমার বাল্যবন্ধু মোহনলালকে।

'মোহনলালের বাড়িতে গিয়ে খোলা পেলুম রহস্যরাজ্যের দরজা। প্রথমেই জানলুম যাঁদের উপরে আক্রমণ হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন তার মৃতা স্ত্রীর চিকিৎসক। তার আর তার শ্বশুরের আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঁচজন ডাক্তারের মতে যে-অস্ত্রচিকিৎসা হয়, মোহনলালের স্ত্রী মারা পড়েন তারই ফলে।

'প্রথমেই আমার সন্দেহ হয় মোহনলালের উপরে। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে সে হয়তো দায়ী করেছে ওই পাঁচজন ডাক্তারকেই। সে বিশ্বাস করে ওঁদের হত্যাকারী বলে—ধীরে ধীরে ওঁদের উপরে তার মনে পঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে একটা বিজাতীয়, মারাত্মক ঘৃণা। দিন-রাত এই কথা ভেবে-ভেবেই সে এমন ভীষণ obsessional neurosis রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সে সাধু, সৎচরিত্র বটে, কিন্তু ও-রোগ সাধুরও মনে আনে ভয়াবহ পাপ-চিন্তার বা গুরুতর অপরাধের প্রেরণা। কিন্তু ঠিক তার পরেই দৈবগতিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আসল আসামির দিকে।

'রবিন? মনে আছে, মোহনলালের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করোনি বলে তোমাকে আমি ভর্ৎসনা করেছিলুম? ব্যাপারটা হচ্ছে এই:

'মোহনলালের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলুম, পরমানন্দবাবু সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নেমে আসছেন। তাঁর হাতে একগাছা মোটা লাঠি—আর সে-লাঠি ধরেছেন তিনি বাম হাত দিয়ে! এটা যে-কত বড়ো প্রমাণ তা আর বোধহয় বলে দিতে হবে না! ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহের পাশের জমি পরীক্ষা করেই প্রথমে আমি জেনেছিলুম হত্যাকারীদের একজন বামহাতে লাঠি ব্যবহার করে। তারপর ডাক্তার চৌধুরিও বলেছিলেন, আক্রমণের রাতে যে তাঁকে মারতে এসেছিল, লাঠি ছিল তার বাম হাতেই।

'ধার্মিক, দানশীল পরমানন্দবাবু একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ওই দারুণ 'obsessional neurosis' রোগে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, ও-রোগের রোগী যত বড়ো সাধুই হোক, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পাপ-কাজ করতে চায়! অবশ্য শতকরা নিরানব্বই জন লোক এই পাপ-ইচ্ছা কোনওরকমে দমন করতে পারে, বাকি কেউ কেউ পারে না। 'ওই ডাক্তাররা আমার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করেছে, আমিও তার প্রতিশোধ নেব'—এই ছিল পরমানন্দবাবুর obsession! তিনি নিশ্চয়ই ওই ভাবের কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা করেও তা পারেননি—শেষ-পর্যন্ত সম্মোহিত ভাবে, ছদ্মবেশ পরে হত্যাকারীর মূর্তি ধরতে বাধ্য হয়েছেন। রোগ তাঁর হাত রক্তাক্ত করেছে বটে, কিন্তু আসলে তিনি যে মহৎ সাধু ব্যক্তি, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। এ এক বিচিত্র ট্রাজেডি, আগে জানলে মামলাটা আমি গ্রহণ করতুম না।'

ঘর স্তব্ধ। খানিকক্ষণ আমরা সকলেই অভিভূতের মতন বসে রইলুম।

তারপর আমি বললুম, 'তাহলে সেই 'ক্লোরিন' ব্যবহারের জন্যেও দায়ী হচ্ছেন পরমানন্দবাবুই?'

হেমন্ত বললে, 'বলা বাহুল্য। পাপের সঙ্গে ভাব করলে এক পাপ আনে তার শত পাপ-অনুচর। ধরা পড়লে পরমানন্দবাবুকে হারাতে হত তাঁর প্রাণের চেয়ে বড়ো, দেশজোড়া মানসম্ভ্রম। একরকম মরিয়া হয়েই তিনি আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উপরে আমার রাগ নেই।'

ভূপতিবাবু বললেন, 'পরমানন্দবাবুর সেই মোটা লাঠিগাছা আমরা পেয়েছি। সেটা গুপ্তি। কিন্তু তার হাতল টেনে বার করলে পাওয়া যায়, তরোয়াল নয়, একখানা ছোরা। সাধারণ ছোরাও নয়, ফলাটা লম্বায় ছয় ইঞ্চি, চওড়ায় পেনসিল-কাটা ছুরির মতো। ডাক্তার বিশ্বাসের ক্ষতিচিহ্ন দেখে আপনিও এই কথা বলেছিলেন।'

হেমন্ত বললে, 'আর একটা কথা জানতে চাই। আপনার মহম্মদ খাঁ ধরা পড়েছে তো?'

ভূপতিবাবু অধোবদনে বললেন, 'মহম্মদের সঙ্গে এ মামলার কোনও সম্পর্ক নেই।'

—'কিন্তু পরমানন্দবাবুকে সাহায্য করত আরও দুজন লোক, এটা আমরা জানতে পেরেছি।'

—'হ্যাঁ। তারাও কাল ধরা পড়েছে।'

—'কে তারা?'

—'দুটো নেপালি। তাদের একজন পরমানন্দবাবুর পুরানো ড্রাইভার, আর-একজন পুরানো চাকর। তারা কালও গাড়ির ভিতরেই ছিল।'

—'তাই তো ভূপতিবাবু, মহম্মদের লাথিকে তাহলে শাস্তি দিতে পারলেন না?'

ভূপতিবাবু আবার লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

হেমন্ত বললে, 'রবিন, এতক্ষণে মোহনলাল আমাদের কী ভাবছে, কে জানে। তার মুখ মনে করে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

রত্নপুরের যাত্রী

॥ প্রথম ॥

আগন্তুক

দুজনে চুপচাপ বসে আছে সামনাসামনি—যেন দুই নিস্পন্দ কাঠের মূর্তি। জয়ন্ত আর মানিকের কথা বলছি।

সুমুখে টেবিলের উপরে পাতা দাবা-বোড়ের ছক আর ঘুঁটি।

জীবনে উত্তেজক ঘটনার অভাব হলে মাঝে মাঝে তারা দাবা-বোড়ের ঘুঁটিগুলো ধরে নাড়াচাড়া করে। বদ্ধ ঘরের ভিতরে বসে তারা পছন্দ করে কেবল এই খেলাকেই।

তাদের কাছে ঘটনার উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে পড়ার অর্থই হচ্ছে মস্তিষ্ক-চালনার সুযোগ লাভ করা। যখন সে-সুযোগের অভাব হত তখন তারা অবলম্বন করত দাবা-বোড়েদেরই। কারণ তাদের মত হচ্ছে, খেলার মধ্যে একমাত্র দাবা-বোড়ে খেলাই দেয় মস্তিষ্ক-চালনার অবকাশ। এবং দাবা-বোড়ে খেলা হচ্ছে যোদ্ধার খেলা। আর্য ও স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন শক্তিসাধনার মন্ত্র জপ করত, তখন বীর-সমাজে দাবা-বোড়ের সমাদর ছিল অত্যন্ত। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমরখন্দের দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং এবং ইউরোপ জেতা নেপোলিয়নও ছিলেন দাবা-বোড়ের ভক্ত।

সেদিন মানিক যখন সুকৌশলে একটি বোড়ের চালে জয়ন্তের মন্ত্রীকে করে ফেলেছে একেবারে কোণঠাসা, তখন হঠাৎ বাড়ির সদর দরজার কড়া শব্দ করে উঠল অত্যন্ত জোরে।

মানিক বিরক্তমুখে বললে, 'এমন অসময়ে কে আবার জ্বালাতে এল?'

জয়ন্ত বললে, 'যেই-ই আসুক, কিন্তু সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েই এসেছে! শুনছ না, লোকটা দু-হাতে দুটো কড়া ধরেই একসঙ্গে নাড়ছে, আর এত জোরে নাড়ছে যে মনে হচ্ছে তার দরজা খুলে দেবারও তর সইছে না। ওই শোনো, কড়া নাড়া বন্ধ হল—মধু বোধহয় দরজা খুলে দিলে!'

কয়েক সেকেন্ড পরেই মধু কোনও খবর দেবার আগেই বৈঠকখানার ভিতরে বেগে প্রবেশ করলে একটি লোক। তার বয়স হবে বছর-তিরিশ, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, মাথায় সে না-লম্বা না-খাটো, বড়ো বড়ো চুল, মুখে গোঁফ ও 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে লোকটিকে অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়, কিন্তু তার মুখ-চোখের ভাব অতিশয় বিপন্নের মতন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ছে খুব দ্রুত।

জয়ন্ত একবার তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'নমস্কার হরিহরবাবু, কী খবর?'

আগন্তুক সবিস্ময়ে এক-পা পিছিয়ে প্রড়ে বললে, 'কী আশ্চর্য, আপনি কি আমাকে চেনেন?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তবে আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

—মন্ত্রবলে নয়, অতি সহজে। হাতের উল্কিতেই তো আপনার নাম লেখা রয়েছে।'

হরিহর নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও, তাই বলুন!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু হরিহরবাবু, আপনার এতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে খানা-ডোবায় ঝাঁপ খেতে কি আছে? অনায়াসেই হাত কি পা ভাঙতে পারতেন। যাক, বিপদের ফাঁড়াটা আজ ঘড়ির কাচের উপর দিয়েই চলে গিয়েছে দেখছি!'

আবার সচকিত হয়ে উঠল হরিহরের চোখ। সে বললে, 'এটাই বা আপনি জানতে পারলেন কেমন করে? আজ সুশাই আমার মাথার ঠিক নেই! আমি বিষম এক মুশকিলে পড়েছি। আপনার কাছে তাড়াতাড়ি আসব বলে 'সর্ট কাট' করবার জন্যে আমি একটা অন্ধকার সরু গলির ভিতরে ঢুকেছিলুম। সেই গলির একদিকে ছিল খোলা নর্দমা। হঠাৎ আমার একখানা পা পড়ে যায় তারই মধ্যে। কোনওরকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি। কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই আপনি হাজির ছিলেন না?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না। তবে এটা বর্ষাকাল নয়, রাস্তায় কাদা নেই, অথচ দেখছি আপনার বাঁ-পায়ের ওপরে পাঁক আর ভিজে কাদার দাগ। আপনার হাতঘড়ির কাচখানাও ভাঙা আর কাপড়েরও নীচের দিকটা খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছে। এইসব দেখেই কতক কতক আন্দাজ করতে পেরেছি। এখন যাক ওসব কথা, ওই চেয়ারখানায় বসতে আজ্ঞা হোক।'

হরিহর চেয়ারের উপরে বসে পড়ে সম্ভ্রম-ভরা কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার উপরে শ্রদ্ধা আমার আরও বেড়ে উঠল। আপনার চোখ আর মন যে এত তাড়াতাড়ি দেখতে আর বুঝতে পারে, আগে এটা জানতুম না।'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'আপনার মতিগতি-প্রকৃতি নিয়ে এখনই আমি আরও কিছু কিছু কথা বলতে পারি, কিন্তু আপাতত ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করবার সময় আপনার নেই। বেশ বুঝছি, আপনি বড়ো অধীর হয়েই আমার কাছে ছুটে এসেছেন। কিন্তু ব্যাপার কী বলুন দেখি?'

হরিহর কাতরমুখে বললে, 'গুরুতর ব্যাপার জয়ন্তবাবু, গুরুতর ব্যাপার! আমার বাড়িতে এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে, যার কোনও অর্থই আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই সব কথা আমাকে খুলে বলুন। কিছু বাদ দেবেন না—খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত আমি জানতে চাই।'

॥ দ্বিতীয় ॥

হরিহরের কাহিনি

'আমার বাবার নাম স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মজুমদার। আমার পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমে ছিলেন ধনী জমিদার। যতদূর জানি, তাঁদের অনেকেরই প্রচুর সম্পত্তির সঙ্গে ছিল এক-একটি বিচিত্র খেয়াল।

ধরুন আমার প্রপিতামহের কথা। তিনি সন্ন্যাসীও ছিলেন না, আর যাকে বলে বিষয়-নিস্পৃহ যোগী সাধক তাও ছিলেন না। তবু তিনি নিজের সমস্ত অবসর-কালটা ব্যয় করতেন বড়ো বড়ো তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আর শবসাধনা প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে।

তারপর ধরুন আমার পিতামহের কথা। বিলাসিতার কোলে লালিত-পালিত হয়েও সারা জীবন ধরেই তিনি দেশ-বিদেশের বড়ো বড়ো পালোয়ানদের মাইনে করে রেখে নিজেও করে এসেছেন ব্যায়াম ও কুস্তি প্রভৃতির চর্চা। অথচ নিজে প্রকাশ্যে কুস্তি লড়ে কখনও বাহাদুর বলে নাম কেনবার চেষ্টা করেননি।

আমার বাবা শখের সন্ন্যাস বা শখের পালোয়ানির ধার মাড়াননি বটে, কিন্তু তাঁরও একটি অদ্ভুত খেয়াল ছিল। তিনি করতেন পুরাতত্ত্বের চর্চা। তাও এদেশি পুরাতত্ত্ব নয়, তাঁকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল প্রাচীন মিশরের অতীত রহস্য। এবং সেই রহস্য-সাগরের তল খোঁজবার জন্যে তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন তা ভাবলেও রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়।

বলেছি তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, বরং ছিল প্রাচুর্যই। আমার বয়স যখন সতেরো-আঠারো বৎসর, বাবা সেই-সময়ে তাঁর ধ্যানের দেশকে স্বচক্ষে ভালো করে দেখবার জন্যে একেবারে মিশরে গিয়েই হাজির হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী দেখেছিলেন আর কী করেছিলেন তা আমি বলতে পারব না, কারণ প্রাচীন মিশরের কোনও কথা জানবার আগ্রহ কোনওদিনই আমার হয়নি। তবে এইটুকু আমি জানি, বাবা মিশরে গিয়ে বাস করেছিলেন সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল। তারপর তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে তিনি ফিরে আসেন আবার কলকাতায়। আসবার সময় তিনি যেসব জিনিস সঙ্গে করে এনেছিলেন তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বিভীষণ সব দেব-দেবীর মূর্তি, সুরক্ষিত কিন্তু বীভৎস ও হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন মানুষের মৃতদেহ—এমনি আরও অনেক-কিছু। অধিকাংশ জিনিস দেখলেই আমার মন হয়ে উঠত বিদ্রোহী, তাই বাবার মৃত্যুর পরে সেগুলোকে আমি একটা ঘরের ভিতরে পুরে গুদামজাত করে রেখেছি। সেগুলোকে ফেলে দিতে পারলেই আমি হতুম বেশি খুশি, কিন্তু বাবার নিতান্ত আদরের জিনিস বলেই নিজের খুশিমতো কাজ করতে পারিনি।

বাবার একটি পুস্তকাগারও ছিল এবং তার অধিকাংশ পুস্তকই হচ্ছে মিশর-সম্পর্কীয়। বইগুলি আমি আবর্জনার মতন সরিয়ে ফেলিনি, কারণ আমার নিজেরও বই পড়ার নেশা আছে, তাই সেগুলিকে আমার নিজেরই পুস্তকাগারের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে সে-সব বইয়ের পাতা ওলটাই, এইমাত্র। মিশরের ভুতুড়ে দেব-দেবী, শুকনো মড়া ও শিল্পকলা প্রভৃতি কোনওদিনই আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

ব্যাধি আক্রমণ করেছিল বাবার হৃদ্‌যন্ত্রকে। মিশর থেকে ফিরে শেষ পর্যন্ত তিনি একরকম শয্যার উপরেই বাস করে গিয়েছিলেন। যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকতেন, তখনও মিশর-সম্পর্কীয় পুস্তকাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারতেন না। এইভাবে প্রায়-পঙ্গু অবস্থায় দীর্ঘ চার বৎসরকাল কাটিয়ে বাবার অবস্থা হয়ে উঠল একেবারে শোচনীয়। ডাক্তাররা তাঁকে জবাব দিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন, যে-কোনও দিন যে-কোনও মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হবে।

তাই হল। গভীর রাত্রে একদিন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ স্ত্রী আমার ঘুম ভাঙিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, বাবার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তিনি বারবার আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানার পাশে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম তখন তিনি কথা কইবার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। তবু সেই অবস্থায়, তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে বললেন, 'হরু, আমার বিছানায় এই যে মিশরের ইতিহাসখানি রয়েছে এখানি তুমি পরম যত্নে খুব সাবধানে রেখে দিয়ো। এর মধ্যে আছে কুবের-ভাণ্ডারের চাবি—দেখো, এ-বই কখনও যেন হাতছাড়া কোরো না।'

এই হচ্ছে বাবার শেষ কথা। এর মিনিট-খানেক পরেই তিনি অন্তিম-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তারপর দুই বৎসর কেটে গিয়েছে। আজ আমি ঠিক দরিদ্র না হলেও নিজেকে ধনী বলেও মনে করতে পারি না। কারণ, অর্থাভাবে মাঝে মাঝে বড়োই কষ্ট পাই। প্রপিতামহের, পিতামহের ও পিতার বহুব্যয়সাধ্য খেয়াল চরিতার্থ করতে করতে শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে আমাদের কুললক্ষ্মী আজ হয়তো বাড়ির বাইরেই পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন।

যখন বড়োই অর্থকষ্টে পড়ি, তখন বাবার শেষ কথাগুলি স্মরণ করে প্রাচীন মিশরের সেই ইতিহাসখানি নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তার মধ্যে আছে নাকি কুবের-ভাণ্ডারের চাবি! আমার চক্ষু তাকে আবিষ্কার করতে পারেনি।

ইতিহাসের গ্রন্থখানি হচ্ছে প্রকাণ্ড—তার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় এক হাজার। আমি বারবার তার প্রত্যেক পাতাখানি উলটে-পালটে দেখেছি, এমনকি বইখানি পাঠও করেছি বারংবার। কিন্তু সে হচ্ছে একখানি অতি সাধারণ ইতিহাস। কুবেরের ভাণ্ডারের সঙ্গে তার কোনও-রকম সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করবার কোনওই উপায় নেই। কেবল তার স্থানে স্থানে মুদ্রিত মানচিত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় হাতে-টানা লাল কালির রেখা। সম্ভবত এ রেখাগুলি টেনেছিলেন আমার বাবাই। কিন্তু রেখাগুলির ভিতর থেকেও আমি কোনও অর্থের সন্ধান পাইনি।

শেষটা স্থির করলুম, মৃত্যুকালে বাবার রুগ্ন মস্তিষ্ক বোধহয় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এবং তিনি আমার কাছে যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, তা ব্যাধির প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবু মনে কেমন খটকা লেগে রইল। অবহেলা না করে বইখানিকে তুলে রাখলুম আমার আলমারির ভিতরে।

এতক্ষণ ধরে আমি খালি গোড়ার কথাই বললুম। কিন্তু এইবারে যা বলব তাই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য। জয়ন্তবাবু, এখন থেকে আমার প্রত্যেক কথাই আপনি মন দিয়ে শুনলে, আমি অত্যন্ত বাধিত হব।

পরশুদিন বৈকালে আমার পাঠাগারে বসে আছি, হঠাৎ বেয়ারা এসে খবর দিলে, একজন বিদেশি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তাকে ডেকে আনতে বললুম।

যে-লোকটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে তার দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তার বয়স হয়তো পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু তাকে দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এখনও লোকটির দেহে আছে অসাধারণ পাশবিক শক্তি। তার পরনে খুব দামি ইংরেজি পোশাক,

রংও সাহেবদেরই মতন সাদা, কেবল তার মাথার লাল 'ফেজ'-টুপিটা দেখলেই বোঝা যায় সে ইউরোপীয় নয়, ভারতের বাইরেকার কোনও দেশের মুসলমান।

আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে আগন্তুক একটু হেসে ইংরেজিতে বললে, 'আপনি বোধহয় আমার মতন মূর্তিকে এখানে দেখবার আশা করেননি? কিন্তু আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

বললুম, 'হরিহর মজুমদার।'

—'আপনি কি মিস্টার হরেকৃষ্ণ মজুমদারের কেউ হন?'

—'আমি তাঁর একমাত্র পুত্র।'

—'আপনি মিস্টার মজুমদারের পুত্র? বড়োই আনন্দিত হলুম, বড়োই আনন্দিত হলুম! আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মিস্টার মজুমদার হচ্ছেন আমার অতি প্রিয়, পুরাতন বন্ধু। অনুগ্রহ করে একবার কি তাঁকে জানাবেন যে, ফুয়াদ পাসা এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে?'

আমি বললুম, 'আমার বাবা আর ইহলোকে বর্তমান নেই।'

—'বর্তমান নেই! বলেন কী?' ফুয়াদ হতাশভাবে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'আজ দুই বৎসর হল বুকের অসুখে আমার বাবা মারা পড়েছেন।'

ফুয়াদ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ইজিপ্ট থেকে আমি এসেছি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে। কলকাতায় আমার আসবার কথা ছিল না। তবু যে এখানে এসেছি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে মিস্টার মজুমদারের বন্ধুত্বের আকর্ষণ। কিন্তু এখন দেখছি আমার কলকাতায় আসাটা একেবারেই ব্যর্থ হল।'

ফুয়াদ বাবার পুরাতন বন্ধু শুনে তার দিকে আমার মন যে আকৃষ্ট হল সেটা আর বলাই বাহুল্য। তার সঙ্গে বাবার কথা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলুম এবং তার মুখ থেকে শুনলুম বাবার মিশর-অভিযানের নানা কাহিনি। অতীত মিশর সম্বন্ধে বাবার গভীর জ্ঞানের কথা নিয়েও আমার কাছে সে অনেক প্রশংসা করলে।

কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার চোখ আমার একটা আলমারির উপরে গিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর সে আমার দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বললে, 'ও-বইখানা দেখছি মিশরের ইতিহাস। ও-রকম বই পড়বার আগ্রহ আপনারও আছে নাকি?'

আমি বললুম, 'আমার নিজের বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। ও-বইখানা হচ্ছে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের।'

ফুয়াদ বললে, 'বইখানা আমি একবার দেখতে পারি কি?'

—'নিশ্চয়ই।' আমি উঠে দাঁড়িয়ে আলমারি খুলে বইখানা বার করে ফুয়াদের দিকে এগিয়ে দিলুম।

ফুয়াদ প্রায় পনেরো মিনিট ধরে বইখানার পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর মুখ তুলে বললে, 'মিস্টার মজুমদার, আমি আপনার পিতার মতন পুরাতত্ত্ববিদ নই বটে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস পড়তে বড়োই ভালোবাসি। এ-বইখানি এখন দুর্লভ, বাজারে সহজে কিনতে মেলে না। যখন বলছেন মিশর সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই, তখন

কি এই বইখানি অনুগ্রহ করে আমাকে দান করবেন? অবশ্য, যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তাহলে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েও আমি এখানি কিনতে রাজি আছি।'

আমি বললুম, 'মৃত্যুশয্যায় বাবা ওখানি নিজের হাতে আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। ওর প্রতি আমার বিশেষ একটু মমতা আছে, কাজেই ও-বইখানি পৈতৃক সম্পত্তির মতনই আমি নিজের কাছে রক্ষা করতে চাই।'

ফুয়াদ তবু ছাড়লে না, বললে, 'ও-কেতাবের যে দাম, আমি তার চেয়ে দশগুণ বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত। বলেন তো তারও চেয়ে বেশি দিতে পারি। আপনি কি আমার কথা রাখবেন না?'

আমি বললুম, 'আমাকে আর অনুরোধ করে লজ্জা দেবেন না! ও-বইখানি আমার পিতার শেষ দান, একশো গন্ডা বেশি দাম দিলেও ওখানি বিক্রয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আশা করি আমার মন বুঝে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ফুয়াদ কোনও জবাব দিলে না। গম্ভীরভাবে বসে বইখানি নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মিস্টার মজুমদার, আবার বইখানি কিনতে চেয়ে আমি আর আপনার 'সেন্টিমেন্টে' আঘাত দেব না। আজ তাহলে আসি। বিদায়।' বলেই সে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিশরের এই ইতিহাসখানির উপরে ফুয়াদ পাসার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে আমার কৌতূহল আবার জেগে উঠল। বারবার মনে পড়তে লাগল মৃত্যুশয্যায় পিতৃদেবের সেই উক্তি—এই বইখানি অতি সাবধানে রক্ষা কোরো, এর মধ্যে আছে কুবের-ভাণ্ডারের চাবি!

ফুয়াদ কি সেই দুর্লভ চাবির সন্ধানে সুদূর মিশর থেকে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে? সে কি পুস্তকের গুপ্তকথা কোনও গতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছে? নইলে এই পুস্তকের জন্যে সে যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি হল কেন? পুস্তকখানি কি সত্যই দুর্লভ? জানতে হল।

টেবিলের উপরেই ছিল আমার 'টেলিফোন', তৎক্ষণাৎ কলকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজ-প্রকাশককে 'ফোনে' ডাকলুম। তাকে এই ইতিহাসের ও তার গ্রন্থকারের নাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, বাজারে এই বইখানি কি কিনতে পাওয়া যায়?

উত্তরে জানলুম, তার ঘরেই এই ইতিহাসের দশখানি কপি বিক্রয়ের জন্যে মজুত আছে। তাহলে বইখানি দুষ্প্রাপ্য নয়! হয় ফুয়াদ এ খবর রাখে না, নয় সে মিথ্যা কথা বলেছে।

বইখানি ভালো করে আবার পরীক্ষা করবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠলুম। সে-রাত্রে আহারাদির পর শয়ন না করে বইখানিকে নিয়ে আবার নিযুক্ত হয়ে রইলুম। কিন্তু প্রায় শেষ-রাত পর্যন্ত অনেক মাথা খাটিয়ে এবং অনেক চেষ্টা করেও নতুন কোনও তথ্যই আবিষ্কার করতে পারলুম না। শেষটা শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে বইখানাকে টেবিলের উপরে ফেলে রেখেই শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

কাল রাতেও আর-একবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কী যে এই পুস্তকের গুপ্তকথা তা রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই। উলটে আমার ধারণা হল, এ কেতাবের মধ্যে কোনও গুপ্ত-রহস্যই নেই, হয়তো ফুয়াদের দেশে বইখানি পাওয়া যায় না, তাই এখানিকে লাভ করবার জন্যে তার মনে এমন লোভের উদয় হয়েছে।

মিশরের ইতিহাস নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।......কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল আচম্বিতে। আমার ঘুম অত্যন্ত সজাগ, বাড়ির কোথাও একটু শব্দ হলেই তখনই আমি জেগে উঠি।

বিছানার উপরে উঠে বসে ভাবতে লাগলুম, কেন আমার ঘুম ভাঙল? ব্যাপার কী? বাড়িতে চোর-টোর আসেনি তো?

শয্যা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। তারপর মুখ নামিয়ে তাকালুম নীচের দিকে।

আমার উঠানের একপ্রান্তে ছিল পাঠাগার। নীচের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলুম, দীর্ঘ একটা আলোকরেখা উঠানের উপরে এসে পড়েছে! বুঝতে দেরি লাগল না যে, নিশ্চয়ই কেউ আমার পাঠাগারে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়েছে, আর এই আলোকরেখাটা আসছে পাঠাগারের খোলা দরজার ভিতর দিয়েই।

ঢং ঢং ঢং করে বাজল রাত তিনটে। এত রাত্রে আমার পাঠাগারের ভিতরে ঢুকল কে? চোর? পাঠাগারে চোর?

ঘরের কোণ থেকে মোটা একগাছা লাঠি টেনে নিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলুম। কিন্তু একতলায় নেমে সবিস্ময়ে দেখলুম, উঠানের উপর থেকে আলোক-রেখা অদৃশ্য হয়েছে, পাঠাগার অন্ধকার! চোরেরা তাহলে আমার সাড়া পেয়েছে?

উঠানের আলোর 'সুইচ' ছিল অন্য দিকে। পাছে অন্ধকারে কেউ আমাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়ে লাঠিগাছা বাগিয়ে ধরে আমি আলোর 'সুইচে'র দিকে এগিয়ে গেলুম পরম সাবধানে। উঠানের আলো জ্বাললুম। কোনওদিকে কেউ নেই। কিন্তু তারপর তাড়াতাড়ি পাঠাগারের কাছে এসে দেখি, ঘরের দরজা খোলা। তাহলে নিশ্চয় এখানে কেউ এসেছিল! পাঠাগারে ঢুকে আবার আলো জ্বাললুম। ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম, কিন্তু এখানে চোরের আবির্ভাবের কোনও লক্ষণই নজরে পড়ল না। যেখানকার যা জিনিস সমস্তই ঠিক আছে। বুঝলুম, আমার সাড়া পেয়ে চোর সরে পড়েছে, তাড়াতাড়িতে কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। তারপর পাঠাগারের দরজার কুলুপটা পরীক্ষা করে দেখলুম। কুলুপ ভাঙা। তাহলে এই কুলুপ ভাঙার শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে!

কিন্তু চোর কোন দিক দিয়ে এসেছে, আর কোন দিক দিয়েই বা পালিয়েছে? সদরের কাছে এসে দেখি, দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ করা রয়েছে!

চারিদিকে আরও খানিক মিথ্যা খোঁজাখুঁজি করে শেষটা হতভম্বের মতো আবার উপরে এসে উঠলুম। শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ টেবিলের দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষু হয়ে উঠল সচকিত। ওই টেবিলের উপর ছিল মিশরের সেই ইতিহাস। কিন্তু বইখানা এখন আর টেবিলের উপরে নেই!

বুকটা ধড়াস করে উঠল। প্রথমে ভাবলুম হয়তো তন্দ্রার ঘোরে ভুলে বইখানা আমি অন্য কোথাও রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। পাগলের মতন ঘরের এখানে-ওখানে-সেখানে এমন-কী যেসব জায়গায় আমার পক্ষে বইখানা রেখে দেওয়া অসম্ভব সেসব স্থানেও খুঁজতে বাকি রাখলুম না, কিন্তু কোথাও নেই মিশরের সেই ইতিহাস!

তবে কি আমি যখন উঠানের আলো জ্বালবার জন্যে অন্য দিকে গিয়েছিলুম, তখন সেই ফাঁকে অন্ধকারে চোর এসে উঠেছে বাড়ির উপরে? কিন্তু উপর থেকে আবার নীচে নামল কোন পথে? সে বাড়ির ছাদে উঠে লুকিয়ে নেই তো?

'টর্চ' ও লাঠি হাতে করে বেগে ছাদের উপরে গিয়ে উঠলুম। কিন্তু সেখানেও কেউ কোথাও নেই।

তারপর এদিকে-ওদিকে আলো ফেলে হঠাৎ একদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলুম, ছাদের উপর থেকে বাইরে নেমে গিয়েছে দীর্ঘ এক দড়ির সিঁড়ি!

চোর তাহলে এই পথ দিয়েই অদৃশ্য হয়েছে?

কিন্তু এ কী আশ্চর্য কাণ্ড। গৃহস্থের সঙ্গে চোরেদের সম্পর্ক চিরদিনই ঘনিষ্ঠ। এমন বাড়ি বোধহয় নেই যেখানে হয়নি চোরের আবির্ভাব। চোর আসে চুরি করতে আর সে চুরি করে এমন সব দ্রব্য যার বাজারদর আছে। আর আমার বাড়িতে এই চোর এসেছে কী চুরি করতে? একখানা সাধারণ কেতাব। এবং সে কেতাবও হচ্ছে যে-শ্রেণির, কোনও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়া আর কেউ যা উলটে দেখতেও চাইবে না।

আবার বাবার সাবধান-বাণী স্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম, এ কোনও সাধারণ চোরের কাজ নয়, এ-চোর আমার বাড়িতে এসেছে কেবলমাত্র ওই কেতাবখানিই হস্তগত করবার জন্যে। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল ফুয়াদ পাসার কথা। এ বইখানি সে যে-কোনও মূল্যে ক্রয় করতে প্রস্তুত ছিল, এখানি পাবার জন্যে তার লোভ ছিল অত্যধিক। তবে কি ফুয়াদই নিজে এসে কিংবা কোনও লোক লাগিয়ে বইখানিকে আমার বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছে? হায় হায়, তবে কি আমি হাতে পেয়েও হারিয়ে ফেললুম এই অজানা কুবের-ভাণ্ডারের চাবি?

ব্যাপারটা যতই তলিয়ে ভাবতে লাগলুম, আমার মনে এই বিশ্বাস ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল যে, ফুয়াদ ছাড়া আর কেহই এই চুরির জন্যে দায়ী নয়। আমি যে-গুপ্তকথা এত চেষ্টাতেও আবিষ্কার করতে পারিনি, ফুয়াদ হয়তো তার রহস্য সম্পূর্ণরূপেই জানে! কিন্তু সেই রহস্যের চাবি ছিল আমার কাছে, যার অভাবে এতদিন সে কিছুই করতে পারেনি। আমার জিম্মা থেকে চাবিটি গিয়েছে আজ তারই জিম্মায়!

এইসব ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। তবু আমার চিন্তাসাগরে কোনওই কূল-কিনারা পেলুম না।

জয়ন্তবাবু, তারপর আপনার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। বহু লোকের মুখেই অনেকদিন থেকে শুনে আসছি, অপরাধের ক্ষেত্রে আপনার শক্তি নাকি ঐন্দ্রজালিকের মতন। তাই পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে আপনার কাছেই এসে পড়েছি। এখন আমার ভার আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে—আপনি 'না' বললেও আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলে হরিহর।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'হরিহরবাবু, আপনার কাহিনি শুনলুম। ঘটনাটা রহস্যময় বটে—আর রহস্য আমি ভালোবাসি। কিন্তু এ চুরির মধ্যে কোনও রহস্যই নেই, যা-কিছু রহস্য আছে সেই প্রাচীন মিশরের ইতিহাস-গ্রন্থের মধ্যে। এ চোরকে

বোধহয় আমি খুব শীঘ্রই ধরে দিতে পারব। কিন্তু সেইখানেই আপনি যদি এই নাটকের উপর যবনিকাপাত করতে চান, তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নই।'

হরিহর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন? আপনি যা বলেন আমি তাই করতে রাজি।'

—'আপনি মিশরে যেতে রাজি আছেন?'

—মিশরে!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিশরে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওই ইতিহাস-গ্রন্থের ভিতরে রহস্যের চাবিকাটি থাকলেও, আসল কুবের-ভাণ্ডার আছে মিশরের যে-কোনও স্থানে। আমি যদি বইখানি উদ্ধার করতে পারি, তবে চাবিটিকে খুঁজে বার করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেবল সেই চাবি নিয়েই আমি খুশি হতে পারব না, কোন দেশের কোন ভাণ্ডারের কোন কুলুপে লাগে সেই চাবিকাটি, সেটা না দেখে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। হয়তো আমাদের আজকেই যেতে হবে মিশরের দিকে। পারবেন আপনি আমাদের সঙ্গে যাত্রা করতে?'

হরিহর কিছুক্ষণ নীরব হয়ে ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'যদি কুবের-ভাণ্ডারের সন্ধান পাই, তাহলে আপনার সঙ্গে আমি সাহারা মরুভূমিতেও যেতে রাজি আছি।'

—'আজকেই?'

—'আজকেই।'

জয়ন্ত কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'হয়েছে, হয়েছে! হরিহরবাবু, আপনি মানিকের সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করুন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বেন না। মানিক, 'ড্রয়ার' থেকে আমার মনিব্যাগটা বার করে দাও। তারপর মধুকে বলে এসো, সে যেন ড্রাইভারেকে আমার গাড়িখানা এখনই বার করতে বলে ততক্ষণে আমি জামা-কাপড়গুলো পরে নিই। আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।'

॥ তৃতীয় ॥

যাত্রা

ঘণ্টা দুই পরে জয়ন্ত আবার ফিরে এল—নিজের রুপোর নস্যদানি থেকে ঘন ঘন নস্য নিতে নিতে।

মানিক বুঝলে, শুভলক্ষণ। সে জানে, খুব খুশি না হলে জয়ন্ত নস্য নেয় না।

সে হাসিমুখে বললে, 'শিকারি, তোমার শিকার ধরতে পেরেছ নাকি?'

জয়ন্ত একখানা ইজিচেয়ারে বসে হেলে পড়ে সামনের দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'শিকার ধরিনি বন্ধু তবে শিকারের গন্ধ পেয়েছি বটে।'

মানিক বললে, 'একটু ব্যাখ্যা করে বললে বুঝতে পারি।'

জয়ন্ত দুই চোখ মুদে ফেলে বললে, 'হরিহরবাবু, আমি যা ভেবেছি তাই। এ বইখানি

এতদিন আপনার কাছেই পড়েছিল এর জন্যে কারুর কোনও মাথাব্যথাই হয়নি। কিন্তু আপনার বাড়িতে যেই মিশরবাসী ফুয়াদ পাসার আবির্ভাব, অমনি প্রাচীন মিশরের ইতিহাস গেল উড়ে। সুতরাং এ-চুরি যে ফুয়াদ কিংবা তার নিযুক্ত কোনও চরের কীর্তি, সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাস্তি। চোর সম্বন্ধে যখন নিশ্চিত হলুম, তখন আমি চোরের মনোভাবটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলুম। সে সুদূর মিশর থেকে নদী-সাগর পেরিয়ে বাংলার রাজধানী পর্যন্ত ছুটে এসেছে কেবলমাত্র এই বইখানির লোভে। সুতরাং ইষ্টসিদ্ধি করেই সে যে আবার স্বদেশের দিকে ধাবমান হবে, এটা খুব সহজ আর স্বাভাবিক কথা। আর সে যে আজকে প্রথম সুযোগেই কলকাতা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে, এ বিষয়েও যুক্তির অভাব নেই। ফুয়াদ যে নির্বোধ নয় এটুকু আমাদের অনুমান করে নেওয়া উচিত। সে জানে যে চুরি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি পুলিশে খবর দেবেন। সে হচ্ছে বিদেশি লোক, তার পক্ষে এই অজানা শহরে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি তার মতন বিদেশিকে খুব সহজেই আবিষ্কার করে ফেলবে। এমন ক্ষেত্রে লুপ্তরত্নোদ্ধার করে প্রথম সুযোগেই এই বিপজ্জনক নগরকে ত্যাগ করে সে আবার লম্বা দিতে চাইবে। এইটুকু হিসাব করেই এখনই আমি কোথায় গিয়েছিলুম জানেন? হাওড়া স্টেশনে। অন্য লোকের পালাবার জন্যে এখানে অন্যান্য পথ খোলা আছে বটে, কিন্তু ফুয়াদ হচ্ছে মিশরের বাসিন্দা। প্রথমেই সে পালাবার চেষ্টা করবে বোম্বাইয়ের দিকে, তারপর সেখানে থেকে উঠবে গিয়ে স্বদেশগামী জাহাজে। তাই আমি হাওড়া স্টেশনে যথাস্থানে গিয়ে খোঁজ নিলুম যে, বোম্বাইয়ের ট্রেনে ফুয়াদ পাসা নামে কোনও যাত্রী নিজের জন্যে 'বার্থ রিজার্ভ' করেছে কি না? আমার অনুমান ব্যর্থ হয়নি হরিহরবাবু, অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল আজই সন্ধ্যায় ফুয়াদ পাসা নামে জনৈক ব্যক্তি বোম্বে মেলের দ্বিতীয় শ্রেণির এক কামরায় উঠে বোম্বাইয়ের দিকে যাত্রা করবে।'

মানিক বললে, 'তুমি সফল হয়েছ শুনে সুখী হলুম, কিন্তু ফুয়াদ যদি কোনও 'বার্থ রিজার্ভ' না করতে?'

—'তাহলে হরিহরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার সময় আমরা যেতুম হাওড়া স্টেশনে। দেখতুম, ফুয়াদ বোম্বে মেলে আরোহণ করে কি না?'

—'এখন তুমি কী করতে চাও জয়ন্ত?'

—'আজ সন্ধ্যায় বোম্বাই যাত্রা করতে চাই। অন্য কামরায় আমিও তিনটে 'বার্থ রিজার্ভ' করে রেখেছি।'

—'তারপর?'

—'তারপর ফুয়াদের সঙ্গে আমরাও চাপব মিশরগামী জাহাজে।'

—'এইটুকু সময়ের মধ্যে আমরা প্রস্তুত হতে পারব?'

—'এইটুকু সময়? পলাশির ক্ষেত্রে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জয় করতে ক্লাইভের কতটুকু সময় লেগেছিল? কতটুকু সময় লেগেছিল ওয়াটারলুর ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের জীবনব্যাপী স্বপ্ন ছুটে যেতে? যথেষ্ট সময় আছে মানিক, আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। জড়তা ত্যাগ করো, উঠে দাঁড়াও, প্রস্তুত হও। হরিহরবাবু, আপনিও বাড়ির দিকে দ্রুত পদচালনা করুন চটপট তৈরি হয়ে নিন।'

হরিহর দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু—'

—'আবার কিন্তু কীসের?'

—'আপনি বলছেন, আমরাও ফুয়াদের সহযাত্রী হব?'

—'হ্যাঁ।'

—কিন্তু ফুয়াদ আমাকে চেনে। আমাকে দেখলেই তার সন্দেহ হবে। আত্মরক্ষার জন্যে সে যদি চোরাইমাল নষ্ট করে ফেলে, তাহলে কী হবে জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললে, 'আপনার বুদ্ধি আছে দেখে সুখী হলুম। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমারও বুদ্ধির ভাঁড়ে মা ভবানী বর্তমান নেই? ওকথা আমিও ভেবে দেখেছি, আর আর একটা উপায়ও স্থির করেছি।'

—'কী উপায়?'

—'আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করবেন।'

—'ছদ্মবেশ!'

—'হুঁ। ফুয়াদ আপনাকে মাত্র এক দিন কিছুক্ষণের জন্যে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এটা তো জানেন, এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের মুখ একবারমাত্র দেখে ভালো করে মনে রাখতে পারে না? তার ওপরে আপনি পরবেন সাহেবি পোশাক আপনার চোখে থাকবে রঙিন চশমা, কামিয়ে ফেলবেন আপনার ওই গোঁফ আর 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি। তারপর ফুয়াদের সাধ্য কী যে আপনাকে আবার চিনতে পারবে। বুঝেছ মানিক, আমরাও আর বাঙালি থাকব না! আমি হব সীমান্তের পাঠান, আর তুমি হবে বোম্বাইবাসী কোনও ভদ্রলোক। হরিহরবাবু কী বলেন? এ বন্দোবস্ত কি মন্দ?'

হরিহর তবু যেন মনের ভিতর থেকে জোর পেলে না। হাসতে হাসতে বললে, 'বন্দোবস্ত মন্দ নয়, অনেকটা শোনাচ্ছে ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন। কিন্তু এইটেই আমার মাথায় আসছে না যে ফুয়াদের পিছনে পিছনে ছুটে আমরা কী করব? ট্রেনে কি জাহাজে উঠে, কিংবা মিশরে নেমে আমরা কি জোর করে তার কাছ থেকে বইখানা আবার কেড়ে নেব?'

জয়ন্ত বললে, 'আহা-হা-হা হরিহরবাবু, পালা শুরুর আগেই অতটা ভাবিত হচ্ছেন কেন? আপনি যখন আমাকে অবলম্বন করেছেন, তখন মস্তিষ্ক-চালনার ভারটা আমার উপরেই অর্পণ করুন না! মানিককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারি বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে। আমি বুনোহাঁসের পিছনে ধাবিত হব না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

হরিহর বললে, 'কী করে নিশ্চিন্ত হই জয়ন্তবাবু? আপনাদের চিন্তা নেই, কারণ আপনারা এইসব কাজেরই কাজি। কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়ে উঠছি নিজের কথা ভেবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে যদি কোনও গুরুতর বিপদে পড়ি?'

—'আমরা আপনাকে উদ্ধার করব। মাভৈঃ হরিহরবাবু, সাহসের অভাব হলেই বিপদের ভয় বাড়ে। আর বিপদ এলেই বেড়ে ওঠে আমার স্ফূর্তি আর আমার বুদ্ধি।'

হরিহর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ। কপালে যা আছে তাই হবে। দেখছি আপনাদের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই।'

॥ চতুর্থ ॥

সামুদ্রিক নাট্যাভিনয়

নীলাকাশে উঠছে নীল সাগরের নীল সংগীত।

হ্যাঁ, এ সংগীতের রং নীল ছাড়া আর-কিছু হতে পারে না। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র—এই দুই অনন্ত বিস্ময় যে অসীম নীলজগতের চিত্রপট চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তই যেন অপূর্ব এক নীলিমা দিয়ে গড়া। নীল, নীল, নীল! নীলিমার কী বিপুল উচ্ছ্বাস!

কোথায় পৃথিবীর গৈরিক মাটি, কোথায় অরণ্যের শ্যামল ছন্দ, কোথায় নগরের ধূলিধূসর! এই অসীম বিরাটের কোলে আশ্রয় নিয়ে এরই মধ্যে মনে হচ্ছে সেসব যেন জন্মান্তরের স্বপ্ন!

সমুদ্রের সংগীতে পাই আমাদের জীবনের সংগীত। মানুষের জীবন গড়া স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, দয়া, মায়া, ভক্তি দিয়ে। এদের প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে এক-একটি মৌন সংগীতের সুর। আর সেই সংগীতময় বিচিত্র জীবনেরই ছন্দ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মহাসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে। সমুদ্রের কাছে এলে মানুষের প্রাণ তাই বুঝি এমন অভিভূত হয়ে পড়ে।

সমুদ্রের চঞ্চল নীলপটে সাদা ফেনার আলপনা দিতে দিতে ছুটে চলেছে একখানি বেগবান জাহাজ। তার গর্ভবাসী মনুষ্য-কীটরা তাকে মনে করছে সুবিশাল এক অট্টালিকার মতন—ভেকরা যেমন কূপকে মনে করে বৃহৎ এক বিশ্ব! কিন্তু বাহির থেকে মহাসাগরের বিশাল গর্ভে দোলায়মান এই জাহাজখানিকে দেখাচ্ছে কতই তুচ্ছ, কতই ক্ষুদ্র! মানুষ ভিতর থেকে নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারে না, তার ক্ষুদ্রতা আবিষ্কার করে বাহিরের দৃষ্টি।

জাহাজ ছুটে চলেছে নীলনদধৌত মিশরভূমির দিকে এবং তার ভিতরে যে বিচিত্র নাটকের গুপ্ত অভিনয় চলছে, এইবারে আমরা তাই-ই দেখবার চেষ্টা করব।

এই জাহাজের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে ফুয়াদ পাসা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর। বলা বাহুল্য, ফুয়াদ ছাড়া বাকি তিনজনই ছদ্মবেশের সাহায্য গ্রহণ করেছে।

জয়ন্ত এখন সীমান্তের পাঠান এবং তার বৃহৎ দেহ পাঠানি-পোশাকে দেখতে হয়েছে রীতিমতো জমকালো। সে বুক ফুলিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে সিধে হয়ে হাঁটে এবং তার দুই চক্ষে প্রকাশ পায় এমন তীব্র গর্বিত ও বন্য ভাব যে, তাকে দেখলে লোকে পথ ছেড়ে দেয় সসম্ভ্রমে। সে যেন একাই একশো। কারুর সঙ্গে মেশে না, কারুর সঙ্গে কথা কয় না—তার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে না জাহাজের অন্যান্য আরোহীরাও।

মানিক সেজেছে বোম্বাইয়ের এক সওদাগর এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদও ভূমিকারই অনুরূপ। জাহাজের সবাই জানে, কোটিপতি হলেও সে খুবই মিশুক, সকলেরই সঙ্গে যেচে আলাপ করতে চায়। তার মুখ সর্বদাই হাসিখুশি মাখা এবং হাতও খুব দরাজ। এরই মধ্যে সে জাহাজের অনেকগুলি যাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলেছে এবং প্রতি সন্ধ্যাতেই দু-চার জন লোককে নিমন্ত্রণ করে রীতিমতো পেট ভরিয়ে না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না।

হরিহর বেচারি সাদাসিধে মানুষ, অভিনয় করতে তার বিলক্ষণ বাধে। তবু জয়ন্ত পাখি-পড়ানোর মতন করে বারংবার তাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, সে কোনওরকমে তা পালন করে যায়, এইমাত্র। সে অত্যন্ত লাজুক বলে জয়ন্ত তাকে যাত্রীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে মানা করেছে, তবু কারুর কারুর সঙ্গে মৌখিক আলাপ হয়েছে এবং কেউ কেউ জিজ্ঞাসাও করেছে, তার সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য কী? সে সংক্ষেপে বলে, উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নেই, নতুন নতুন দেশ দেখা ছাড়া। তাকে বিশেষ কোনও ছদ্মবেশও গ্রহণ করতে হয়নি। কিন্তু ইংরেজি পোশাক পরে, চোখে রঙিন চশমা লাগিয়ে ও দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে তার চেহারা হয়েছে একেবারে অন্য কোনও লোকের মতন।

পাছে ফুয়াদের মনে কোনও সন্দেহ জাগে, সেই ভয়ে জয়ন্ত আর-এক সাবধানতা অবলম্বন করেছে। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা জানে তারা কেউ কারুকে চেনে না। এবং তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা 'কেবিনে' বাসা বেঁধেছে।

অনেক চেষ্টা করে জয়ন্ত যে-কেবিনটি পেয়েছে, সেটি ছিল ঠিক ফুয়াদের কেবিনের গায়েই। দুজনের কেবিনের মাঝখানে কেবল একটি কাঠের পাতলা দেওয়াল। ফুয়াদ তার সঙ্গে দু-এক বার আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জয়ন্ত তাকে আমল দেয়নি। তার আকৃতি-প্রকৃতির কঠোরতা দেখে ফুয়াদও এখন আর তার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে না।

কিন্তু প্রায়ই তিন ছদ্মবেশী একসঙ্গে এসে মিশত গভীর রাত্রে জাহাজের কোনও গোপন আনাচে-কানাচে। এ-সম্মিলনও বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। মিনিট চার-পাঁচ পরামর্শ করেই তারা যে যার কেবিনে সরে পড়ত।

এক রাত্রের কথা বলি। জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর ডেকের উপরে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে চেয়ারে বসেছিল। তাদের আশেপাশে পৃথিবীর আরও নানান জাতির লোকেরা বিশ্রাম ও বায়ু সেবন করতে করতে তারকাহীরক-খচিত আকাশের তলায় অস্পষ্ট সাগরের দিকে তাকিয়েছিল এবং শুনছিল তার গম্ভীর সজল কণ্ঠের আদিম সংগীত। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকের উপর থেকে একে একে কমতে লাগল যাত্রীর সংখ্যা। আরও খানিক পরে দেখা গেল উপরে জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর ছাড়া আর কোনও লোকই নেই। জয়ন্ত আস্তে আস্তে শিস দিলে। এটা হল সংকেত। এতক্ষণ মানিক ও হরিহর নিজের নিজের চেয়ারে ঘুমের ভান করে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিল, শিস শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে গেল তাদের সমস্ত জড়তা। তারা উঠে এসে জয়ন্তর দুই পাশে আসন গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'হরিহরবাবু, ফুয়াদের হাতে আমি বোধহয় আজ মিশরের সেই ইতিহাসখানিই দেখতে পেয়েছি।'

হরিহর রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'অতি সহজে। আমাদের দুজনের কেবিনের মাঝখানে আছে একটিমাত্র কাঠের 'পার্টিশান'। ফুয়াদ যখন তার কেবিনে ছিল না তখন সেই 'পার্টিশানে'র কাঠের উপরে আমি এমন একটি ছোটো ছ্যাঁদা করেছি, যার ভিতর দিয়ে একটিমাত্র চক্ষুর সাহায্যে ফুয়াদের কেবিনের প্রায় সমস্তটাই দেখা যায়। পাছে রাতে আমার কেবিনের আলো সেই

ছিদ্রপথে ফুয়াদের কেবিনে ঢুকে তাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে, সেই ভয়ে অন্য সময়ে আমি একটি মোমের ছিপি দিয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু ছিদ্রপথে আমার আঁখিপাখি যখন উড়ে যায় তার কামরায়, তখন আমার কামরার আলো থাকে নেবানো। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ফুয়াদ নিজেকে নিরাপদ মনে করে নিশ্চিন্ত হয়েই আছে।'

হরিহর বললে, 'আপনি বাহাদুর ব্যক্তি।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'অভিনন্দন পরে দেবেন, আগে সব শুনুন। আজ সন্ধ্যার সময় কী দেখেছি জানেন?'

—'কী, কী?'

—'সে তার সুটকেস খুলে বার করলে একখানা মোটা মস্ত বই। বইখানা লাল-রঙের চামড়ায় বাঁধানো।'

হরিহর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তাহলে আপনি ঠিকই দেখেছেন। মিশরের সেই ইতিহাসখানার মলাটও লাল-রঙের।'

জয়ন্ত বললে, 'তবে আর কোনও সন্দেহই নেই। ফুয়াদ বইখানা কোলের উপরে রেখে পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগল আর মাঝে মাঝে থেমে বইখানার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। কেতাবের সমস্ত পাতা ওলটানো যখন শেষ হল, তখন সে হতাশভাবে নিজের ভাষায় কী একটা অস্ফুট কথা উচ্চারণ করলে, তারপর উঠে বইখানা আবার সুটকেসের ভিতরে পুরে কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার ভাবগতিক দেখে মনে হল, আপনার মতন সে-ও এখনও রহস্যের চাবিকাটি খুঁজে পায়নি।'

হরিহর হেসে বললে, 'শুনে কতকটা তবু আশ্বস্ত হলুম।'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, আশ্বস্ত হবার কোনওই কারণ নেই। জয়ন্ত, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো?'

—'বলো।'

—'হরিহরবাবুর মুখের কথা শুনেই মনে হয়, তাঁর পিতা হয়তো সমস্ত বক্তব্য বলে যেতে পারেননি—মৃত্যু এসে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, কুবের-ভাণ্ডারের কোনও কোনও ইঙ্গিত ওই বইখানার ভিতরে থাকলেও তার চাবিকাটি আছে অন্য কোথাও। হয়তো ওই বইখানা পেলেও আমাদের কোনও কাজেই লাগবে না।'

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'তবু বইখানাকে আমি উদ্ধার করবই।'

—'কেমন করে?'

—'চুরি করব।'

—'ফুয়াদ তোমাকে চুরির সুযোগ দেবে কেন?'

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, 'নিজের সুযোগ আমি নিজেই সৃষ্টি করব। শোনো মানিক, শোনো বোম্বাইবাসী সওদাগর। তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

—'পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করতে পারি।'

—'শুনেছি এর মধ্যেই ফুয়াদের সঙ্গে তোমার অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছে।'

—'তা হয়েছে। ফুয়াদের আর যে-কোনও দোষ থাক, সে-ও খুব মিশুক-লোক।'

—'ফুয়াদকে একদিন সন্ধ্যায় তুমি নিজের কেবিনে নিমন্ত্রণ করেছিলে না?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি আসছে-কাল সন্ধ্যাতেও ফুয়াদকে নিমন্ত্রণ করে 'ডিনার' খাওয়াতে পারবে?'

—'সেটা আর এমন শক্ত কথা কী? কিন্তু আমি ফুয়াদকে নিমন্ত্রণ করলে তোমার কী উপকার হবে শুনি?'

—'সেই ফাঁকে আমি ফুয়াদের কেবিনের ভিতর ভ্রমণ করতে যাব।'

—'ফুয়াদ এত বোকা নয় যে, নিজের কেবিনের দরজায় চাবি না লাগিয়ে 'ডিনার' খেতে আসবে।'

জয়ন্ত চাপা হাসি হেসে বললে, 'বন্ধু হে, 'তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!' তুমি কি আমার গুণপনা জানো না? ইচ্ছা করলে আমি পালোয়ান হতে পারতুম, আবার একটি প্রথম-শ্রেণির চোরও হতে পারতুম। চুরিবিদ্যার সমস্ত পাঠই আমার মুখস্থ। আমি পকেট কাটতেও জানি, দেওয়াল বয়ে গৃহস্থের দুর্গমবাড়ির ভিতরে ঢুকতেও জানি, আবার যে-কোনও তালা বা সিন্দুক বা দেরাজ বন্ধ থাকলেও খোলবার কৌশল জানি। সমস্ত উপকরণই আমার সঙ্গেই আছে। চুরিবিদ্যার ভিতরের কথা না জানলে কেউ কখনও ভালো গোয়েন্দা হতে পারে না—বুঝেছ মূর্খ?'

—বুঝেছি। কথাটা আমার মনে ছিল না।'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'উত্তম! তাহলে! এই কথাই রইল। আজ তবে আসর ভঙ্গ করা হোক।'

হরিহর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কাল আমায় কিছু করতে হবে না তো?'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'আপনি ? হ্যাঁ, কাল আপনি এক কাজ করতে পারেন।'

হরিহর ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা, আমি আবার কী করব?'

—'এইখানে ডেকচেয়ারে শুয়ে কাল আপনি নৈশ-বায়ু সেবন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বেন। কেমন, এটা পারবেন তো?'

হরিহর একগাল হেসে বললে, 'তা আমি খুব পারব। নিদ্রাদেবীর সাধনায় আমি সিদ্ধিলাভ করেছি। দেবীর বরে আমি একটানা চব্বিশ ঘন্টাকাল ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি।'

—'কিছুই না খেয়েই?'

—'খিদে পেলে খাওয়ার স্বপ্ন দেখেই আমি আত্মারাম লাভ করতে পারি।'

—'তাহলে আপনি মহাত্মা ব্যক্তি। চলুন এখন।'

পরের দিন বোম্বাইয়ের সওদাগরবেশী মানিক নিজের কেবিনে যথাসময়ে একটি ছোটো-খাটো ভোজনসভার অনুষ্ঠান করলে।

সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন স্ত্রীর সঙ্গে একটি ফরাসি ভদ্রলোক, একজন পাঞ্জাবি মুসলমান এবং বলা বাহুল্য, ফুয়াদ পাসা।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে খানিকক্ষণ চলল তাস খেলা, তারপরে হল নানান দেশের গল্প, তারপরে ফরাসি ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং ফুয়াদ পাসা গাইলে নিজের নিজের ভাষায়

একটি করে গান। তারপর আরম্ভ হল পানাহার। আসর যখন ভাঙল রাত তখন এগারোটা।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে মানিক আস্তে আস্তে নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, কয়েকজন যাত্রী তখনও সেখানে বর্তমান। এবং এটাও লক্ষ করলে, এক জায়গায় হরিহরবাবু সত্য-সত্যই নাসিকা যন্ত্রের মন্ত্রধ্বনি দ্বারা নিদ্রাদেবীর সাধনায় একান্তভাবে নিযুক্ত আছেন। সে একধারে গিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

খানিকক্ষণ পরে একমাত্র হরিহরবাবু ছাড়া আর সব যাত্রী একে একে ডেকের উপর থেকে অদৃশ্য হল।

আরও মিনিট-দশেক গেল। আচম্বিতে নাসিকাযন্ত্র চালনা বন্ধ করে ফেলে হরিহর মাথা তুলে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করলে। তারপর দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে একটা মস্ত হাই তুলে গাত্রোত্থান করে মানিকের কাছে এসে দাঁড়াল।

—মানিক বললে, 'ঘুম ভাঙল?'

—'আমি ঘুমোইনি।'

—'মানে?'

—'কীসের মানে জিজ্ঞাসা করছেন?'

—'না ঘুমোলেও মানুষের নাক ডাকে নাকি?'

—'ডাকে বই কি। অভিনয় করলেই ডাকে।'

—'অভিনয়?'

—'হ্যাঁ, অভিনয়। সঙ্গদোষে কী না হয়? আপনাদের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও একটু একটু অভিনয় করতে শিখেছি বই কি! আসলে আমি জেগে ছিলুম।'

—সাধু হরিহরবাবু, সাধু! অপানার পদোন্নতি দেখে আশান্বিত হলুম।'

—'বেশি আশা না করাই ভালো। যতই চেষ্টা করি, আমি জয়ন্তবাবুর মতন কোনওদিনই চুরিবিদ্যা অভ্যাস করতে পারব না! বাব্বাঃ! এতক্ষণ আমার বুক টিপটিপ করছিল। খালি মনে হচ্ছিল চুরি করতে গিয়ে জয়ন্তবাবু এই বুঝি ধরা পড়েন, এই বুঝি কে দেখে ফেলে!'

মানিক চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত কাজ হাসিল করতে পেরেছে কি? এখনও তো তার দেখা নেই।'

তারা আরও প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা করলে। কিন্তু জয়ন্ত-পাত্রটি যে সেদিন ডেকের উপরে উঁকি মারবে, এমন কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

জয়ন্তের অদর্শনে মানিক একটু চিন্তিত হল। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কেবিনের দিকে অগ্রসর হল সন্দেহ-দোলায় দুলতে দুলতে।

পরের দিন সকালে মানিক কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে, ডেকের উপরে বেশ একটি গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি গোলমাল করছে ফুয়াদ পাসা। সে তার দীর্ঘ দুই বাহু আন্দোলন করতে করতে ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে বলছে, 'মাঝ-সমুদ্রে চুরি যখন

হয়েছে, চোর তখন এই জাহাজেই আছে। সব কামরা খানাতল্লাশ করো—এ চোরকে না ধরে আমি ছাড়ব না।'

মনে মনে পুলকিত হয়ে, বাইরে বিস্মিত ভাব দেখিয়ে ফুয়াদের কাছে গিয়ে মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে স্যার, ব্যাপার কী?'

ফুয়াদ বললে, 'গুরুতর ব্যাপার! কাল রাতে আমার কেবিনে চোর ঢুকেছিল।'

—'কখন স্যার, কখন?'

—'কেমন করে বলব? আপনার ওখান থেকে ডিনার খেয়ে যখন ফিরে আসি তখন আমার কেবিনের দরজা যেমন বন্ধ করে গিয়েছিলুম, তেমনি বন্ধই ছিল। আজ সকালে উঠেও দরজা আমি ভিতর থেকেই খুলেছি। অথচ তার পরেই কেবিনের ভিতরে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আমার একটা সুটকেস একেবারে অদৃশ্য হয়েছে!'

মানিক হতভম্ব ভাব দেখিয়ে বললে, 'ভারী আশ্চর্য চুরি তো!'

ফুয়াদ গর্জন করে বললে, 'যতই আশ্চর্য হোক, এ চোরকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না! সে তো আর পাখি নয়, যে মাঝ-সমুদ্রে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে! সে এই জাহাজেই আছে! এখনই আমি খানাতল্লাশের ব্যবস্থা করছি।' বলতে বলতে সে সশব্দে পা ফেলে জাহাজের কাপ্তেনের কাছে ছুটে গেল।

মানিক ফিরে অন্যদিকে খানিক অগ্রসর হয়ে দেখলে, ডেকের রেলিং ধরে হরিহর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ মড়ার মতন সাদা। মানিককে দেখেই সে কম্পিতস্বরে চুপি-চুপি বললে, 'কী হবে মানিকবাবু?'

মানিক মৃদুস্বরে ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ! হবে আবার কী?'

—'একেবারে ঢাকিসুদ্ধ ঢাক চুরি! বইসুদ্ধ সুটকেস? এখনই খানাতল্লাশ শুরু হবে, একটা বড়ো সুটকেস জয়ন্তবাবু কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? কোঁত করে গিলে ফেলতে পারবেন না তো?'

—'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না'—বিরক্তমুখে এই কথা বলেই মানিক সেখান থেকে চলে গেল।

হরিহর করুণভাবে নিজের মনেই বললে, 'জয়ন্তবাবু চুরিবিদ্যায় এমন ওস্তাদ জানলে আমি কি কখনও এদের সঙ্গে আসতুম? এইবারে তাঁর ওস্তাদি বেরিয়ে যাবে তো? তিনি গ্রেপ্তার হলে তাঁর আসল পরিচয়ও প্রকাশ পাবে—সঙ্গে সঙ্গে আমিও হয়তো ধরা পড়ব! হায় হায়, কেন এদের সঙ্গে এলুম।'

সেই দিন গভীর রাত্রে।

জয়ন্ত ও মানিক ডেকের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। হরিহর ভয়ে সেদিন আর ডেকের উপরে মুখ বাড়ায়নি।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়, তুমি সুটকেসটা সরিয়ে ফেললে কেন?'

—'ফুয়াদকে ধোঁকা দেবার জন্যে। আমি তাকে জানতে দিতে চাই না যে এই চুরির

আসল কারণ মিশরের ইতিহাস। আমার ইচ্ছা সে মনে করুক, তার কেবিনে এসেছিল কোনও সাধারণ চোর, দামি জিনিসের লোভে নিয়ে গিয়েছে সুটকেসটা।'

—কিন্তু তোমার ঘরে যদি খানাতল্লাশ হয়?'

—'সুটকেস পাওয়া যাবে না।'

—'কেন?'

—'সমস্ত বামাল সমেত সুটকেসটা নিক্ষেপ করেছি ভারতসাগরের অতল গর্ভে।'

—'সে কী। মিশরের ইতিহাসখানাও—'

—'না। কেবল সেইখানাই আমার কাছে আছে। এখন শোনো মানিক! আপাতত ও বইখানা আমি তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখতে চাই।'

—'কেন বলো দেখি?'

—'আমার বোধ হচ্ছে ফুয়াদ আমাকেই সন্দেহ করেছে।'

—'কীসে বুঝলে?'

—'সে আমার আড়ি পাতবার ছিদ্রপথটি আবিষ্কার করে ফেলেছে।'

—'কবে?'

—'আজই। দুপুরবেলায় চুপ করে শুয়ে উপর-পানে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আমার মুখের উপরে কী-একটা ছোট জিনিস এসে পড়ল। ভালো করে চেয়ে দেখি, পার্টিশানে যেখানে আমার ছিদ্রপথটি ছিল, তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একটা সরু লোহার শলাকা। ব্যাপারটা তখনই বুঝলুম। সন্দিগ্ধ ফুয়াদ আজ ওই 'পার্টিশান'টা তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করতে করতে ছিদ্রটি দেখতে পেয়েছে। তারপর আরও ভালো করে দেখবার জন্যে ছ্যাঁদার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটি শলাকা আর অমনি খসে পড়েছে আমার মোমের ছিপি। ফুয়াদ যে তখন ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে আমার ঘরে দৃষ্টি সঞ্চালন করছিল, এটুকু আন্দাজ করা শক্ত হল না। আমি ঘুমের ভান করে চোখ মুদে স্থির হয়ে শুয়ে রইলুম।'

মানিক বললে, 'ঘটনা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

—'উঠুক। তাই তো আমি চাই। কিন্তু এ অবস্থায় বইখানা আমার কাছে রাখা নিরাপদ হবে না। এই নাও, এখানা তুমিই রাখো। আর আমার বক্তব্য ভালো করে শোনো। পরশুদিন জাহাজ পৌঁছবে সুয়েজ নগরে। সেখান থেকে আমাদের ট্রেনে চেপে যেতে হবে কাইরোর দিকে। যে-হোটেলে আমরা উঠব তার ঠিকানা মনে আছে তো? বেশ! তাহলে এটুকুও মনে রেখো আমরা কেউ কারুর সহযাত্রী হব না, সকলে আলাদা আলাদা যাব, কিন্তু বাসা বাঁধব একই হোটেল। জাহাজে এই আমাদের শেষ দেখা। এখন চলো।'

॥ পঞ্চম ॥

জয়ন্তের কাহিনি

প্রাচীন মিশরের ইতিহাস খুঁজতে গেলে সুদূর অতীতের গর্ভে গিয়ে বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে হয়। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার শৈশব ছিল যে কোন আদিম যুগে, ঐতিহাসিকেরা এখনও তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন না। প্রায় ছ-হাজার বৎসরের ওপারেও দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বিদ্যায়, জ্ঞানে ও সভ্যতায় তখনও মিশরের গৌরবের সীমা নেই।

আজ সেই মিশরের নামমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তার বাসিন্দারা আধুনিক পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এমনকি তাদের দু-চার জন বংশধরদের পর্যন্ত রেখে যায়নি ইহলোকে।

কিন্তু তারা পৃথিবীতে রেখে গিয়েছে নিজেদের হাতের যেসব বিচিত্র চিহ্ন, এই গর্বিত বৈজ্ঞানিকযুগের মানুষরাও তা দর্শন করে বিস্মিত না হয়ে পারে না। এখনও বেঁচে আছে তাদের স্থাপত্য, তাদের ভাস্কর্য, এমনকি তাদের চিত্রকলাও। এইসবের ভিতর থেকেই আজও পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরের সভ্যতার, সমাজের, ধর্মের ও দৈনন্দিন জীবযাত্রার যা-কিছু তথ্য। তাদের সাহিত্যও বেঁচে আছে তাদের নশ্বর দেহগুলোও।

নশ্বর দেহ বেঁচে আছে—কথাটা শুনতে যেন অদ্ভুত লাগে। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, প্রাচীন মিশরের বাসিন্দারা মানুষের মৃতদেহগুলোকে কোনও এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এমনভাবে অটুট অবস্থায় রক্ষা করত যে, হাজার হাজার বৎসর পরে আজও সেগুলো অবিকৃত হয়েই আছে। একালের প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন মিশরের নানা সমাধি-গৃহ ও প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে সেকালকার অসংখ্য রাজা-মহারাজা, আমির-ওমরাও ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে বহু সাধারণ গৃহস্থেরও সুরক্ষিত দেহ পুনরাবিষ্কার করে তখনকার অনেক অজানা কথা জানতে পেরেছেন।

প্রাচীন মিশরিদের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরে আত্মা আবার সমাধিগৃহে এসে মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ কবর দেওয়া মড়া আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে। জ্যান্ত হলেই মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয়, অতএব সমাধির ভিতরে রেখে দেওয়া হত নানান রকম খাবার। জীবন্তরা চায় সঙ্গী, অতএব বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা ও আমির-ওমরাওদের সঙ্গে কবরস্থ করা হত তাঁদের দাসদাসীদেরও। এমনকি সেইসব সজীব মৃতদেহ পৃথিবীতে বাস করবার সময় যেসব পোশাক-পরিচ্ছদ, বহুমূল্য অলংকার ও আসবাবপত্তর ব্যবহার করত, সেগুলিকেও 'মমি'র অর্থাৎ সুরক্ষিত শবের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হত। তার উপরে অনেক সমাধির ভিতরে রক্ষা করা হত কল্পনায় গড়া দাসদাসীর মূর্তি। তাদের বুকের উপরে লিখে দেওয়া হত এক-রকম মন্ত্র, যার প্রভাবে সেই মূর্তিগুলো নাকি জীবন্ত হয়ে সমাধিস্থ গৃহকর্তার আদেশ পালন করত ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও কইত।

প্রাচীন মিশরের এইসব বিশ্বাসকে আজ তোমরা অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে করতে পারো, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসই হোক আর যাই হোক, ওর জন্যে বর্তমান সভ্যতা বিশেষরূপে উপকৃত

হয়েছে। কারণ ওই সমাধিগৃহগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, মিশরের অতীতকালের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য।

মিশরের বড়ো, মাঝারি ও ছোটো অনেক 'পিরামিড' পাওয়া যায়, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে এক-একজন নরপতির সমাধি। তা ছাড়া মিশরের আরও নানাস্থানে নানা পদ্ধতিতে অসংখ্য মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হয়েছে, এখানে সবিস্তারে সমস্ত বলবার জায়গাও নেই, দরকারও নেই।

এখন কাইরো হচ্ছে মিশরের রাজধানী, কিন্তু প্রাচীন মিশরের তুলনায় তাকে শিশু বললেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে, মুসলমান রাজত্বের সময়ে। বলা বাহুল্য এখন যারা কাইরোর পথে পথে ভ্রমণ করে, তাদের মধ্যে মিশরের আদিমবাসিন্দাদের বংশধর নেই একজনও। ইউরোপীয় প্রভাবে আসবার আগে কাইরোর মধ্যে ছিল প্রাচ্য-মধ্যযুগের যেটুকু স্বরূপ, ক্রমে ক্রমে তাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। জায়গায় জায়গায় কাইরোকে দেখলে সন্দেহ হয় সে বুঝি কোনও ইউরোপীয় নগরী। কিন্তু কাইরোকে সম্পূর্ণরূপে চোখে পড়বে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, রুশ ও আমেরিকান প্রভৃতির সঙ্গে চৈনিক, জাপানি, পারসি, তুর্কি ও ভারতবাসী এবং আরব থেকে শুরু করে আফ্রিকার সমস্ত জাতিকে। কাইরো যেন বিশ্ব-মানবের সম্মিলনক্ষেত্র! বিশেষ করে সেখানে এসে একসঙ্গে মিলেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

কাইরোয় দেখবার জিনিস আছে অনেক। তার বিশাল মসজিদগুলির সৌন্দর্য কিনেছে পৃথিবী বিখ্যাত নাম। তা ছাড়া এখানকার কোনও কোনও গির্জা, আরবীয় জাদুঘর, সুলতানিয়া পুস্তকালয় এবং কালিফদের সমাধিগৃহ প্রভৃতি দেখবার জন্যেও অনেক যাত্রীর আগমন হয়। এদের ভালো করে দেখবার বা এদের কথা ভালো করে বলবার সময় আমাদের নেই, সুতরাং আবার আমাদের গল্পের সূত্র ধরবার চেষ্টা করব।

প্রসিদ্ধ 'এসবেকিয়া'-উদ্যানের চারিধারে আছে বিদেশি লোকদের বসবাস এবং একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো-গুছানো বড়ো বড়ো সব হোটেল। এরই মধ্যে বিশেষ এক হোটেলে এসে উঠেছে আমাদের মানিক ও হরিহর।

হোটেলের একটি ঘরে বসে তারা জয়ন্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সেদিন গেল, তার পরদিনও কেটে গেল, তবু দেখা নেই জয়ন্তের।

মানিক রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠল। চিন্তিতভাবে বললে, 'হরিহরবাবু, জয়ন্ত কখনও কথার খেলাপ করে না। কালই তার এসে পড়বার কথা, কিন্তু আজও তার দেখা নেই। ব্যাপারটা ভালো বলে মনে হচ্ছে না।'

হরিহর এই সুদূর বিদেশে এসে পর্যন্ত মন-মরা হয়েছিল, মানিকের কথা শুনে আরও বেশি দমে গিয়ে বললে, 'দুর্গা শ্রীহরি। আমার ভয় করছে, এখনই আমার দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে!'

মানিক বললে, 'আপনার ভয় আর ইচ্ছাকে দমন করুন। জয়ন্তকে না পেলে আমি দেশে ফেরবার নাম মুখেও আনব না।'

হরিহর ক্ষীণ স্বরে বললে, 'বিপদে পড়লেও?'

মানিক দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, বিপদে পড়লেও। জয়ন্তের জন্যে আমাদের যে-কোনও বিপদকেও বরণ করতে হবে।'

হরিহরের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে ইজিচেয়ারে হেলে পড়ে দুই চোখ মুদে ফেললে। সে হচ্ছে সাদাসিধে গৃহকোণপ্রিয় একান্ত ভালোমানুষ, বিপদবরণ, অ্যাডভেঞ্চার, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ব্যাপারের কোনও ধারই ধারত না। কাজেই মানিকের কথা শুনে তার নাড়ি প্রায় ছাড়ি ছাড়ি করতে লাগল।

কিন্তু পরদিনেই পাওয়া গেল জয়ন্তের দেখা। তার মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা, চিবুকেও একটা কাটা দাগ।

মানিক উৎকণ্ঠা-ভরা স্বরে বললে, 'এ কী জয়, তুমি কি আহত হয়েছ? পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

জয়ন্ত ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'আগে এক পেয়ালা খুব-গরম চা, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর।'

মানিক তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চা আনবার হুকুম দিয়ে আবার ফিরে এল।

হরিহর ফ্যালফ্যাল চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল বোবার মতো।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ মানিক, একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছে। আর এ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে কে জানো?'

—'কে?'

—'গোড়া থেকেই শোনো। সুয়েজে তো নামলুম। স্থির করলুম একটা দিন সেখানকার কোনও হোটেলে কাটিয়ে তারপর ধরব ট্রেন। একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে ড্রাইভারকে বললুম, সোজা কোনও ভালো হোটেলে নিয়ে চলো।'

'গাড়ি ছুটল। এ-পথ সে-পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা এমন এক নিরালা জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে পথের ধারে ছিল ছোটো একটি মাঠ, আর মাঠের পাশে ছিল একখানা মাত্র বাড়ি—কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর দেখা নেই।

'গাড়িখানা সেইখানে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী?' ড্রাইভার বললে, 'গাড়ির কল কোথায় বিগড়ে গিয়েছে। একবার পরীক্ষা করতে হবে।'

'ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে আমার পিছন দিকে এল। পরমুহূর্তে আমার মাথার উপরে অনুভব করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেললুম সমস্ত চেতনা।

'জ্ঞান হবার পর দেখলুম, একটা ঘরের কার্পেট-মোড়া মেঝের উপরে আমি শুয়ে আছি, আর আমাকে ঘিরে বসে আছে চারজন লোক। তাদের মধ্যে একজনকে দেখেই চিনলুম। সে হচ্ছে ফুয়াদ পাসা। সে বললে, 'এই যে, বাছার জ্ঞান হয়েছে দেখছি। কে তুই?'

—'জনৈক মানুষ।'

—'হুঁ, সেটা না বললেও চলবে। কিন্তু তোর আসল পরিচয় কী? তুই ছদ্মবেশ পরেছিস কেন?'

—'ছদ্মবেশ।'

—'আর ন্যাকামো করতে হবে না। তোর সমস্ত জিনিসপত্তর, কাগজপত্র আর জামা-

কাপড় আমরা উলটেপালটে দেখেছি। বেশ বুঝেছি যে তুই মুসলমান নোস, তুই হিন্দু। তোর এই ছদ্মবেশ ধারণের কারণ কী?'

—'শখ। আমি বরাবর বাস করে আসছি পেশোয়ারে। পাঠানের পোশাক পরতে আমি ভালোবাসি।'

—'বেশ, তোর কথা না হয় সত্য বলেই ধরলুম। কিন্তু জাহাজে তুই আমার কেবিনে উঁকি মারবার জন্যে দেয়ালে ছ্যাঁদা করেছিলি কেন?'

—'ছ্যাদা। ছ্যাঁদা কী?'

—'ফের ন্যাকামো!' বলেই ফুয়াদ আমার মুখের উপরে তার হাতের বেতের ছড়ি দিয়ে সজোরে এক আঘাত করলে। তারপর আবার বললে, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল্‌-কে তুই? আমার কামরায় উঁকি মারবার জন্যে এত আগ্রহ তোর কেন?'

—'আমি ছ্যাঁদার কথা কিছুই জানি না। তোমার কামরায় উঁকিও মারিনি।'

'ভীষণ ক্রোধে ফুয়াদের মুখের ভাব হয়ে উঠল ভয়াবহ। তখন তাকে দেখাচ্ছিল সাক্ষাৎ শয়তানের মতো—তার তখনকার চেহারা দেখলেই আমাদের হরিহরবাবু বোধহয় তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। রাগে ফুলতে ফুলতে ফুয়াদ চিৎকার করে বললে, 'এখনও যদি চালাকি করিস, তাহলে তোকে গলা টিপে কুকুরের মতো মেরে ফেলব! বল আমার সুটকেস কোথায় আছে?'

'আমি শান্তভাবেই বিস্ময়ের ভান করে বললুম, তোমার সুটকেস?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সুটকেস! আমার কেবিন থেকে তুই যা চুরি করেছিস।'

—'তোমার সুটকেস আমি যদি চুরি করতুম, তাহলে সেটা তো আমার সঙ্গেই থাকত!'

'দাঁতে দাঁত ঘষে ফুয়াদ বললে, 'না, সুটকেসটা তোর সঙ্গে নেই। নিশ্চয়ই তুই সেটা সরিয়ে ফেলেছিস! নিশ্চয়ই তোর কোনও সহকারী আছে!'

'মানিক, তুমি আমার গায়ের জোর জানো। ফুয়াদকে দেখলেই বিপুল ক্ষমতাশালী বলে মনে হয়, কিন্তু বাহির থেকে দেখে আমার শক্তির কথা কেউ ধারণায় আনতে পারে না! সাধারণত আমার শক্তি থাকে মাংসপেশির মধ্যে ঘুমন্ত। ফুয়াদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এতক্ষণ আমার সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাবার সুযোগ খুঁজছিলুম, কারণ সৌভাগ্যক্রমে শত্রুরা আমার হাত-পা বাঁধবার চেষ্টা করেনি। নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে তারা হয়তো ভেবেছিল, একলা আমি তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না। তাদের এই ভ্রম সংশোধন করবার জন্যে হঠাৎ আমি আমার মুষ্টিযুদ্ধে দুরন্ত হাত বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে ফুয়াদের চিবুকের উপরে সজোরে মারলুম এক ঘুসি। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই দিকে দুই পা ছড়িয়ে ছুড়লুম দুই লাথি। তারপরেই তড়াক করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, ফুয়াদ আর তার দুই সঙ্গী ঘরের মেঝের উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং বাকি লোকটা বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। তার হতভম্ব ভাবটা কাটবার আগেই আমার আর এক পদাঘাতে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে-ও ঠিকরে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই বেগে আমি ঘরের বাইরে ছুটে গেলুম এবং বাহির থেকেই দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে দিলুম।

'রাস্তায় গিয়ে পড়তে দেরি লাগল না। সেখানে গিয়ে দেখি, চালকহীন ট্যাক্সিখানা তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে গাড়ির উপরে উঠে চালকের আসন দখল করে বসলুম, তারপর গাড়িখানাকে দিলুম ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে চালিয়ে।

'কোনওরকমে খুঁজে বার করলুম একটা হোটেল। তখনও আমার মাথা ও মুখ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। হোটেলের অধ্যক্ষ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে সংক্ষেপে আমি বুঝিয়ে দিলুম যে, গুন্ডাদের হাতে পড়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। হোটেলের কর্তা লোক ভালো। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে এনে আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করালে। তারপর একটা দিন বাধ্য হয়ে আমাকে সেই হোটেলেই বাস করতে হল। এই হচ্ছে আমার দুর্ঘটনার ইতিহাস।'

হরিহর সমস্ত শুনে চোখ পাকিয়ে বললে, 'ওরে বাবা। কী ভয়ংকর ব্যাপার।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'এই তো সবে কলির সন্ধে হরিহরবাবু। এই তো সবে ভয়ানক ব্যাপারের আরম্ভ!'

হরিহরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সচকিতকণ্ঠে সে বললে, 'এই সবে আরম্ভ? তাহলে এর পরেও এমন সব ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

—'আছে বই কি। রক্তের ঢেউ বইতে পারে, আমাদের কারুর কারুর মুণ্ড উড়ে যেতে পারে, এমনকি—'

হরিহর বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আর আমি শুনতে চাই না মশাই, আমি এইখান থেকেই আবার কলকাতায় পালাতে চাই।'

—'কিন্তু এখন আমরা পালালেও শত্রুরা আর আমাদের পিছু ছাড়বে না।'

—'ইস। ছাড়বে না বই কি! না ছাড়বার কারণটা শুনি?'

—'কারণ মিশরের ইতিহাসখানা আমাদের কাছেই আছে।'

—'ছুড়ে ফেলে দিন মিশরের ইতিহাস! মিশরের ইতিহাস মিশরেই পড়ে থাকুক। মরে ভূত হয়ে আমি কুবের-ভাণ্ডারে গিয়ে ঢুকতে চাই না! চলুন, আমরা লম্বা দিই।'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে হরিহরের কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললে, 'কোনও ভয় নেই হরিহরবাবু, কোনও ভয় নেই। আপনার পায়ে যাতে কাঁটাটি না ফোটে আমি প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব।'

উত্তরে হরিহর কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল না যে সে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয়েছে।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়ন্ত, সুয়েজে থাকতে থাকতে তুমি ফুয়াদের আর কোনও খোঁজ নাওনি?'

জয়ন্ত বললে, 'তা নিয়েছি বই কি। থানায় গিয়ে ট্যাক্সিখানা পুলিশের জিম্মায় রেখে আমি সব-কথা খুলে বলেছিলুম। পুলিশ আমাকে সঙ্গে করে আবার ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকে আমরা ফুয়াদ বা তাঁর সঙ্গীদের সন্ধানই পাইনি। শুনলুম সে বাড়িখানা নাকি অনেকদিন ধরেই খালি পড়ে আছে। ফুয়াদকে পেলুম না বটে, তবে আমার মুখে ফুয়াদের চেহারার বর্ণনা শুনে পুলিশ বললে, কাইরোর এক পলাতক নামজাদা খুনি-ডাকাতের সঙ্গে তার চেহারার বর্ণনা নাকি হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

॥ ষষ্ঠ ॥

জয়ন্তের নস্যদানি

সেই রাত্রি। আকাশে ছিল চাঁদ, আর ছিল স্বপ্নময় জ্যোৎস্না, আর ছিল তারাদের দীপ্ত ইঙ্গিত।

শহরের কোলাহল ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশুতি রাতও যেন আলস্যে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গান গাইছে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম। মাঝে মাঝে বাতাসের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সে যেন বহন করে আনছে অদূরবর্তী মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস।

হরিহরের ঘুম আসছিল না, নানান দুশ্চিন্তার ধাক্কায় তার ঘুম গেছে পালিয়ে। সে অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় পড়ে পড়ে জয়ন্ত ও মানিকের নাসিকা-নিনাদ শ্রবণ করলে; আশ্চর্য হয়ে ওরা মনে মনে ভাবলে, এত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও কেমন করে ঘুমোতে পারে? তারপর খোলা হাওয়ায় নিজের মাথাটা একটু ঠান্ডা করে নেবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খুব-উঁচু হোটেলের জানলা। সেখান থেকে দেখলে মনে হয় সমস্ত কাইরো শহরটা যেন চোখের সামনে পড়ে রয়েছে! চাঁদের চিকণ রুপোলি ধারায় ধোয়া সে যেন এক অপূর্ব দৃশ্যপট।

কলকাতার মতন এখানেও রয়েছে বাড়ির পর বাড়ির ভিড়—খানিক আলো খানিক কালো-মাখা। কিন্তু এখানে আছে আর-এক নতুনত্ব। এখানে যেদিকেই তাকানো যায় চোখে পড়ে গম্বুজের পর গম্বুজ ধরতে যেন চায় আকাশকে! তারও উপরে রয়েছে সুশ্রী সূক্ষ্মগঠন কত-যে মিনার তার আর সংখ্যা হয় না, তারা সবাই মিলে যেন বিপুল শূন্যের বক্ষ ভেদ করতে চায়!

হরিহর একমনে এই দৃশ্য দেখছে, হঠাৎ হল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! ঘরের ভিতরকার অন্ধকারই যেন মূর্তিমান হয়ে দু-খানা কালো কালো বাহু বাড়িয়ে বজ্রমুষ্টিতে হরিহরের গলা টিপে ধরলে! দারুণ আতঙ্কে চোখ কপালে তুলে সে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেরি করলে না।

একটু একটু করে আবার তার জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমে ভাবলে, সে একটা বিশ্রী স্বপ্নের পাল্লায় পড়েছিল। তারপরেই বুঝতে পারলে তার হাত-পা-মুখ বাঁধা। একটু নড়বার বা টুঁ শব্দ করবার উপায় নেই।

জয়ন্ত ও মানিকের নাসিকা তখনও নীরব হয়নি।

হরিহর একসঙ্গে বাঁধা পা দুটো কোনওরকমে তুলে ও নামিয়ে ঘরের মেঝের উপরে শব্দের সৃষ্টি করলে—সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁধা মুখ দিয়েও বেরুতে লাগল একটিমাত্র ধ্বনি—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ.....

একে একে স্তব্ধ হল দুই নাসিকাই। তারপরেই জ্বলল বৈদ্যুতিক আলো।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'একী ব্যাপার হরিহরবাবু?'

—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি হরিহরকে বন্ধনমুক্ত করলে। সে উঠে বসেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে।

জয়ন্ত বললে, 'কে আপনার এ-দশা করলে?'

হরিহর প্রথমটা কথাই কয়না। তারপর বললে, 'আমি কিছু জানি না—জানতেও চাই না, আমি কেবল এই সর্বনেশে দেশ ছেড়ে পালাতে চাই।'

মানিকের মনে জাগল একটা সন্দেহ। সে তাড়াতাড়ি নিজের সুটকেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার ডালাটা টানতেই খুলে গেল, এবং সুটকেসের ভিতরে হাত চালিয়েই মানিক বলে উঠল 'সর্বনাশ।'

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'মিশরের ইতিহাসখানা চুরি গেছে তো?'

—'হাঁ, জয়ন্ত।'

—'বাঁচা গেছে।'

—'তুমি কী বলছ হে?'

হরিহর বললে, 'জয়ন্তবাবু ঠিক কথাই বলছেন। আমিও বলি আপদ গেছে, বাঁচা গেছে!'

মানিক বললে, 'তাহলে আমরা এতদূরে ছুটে এলুম কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'কুবের-ভাণ্ডারের দরজা খুলব বলে।'

—'কিন্তু তার চাবি আছে তো মিশরের ওই ইতিহাসখানার মধ্যেই!'

—'না, আমার কাছে।'

—'তোমার কথার অর্থ?'

—'মিশরের ইতিহাস এখন অন্তঃসারশূন্য, তার আসল গুপ্তকথা এখন আমার দখলে। ফুয়াদ শাঁসহীন খোলা নিয়ে সরে পড়েছে।'

—'সত্যি কথা বলছ?'

—'এই দ্যাখো!'

—'ওটা তো তোমার রুপোর নস্যদানি!'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে নস্যদানিটা উপুড় করে সমস্ত নস্য ফেলে দিলে। তারপর তার ভিতর থেকে টেনে বার করলে একখানা কাগজ।

মানিক বললে, 'কী ওখানা?'

—'এই কাগজে লেখা আছে সংক্ষেপে কতগুলি মূল্যবান উপদেশ, আর আঁকা আছে একটি গিরিগুহার নকশা।'

—'সুয়েজে তুমি যখন ফুয়াদের হাতে পড়েছিলে, সে তখন ও-কাগজখানা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি?'

—'তার মাথায় ঘুরছিল তখন মিশরের ইতিহাসের কথা। সেই বইখানার সার পদার্থ যে তুচ্ছ একটা নস্যদানির নস্যির গুঁড়োর তলায় লুকোনো থাকবে, এটা সে আন্দাজ করবে কেমন করে? কিন্তু জাহাজেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম তার অভিপ্রায়, সেইজন্যেই বইখানা তোমার হাতে সমর্পণ করেছিলুম।'

হরিহর বললে, 'ওই কাগজখানা কোথায় ছিল জয়ন্তবাবু?'

—'মিশরের ইতিহাসের মধ্যে।'

হরিহর প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলিত করে বললে, 'অসম্ভব। হতেই পারে না। দুই বছর ধরে কতবার আমি ওই বইখানার পাতাগুলো আগাগোড়া উলটে গিয়েছি। কিন্তু তার মধ্যে একটুকরো ছেঁড়া কাগজও দেখতে পাইনি। না, না জয়ন্তবাবু, আপনি বড়োই বাজে কথা বলছেন!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মাথায় বুদ্ধি যাদের কম, দুনিয়ায় তারা বাজে ছাড়া কাজের কিছুই আবিষ্কার করতে পারে না। তাহলে শুনুন হরিহরবাবু, আপনার মুখের কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে বইখানার ছাপানো কোনও পাতার ভিতরই আসল রহস্যের সন্ধান নেই। কারণ যে-বই সর্বসাধারণের পাঠ্য, তার মধ্যে অতবড়ো একটা রহস্য কেমন করে লুকানো থাকবে? তাই বইখানা হাতে পেয়েই সর্বপ্রথমে আমি পরীক্ষা করলুম তার অমুদ্রিত অংশ—অর্থাৎ তার মলাট ও 'fly leaf' প্রভৃতি। আমার পরীক্ষা ব্যর্থ হল না। দেখলুম, বইখানার গোড়ার ও শেষের দু-খানা 'fly leaf'ই অতিরিক্ত মোটা। শেষের দিকের 'fly leaf' খানি খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একখানি রঙিন 'fly leaf'-এর উপর আর একখানি রঙিন 'fly leaf' গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে। টানতেই তা দু-খানা হয়ে খুলে গেল, আর তার ভিতর থেকে পেলুম আপনার বাবার হাতে লেখা এই কাগজখানি। এখানি বার করে নিয়ে দু-খানা 'fly leaf' আঠা দিয়ে আবার আমি আগের মতোই জুড়ে রাখলুম, তারপরে আমার উপর থেকে শনির দৃষ্টিকে সরাবার জন্যে বইখানি সমর্পণ করলুম মানিকের হাতে। এখন বুঝছেন তো, আমি অন্যায় সাবধানতা অবলম্বন করিনি? কেমন করে বলতে পারি না, ফুয়াদ আপানার পিতার গুপ্তকথা কতক কতক জানতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই সে সবটা জনাতে পারেনি, কারণ তাহলে বইখানি হাতে পেয়ে এই কাগজখানিকেও সে হস্তগত করতে পারত।'

হরিহর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে জয়ন্তের মুখের পানে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে যেন আপন মনেই বললে, 'সত্যিই আমি গাধা। এত চেষ্টা করেও আসল সত্যটা আমি ধরতে পারিনি! আমাকে গোরু বললেও ভুল হবে না। আমি বাঁদর, আমি হনুমান—'

জয়ন্ত বললে, 'থাক হরিহরবাবু, থাক। নিজেকে আলিপুর চিড়িয়াখানার বাসিন্দা মনে করে এতটা আত্মলাঞ্ছনা করা ভালো নয়। খালি আপনি কেন, অতি চালাক ফুয়াদও আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি।'

মানিক বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, তুমি দেখেছ তো, ওই বইখানার ম্যাপের উপরে লাল কালি দিয়ে রেখা টানা আছে? ছাপানো রেখা নয়, মানুষের হাতে টানা। ও-রেখার কোনওই অর্থ নেই?'

—'আছে বই কি। রেখা টেনেছিলেন বোধহয় হরিহরবাবুর পিতৃদেবই। ওই রেখার দ্বারা তিনি পথনির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।'

—'পথনির্দেশ? কোথাকার পথ?'

—'কুবের-ভাণ্ডার যে-গুহায় আছে, সেইখানে যাবার পথ। রেখা যেখানে শেষ হয়েছে,

ঠিক সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেই আমরা কুবের-ভাণ্ডারের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।'

হরিহর চমকে উঠে বললে, 'তবেই তো! সে-বইখানা এখন ফুয়াদের হাতে। আমরা কেমন করে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হব? আমাদের আগেই তো ফুয়াদ সেইখানে গিয়ে হানা দেবে।'

—'হানা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। এই কাগজখানা সঙ্গে না থাকলে রত্ন-ভাণ্ডার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার শক্তি আর কারুরই হবে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু সেই ম্যাপখানি সঙ্গে না থাকলে আমরা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছব কেমন করে?'

জয়ন্ত সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'মানিক, তুমি কি আমাকেও আলিপুর চিড়িয়াখানার অন্তর্গত করতে চাও? না বন্ধু, না, ঘাটে নৌকো ডোবাব তেমন ছেলে আমি নই। সেই মানচিত্রের হুবহু প্রতিলিপি বইখানার মধ্যে পাওয়া এই কাগজেরই অন্য পৃষ্ঠায় তুলে রেখেছি। এরপরেও তোমাদের আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

মানিক বললে, 'জিজ্ঞাস্য নেই, বক্তব্য আছে। আমি উচ্চকণ্ঠে বলতে চাই—জয়, জয়ন্তের জয়!'

হরিহরও এতক্ষণ পরে একমুখ হেসে বললে, 'মানিকবাবুর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—জয়, জয়ন্তবাবুর জয়!'

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'না মানিক, না হরিহরবাবু, এখনও জয়ধ্বনি করবার সময় হয়নি। এখনও আসল কর্তব্যই অসমাপ্ত। রত্নভাণ্ডারের রত্ন এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে কি না, সে-কথা জোর করে বলা যায় না।'

হরিহর আবার মুষড়ে পড়ে বললে, 'এই রে, তবেই সেরেছে! জয়ন্তবাবুর কথা শুনে আমার মন আবার স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যাচ্ছে।'

জয়ন্ত বললে, 'এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়বার দরকার নেই হরিহরবাবু! আপনার বাবার লেখা কাগজখানির ভিতর থেকে যেটুকু আভাস পেয়েছি, তাতেই বুঝেছি, আমরা কোনও সাধারণ গুপ্তধনের ভাণ্ডার লুঠ করতে যাচ্ছি না। মিশরের ইতিহাসে 'রামেসেস' নামধারী এগারো জন ক্ষমতাশালী নরপতির বিবরণ পাওয়া যায়। কুবের-ভাণ্ডার বললে আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যাত্রা করব, ওদেরই মধ্যে কোনও-এক 'রামেসেসে'র সমাধিগৃহের সন্ধানে। মিশরের প্রাচীন রাজাদের সমাধিগৃহের মধ্যে বহু মূল্যবান জিনিস রেখে দেওয়া হত। এখানে গিয়েও আমরা দেখতে পাব নিশ্চয় সেই-রকমই সব জিনিস। প্রত্নতত্ত্ববিদরা কয়েকজন 'রামেসেসে'র আশ্চর্য সমাধিমন্দির আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু এ সমাধিটি এখনও তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। দেখা যাক, হরিহরবাবুর পিতৃদেবের প্রসাদে সেকালের 'রামেসেসে'র সম্পত্তি একালের আমাদের হাতে এসে পড়ে কি না।'

হরিহর জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে কবে আমরা যাত্রা করব?'

জয়ন্ত বললে, 'শুভ কাজে দেরি করতে নেই। আমরা প্রস্তুত। রাত্রি প্রভাত হলেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। আপনি কী বলেন?'

গুপ্তধনের এমনই মোহ যে, এরই মধ্যে হরিহর নিজের বিপদের কথা একেবারে ভুলে গেল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে ঘরময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগল রবারের বলের মতন।

তারপর জয়ন্তের কাছে এসে বললে, 'আমার মর্ত জানতে চাইছেন? বলেন তো আমি এখুনি যেতে রাজি।'

—'বলেন কী? এই অন্ধকারে?'

যোদ্ধার মতন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে হরিহর বললে, 'আর অন্ধকার-টন্ধকার আমি মানি না—আমার চোখে এসেছে ধ্রুবতারার জ্যোতি। রেসের ঘোড়ার মতন আমার পা-দুটো এখন দৌড় মারবার জন্যে নিসপিস করছে।'

হরিহরের রকমসকম দেখে মানিক হেসে ফেলে বললে, 'সাবধান! অতটা শশব্যস্ত হবেন না হরিহরবাবু! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন তো দৌড়তে চাইছেন, কিন্তু পথ আগলে যদি দাঁড়িয়ে থাকে ফুয়াদ-বাবাজি?'

ফুটো বেলুনের মতন হরিহরের দেহ গেল চুপসে। শিউরে উঠে সে বললে, 'যাত্রারম্ভেই অযাত্রার নাম করবেন না মানিকবাবু! ও-নামটা শুনলেই আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার ইচ্ছে হয়।'

॥ সপ্তম ॥

পাতালবাসী অন্ধকারের কোলে

মিশরিরা তাদের নীলাকাশকে বড়ো ভালোবাসে। মিশরের আকাশে নীলিমা যেমন গাঢ়, তেমনি উজ্জ্বল। সেখানকার আলোর ভিতর দিয়েও ঝরে পড়ছে যেন নীলিমার স্নেহ! আর তার মাটিকে স্নিগ্ধ করে বয়ে যাচ্ছে নীল নদ চারিধারে কলতান ছড়াতে ছড়াতে।

এই নীল নদের দুই তীরেই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে প্রাচীন মিশরের অগাধ ঐশ্বর্যের স্মৃতি। নীল নদের পূর্ব-তটে চার শতাব্দী ধরে বিরাজ করত মিশরের বিখ্যাত রাজধানী 'থেবেস' শহর, আজ যা লুপ্ত হয়েছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে। তার এক শত সিংহদ্বারের একটিকেও আর দেখা যায় না। এখন সেখানে দুটি পল্লিগ্রাম আছে—'কার্নাক' ও 'লুক্সর'। এখানে বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে বিরাজ করছে আমেনদেব ও তাঁর সঙ্গী দেবতাদের মন্দিরের পর মন্দির, তাদের প্রত্যেকটিই আজও আকর্ষণ করছে বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি।

কিন্তু নীল নদের পূর্ব-তটে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় কেবল মৃত্যুর রাজত্ব। অর্থাৎ এদিকটায় ছিল প্রাচীন মিশরের সমাধিক্ষেত্র। সাধারণত সমাধিক্ষেত্র বলতে আমরা যা বুঝি, এ তেমনধারা জায়গা নয়। অসংখ্য সমাধি এবং এক-একটি সমাধি আবার প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড আর তাদের ভিতরে-বাইরে বড়ো বড়ো শিল্পীদের অদ্ভুত সব হাতের ছাপ। প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ গৌরবের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে এইসব সমাধির ধ্বংসাবশেষ ও গুপ্তগৃহের ভিতর থেকেই।

এখানকার ধ্বংসাবশেষের উপরে সুদীর্ঘ ছায়াপাত করে দাঁড়িয়ে আছে তরুলতাহীন রুক্ষ শৈলশ্রেণি। এবং তারই মধ্যে আছে মৃতদের উপত্যকা। তাকে 'রাজাদের শহর'ও বলা হয়,

কারণ তার মধ্যে প্রাচীন মিশরের রাজা এবং রাজবংশীয়দের সমাধিস্থ করা হত। মিশরের জাদুঘরে গেলে মিশরি রাজাদের যেসব 'মমি' বা সুরক্ষিত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই ওই মৃতদের উপত্যকা থেকেই তুলে আনা হয়েছে।

'ফেলুক্কা' নামে মিশরি-নৌকায় চেপে জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর এসে দাঁড়িয়েছে এই মৃতদের শহরে। সত্যই এ যেন এক আশ্চর্য স্মৃতির শ্মশান। মৃত্যুকে যারা আলিঙ্গন করেছে মানুষ এখানে চেষ্টা করেছে তাদেরও রক্ষা করতে,—পৃথিবীর আর কোথাও নেই এমন অদ্ভুত সমাধিক্ষেত্র। অভিভূত মনে তারা তিনজনে খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে বিচরণ করতে লাগল।

তারপর জয়ন্ত নিজের পকেট থেকে বার করলে সেই মানচিত্রখানি—যার উপরে কুবের-ভাণ্ডারের পথ নির্দেশ করা হয়েছে একবার মানচিত্রের উপরে ও আর-একবার এদিকে-ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'ওই দ্যাখো মানিক, মিশররাজ 'প্রথম সেটি'র মন্দির। এখন আমাদের যেতে হবে এরই উত্তর-পূর্ব দিকে।'

তারা অগ্রসর হতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই সমতল ক্ষেত্রের কতকগুলি সমাধি পেরিয়ে তারা এসে দাঁড়াল একটি পাহাড়ের তলদেশে। তারপর তারা পাহাড়ের উপর দিকে উঠতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'হরিহরবাবুর বাবা কাগজে লিখে রেখেছেন দেখছি—'পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে পাওয়া যাবে একটি ভেঙে-পড়া ছোটো গুহামন্দিরের মতন জায়গা। গুহার ভিতরে অন্ধকার ভেদে করে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দিকে এগুলেই একটি আট ফুট চওড়া গহ্বর। সেই গহ্বরের ভিতরে দিনের বেলাতেও নজর চলে না; তার গভীরতা হচ্ছে ষাট ফুট। দড়ি ঝুলিয়ে নির্ভয়ে কিন্তু অতি সাবধানে সেই গহ্বরের ভিতরে নেমে তলদেশে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। দেখা যাবে, পাতালের ভিতরে সেই গহ্বর তিনটি সংকীর্ণ পথে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ডান দিকের পথটি হচ্ছে সবচেয়ে সরু, তার ভিতরে দাঁড়িয়ে এগুনো যায় না, হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। প্রায় একশো ফুট পথ এইভাবে এগুলে পর আর-একটি বড়ো পথে পাওয়া যাবে একটি বিপজ্জনক কূপ। কূপটি চওড়ায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়, সুতরাং লাফ দিয়ে অনায়াসে পার হওয়া যায়। জানা না থাকলে গভীর অন্ধকারে এই কূপের ভিতরে পড়ে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা আছে। কূপ পার হয়ে আরও পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে একটি দ্বারহীন ঘরের সামনে এসে পথটি শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ঘরটিই হচ্ছে কুবের-ভাণ্ডার।' মানিক, এই তো আমরা একটি ভেঙে-পড়া গুহামন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এর ভিতরটাও মিলিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। আমাদের সকলকেই 'টর্চ' জ্বালাতে হবে।'

গুহার ভিতরটা দুর্গম হয়ে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ও রাবিসের দ্বারা। তারা তিনজনে পাথরগুলো টপকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল। 'টর্চে'র আলো ফেলে জয়ন্ত বললে, 'আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। ওই দ্যাখো সেই গহ্বর।'

তিনজনে গর্তটার ধারে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিরেট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হরিহর শিউরে উঠে বললে, 'বাপ্ রে, দড়ি ধরে এর মধ্যে নামা আমার কাজ নয়! দেখেই আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু ওই অন্ধকার ছিল বলেই কুবের-ভাণ্ডার আজও খালি হয়ে যায়নি।

এই অন্ধকার কৌতূহলী লোকদের চোখ দিয়েছে অন্ধ করে, এর মধ্যে সাহস করে কেউ ঢুকতে পারেনি। কিন্তু আমরা ঠিকই ঢুকব।'

হরিহর প্রবল মস্তক-আন্দোলন করে বললে, 'অসম্ভব। আমি কিছুতেই পারব না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না হরিহরবাবু, আপনার কোমরে দড়ি বেঁধে আগে আমরাই আপনাকে নীচে নামিয়ে দেব।'

হরিহর সভয়ে বললে, 'তার মানে একলা আমাকেই এই পাতালের ভেতরে তলিয়ে যেতে হবে? এর মধ্যে আছে ভীষণ গোরস্থান, আর আছে হাজার হাজার বছরের পুরনো শুকনো মড়া। মিশরীদের বিশ্বাস ছিল তাদের মড়ারা কবরে গিয়ে আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে। কে বলতে পারে, তাদের বিশ্বাস সত্য নয়? আমি হচ্ছি একালের মানুষ, সেকালের জ্যান্ত মড়ার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ আমার নেই।'

মানিক বললে, 'আচ্ছা হরিহরবাবু, আপনি অতবেশি ভাববেন না। আগে আমিই গর্তের ভিতরে গিয়ে নামছি, তারপর জয়ন্ত আপনাকে দড়ির সাহায্যে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।'

কিন্তু তবু হরিহরের সাহস জাগ্রত হল না। অনেক তর্কাতর্কির পরে জয়ন্ত ও মানিক তাকে কোনওরকমে রাজি করালে। একখানা প্রকাণ্ড পাথরের সঙ্গে দড়ির এক দিক ভালো করে বেঁধে জয়ন্ত সেটা গর্তের ভিতরে ঝুলিয়ে দিলে। মানিক অনায়াসেই দড়ি ধরে অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর হরিহরের পালা। জয়ন্ত তাকে একটি জীবন্ত মোটের মতো ঝুলিয়ে নামিয়ে দিলে গর্তের মধ্যে।

মানিক নীচ থেকে শুনতে পেলে, হরিহর নীচের দিকে আসছে ঘন ঘন আর্তনাদ করতে করতে। যথাস্থানে পৌঁছেই হরিহর অবশ হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। ক্ষীণ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমাতে আর আমি নেই মানিকবাবু! আমার দম বেরিয়ে গেছে, পাথুরে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আমার গতর চূর্ণ হয়ে গেছে!'

মানিক বললে, 'আপনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর আপনার ভয় কী? এখন বসে বসে একটু জিরিয়ে নিন।'

—'কিন্তু আমি কীসের ওপরে বসে আছি? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে!' হরিহর টপ করে 'টর্চ'টা জ্বেলেই 'ওরে বাপ রে!' বলে চেঁচিয়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল।

মানিক আগেই যা দেখবার দেখে নিয়েছিল। গহ্বরের তলায় মাটির উপরে পড়ে রয়েছে নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল।

মানিক বললে, 'এসব কঙ্কাল আর আপনাকে আক্রমণ করবে না হরিহরবাবু! বোঝা যাচ্ছে, আমাদেরও আগে অনেক হতভাগ্য যুগে যুগে এই গহ্বরের ভিতরে দৈবগতিকে বা অর্থলোভে আত্মদান করেছে।'

হরিহরের মুখ দিয়ে 'রা' বেরুল না, সে শুধু ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। পাতালের সেই গর্ত কী শীতল, কী স্তব্ধ! তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দগুলো যেন বহুদূর থেকে শোনা যায়। তাদের প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিচ্ছে অন্ধকারের মধ্য থেকে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি।

এতক্ষণে জয়ন্ত নীচে নেমে এসে দড়ির শেষপ্রান্ত ত্যাগ করে বললে, 'মানিক, গুহার আরও ভিতরে যাবার রাস্তাটা তুমি দেখতে পেয়েছ কি?'

মানিক একদিকে 'টর্চে'র আলো নিক্ষেপ করে বললে, 'পেয়েছি। ওই যে!'

রাস্তা তো ভারী! একটা তিন ফুট উঁচু গর্ত ছাড়া আর কিছু নয়। চওড়াতেও গর্তটা সাড়ে-তিন ফুটের বেশি হবে না।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, 'এসো, এইবারে আমাদের হামাগুড়ি দেবার পালা।'

মাথা দিয়ে টুঁ মেরে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকে ঠেলে সরাতে সরাতে আবার তারা অগ্রসর হল। গুহাতলের কঠিন পাষাণ মসৃণ ছিল না, তাদের হাঁটু ও হাত বারবার পাথরে ঘষে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অজানাকে জানবার বিপুল উত্তেজনায় জয়ন্ত ও মানিক সে-সব আঘাত আমলেই আনলে না, কিন্তু হরিহরের মুখে ক্রমাগতই করুণ আর্তস্বর। একবার সে 'সাপ, সাপ!' বলে ভীষণ চেঁচিয়ে লাফ মারলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই গুহার পাথুরে ছাদে মাথা ঠুকে হাউমাউ করে আবার উবু হয়ে বসে পড়ল।

মানিক চমকে ফিরে 'টর্চে'র আলোকে সত্য-সত্যই দেখলে, হিস হিস শব্দ করে কালো বিদ্যুতের মতন কী যেন একটা সাঁৎ করে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

হরিহর কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'সাপটা আমার পিঠের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। আমি আর বাঁচব না।'

সামনের দিক থেকে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর এল, 'চলে এসো মানিক এই বিশ্রী গর্তটা শেষ হয়ে গিয়েছে।'

মানিক ও হরিহর তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে আরও খানিকটা গিয়েই দেখলে, ছাদ আর তাদের মাথার কাছে নেই, পথের উপরে এখন সিধে হয়ে দাঁড়াবার ও হাত-পা ছড়াবার ফাঁক আছে।

মানিক আরামের নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আঃ বাঁচলুম।'

হরিহর বললে, 'বাঁচলুম না ছাই! আবার এই পথেই তো আমাদের ফিরতে হবে!'

সামনের দিক থেকে আবার জয়ন্তের কণ্ঠস্বর জাগল, 'সাবধান সাবধান! এখানে রয়েছে সেই পথ-জোড়া কূপটা। এ পথ খালি দুর্গম নয়, একটু অসাবধান হলেই এখানে ইহলোক ত্যাগ করবার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করা আছে! হরিহরবাবুর বাবা কূপের কথা লিখে রেখেছিলেন তাই রক্ষা, নইলে আমাকেও হয়তো অন্ধকারে এর মধ্যে ঝাঁপ খেতে হত।'

জয়ন্ত কূপের ধারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলে 'টর্চে'র আলোকশিখা। অনেক নীচে আলো পেয়ে কালো জল চকচক করে উঠল।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠে কূপের অন্য পাড় আলোকরেখার মধ্যে এনে বললে, 'মানিক, লক্ষ্য স্থির রেখে লাফ মারো। হরিহরবাবু, আপনিও মানিককে অনুসরণ করুন।'

হরিহর শুকনো-গলায় বললে, 'আমার হাত-পা বিষম কাঁপছে। যদি ঝপাং করে জলে পড়ে যাই?'

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে কী যে হবে, তা আপনিও জানেন আমরাও জানি। সুতরাং জলে না পড়ে ডাঙার উপরেই থাকবার চেষ্টা করুন।'

হরিহর মিনিট-দুয়েক একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সুদীর্ঘ একটা লম্ফ ত্যাগ

করে কূপের ওপারে গিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'জয় মা কালী! একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল!'

আবার তারা অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু আর তাদের বেশিদূর যেতে হল না। পথটা ক্রমেই সরু হয়ে এল এবং তারপরই হঠাৎ পরিসমাপ্ত হল একটা প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া গুহায়।

তিন-তিনটে তীব্র 'টর্চের' আলোক-কশাঘাতে গুহার অন্ধকার যেন যন্ত্রণায় ধড়ফড় করতে লাগল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিন-জোড়া চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল বিপুল বিস্ময়ে!

তিন-দিকের দেওয়ালের সামনে কোন অতীতের ঐশ্বর্যের ও শিল্পকলার শত শত নিদর্শন! কোথাও রয়েছে বহুবর্ণবিচিত্র দারুময় মূর্তি, কোথাও কারুকার্যের অতি-সুদর্শন শবাধার, কোথাও বা রয়েছে ধাতু বা আনা কিছু দিয়ে গড়া সিংহাসন, সাধারণ বসবার চেয়ার, নানা আকারের টেবিল প্রভৃতি, কত-রকম মূল্যবান ভৃঙ্গার আর ভাণ্ড ও পাত্রাদি—তাদের সংখ্যা আর গুনে ওঠা যায় না।

এক-জায়গায় পাওয়া গেল মস্তবড়ো একটি পেটিকা, পরীক্ষা করতেই বোঝা গেল তার আগাগোড়াই কারুকাজ-করা পুরু সোনার পাত দিয়ে মোড়া।

জয়ন্ত বললে, 'ওই যে শবাধারটি দেখছ, খুব সম্ভব ওরই মধ্যে আছে মহারাজা রামেসেসের সুরক্ষিত মৃতদেহ, আর এই যেসব জিনিস দেখছ, এগুলি রাখা হয়েছে ওঁরই ব্যবহারের জন্যে।'

মানিক আর-একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'ওখানে ওই যে একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, ওটিকে দেখলেও তো কোনও রাজা-রাজড়ারই প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়।'

মূর্তিটি প্রায় ছয় ফুট উঁচু। তার মাথায় মুকুট এবং হাতে রাজদণ্ড।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে বললে, 'মানিক, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? না, না—সন্দেহ নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এটি হচ্ছে সোনা দিয়ে গড়া প্রতিমূর্তি!'

মানিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতবড়ো সোনার মূর্তির কথা কখনও সে শ্রবণ করেনি!

হরিহর হঠাৎ মহা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। জয়ন্ত ও মানিক ফিরে দেখলে সে তখন পেটিকার ডালাটি খুলে ফেলে তার ভিতর দিকে আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে! তারাও সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে যা দেখলে তাতে নিজেদের চোখকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলে না।

সমস্ত পেটিকার গর্ভ জুড়ে আছে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার এবং স্বর্ণময় নানারকম দ্রব্য।

ঠিক এই সময়ে সুতীব্র, বিকট ও ভয়াবহ এক আর্ত চিৎকারে গুহার ভিতরটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনজনেই বিষম চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল। প্রথমটা কেউ বুঝতে পারলে না, এ বীভৎস চিৎকারের জন্ম কোথায়?

জয়ন্ত বললে, 'নিবিয়ে ফ্যালো—টর্চের আলো এখুনি নিবিয়ে ফ্যালো!'

তারপর আবার শোনা গেল সেই ভয়ানক চিৎকারের পর চিৎকার—কিন্তু এবার চিৎকারগুলো আসছে যেন আরও দূর থেকে। তারপর আর চিৎকার শোনা গেল না, গুহা আবার সমাধির মতোই স্তব্ধ।

হরিহর তখন ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে, তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। সে ফিসফিস করে বললে, 'এ হচ্ছে প্রাচীন মিশরের প্রেতাত্মার চিৎকার। তার গুহায় একেলে মানুষদের দেখে সে আর চুপ করে থাকতে পারছে না! হয়তো সে এখুনি আমাদের আক্রমণ করতে আসবে।'

জয়ন্ত বললে, 'চুপ! মানিক, রিভলবার বার করো। এইখানে বসে পড়ো। খুব হুঁসিয়ার! যতক্ষণ না আমি বলি, কেউ কোনও কথা কোয়ো না।'

যেমন নীরব এখানকার অন্ধকার ঠিক তেমনি নীরব হয়েই তারাও নিশ্চল মূর্তির মতন বসে রইল। মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল। তারপরেই শোনা গেল ধুপ ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ! একটা পায়ের নয়, কয়েকটা পায়ের শব্দ! সেই মৃত্যুর মতন নিঃসাড় গুহার ভিতরে নিশ্বাস ফেললেই তফাত থেকে শোনা যায়, পদধ্বনি সেখানে কেবল স্পষ্ট নয়, অপার্থিব বলেই মনে হতে লাগল।

পায়ের শব্দ ক্রমে কাছে—আরও কাছে এসে পড়ল, তারপর একেবারে থেমে গেল। তারপর অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ জ্বলে উঠল একটা টর্চের আলো—

এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো লক্ষ্য করে জয়ন্ত ও মানিক ছুড়লে রিভলভার! বদ্ধ আবহের মধ্যে রিভলভারের শব্দকে মনে হল যেন কামান-গর্জন! অব্যর্থ তাদের লক্ষ্য! গুহায় আবার রন্ধ্রহীন অন্ধকার!

রিভলভারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে শোনা যেতে লাগল অতি-দ্রুত পায়ের আওয়াজ। যারা এসেছিল, এই ভয়াবহ অভ্যর্থনায় তারা এখন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আরও-বেশি ভয় দেখাবার জন্যে জয়ন্ত ও মানিক কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ে এগিয়ে গেল এবং আবার কয়েকবার রিভলভার ছুড়তেও কসুর করলে না।

পরমুহূর্তেই সমস্ত গুহা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল! কর্ণভেদী চিৎকারের পর চিৎকার—সেসব চিৎকার শুনলে যেন হিম হয়ে যায় বুকের রক্ত! তার বীভৎসতা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

জয়ন্ত অভিভূতকণ্ঠে বললে, 'মৃত্যুকূপ! হতভাগ্যরা সেই মৃত্যুকূপের ভিতরে তলিয়ে গেছে!'

মানিক শিউরে উঠে বললে, 'আমরা কি চেষ্টা করলে ওদের বাঁচাতে পারি না?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'ওদের বাঁচানো অসম্ভব! হয়তো কূপের ধারে গিয়েও ওদের আর দেখতে পাব না। দেখতে পেলেও আমরা কী সাহায্য করতে পারি? ওদের বাঁচাতে গেলে ওই গভীর কূপের ভিতরে খুব লম্বা একগাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিতে হয়। তেমন দড়ি আমাদের সঙ্গে কোথায়? আমাদের সম্বল মাত্র একগাছা দড়ি—আবার উঠে তা আর খুলে আনবার সময়ও নেই, উপায়ও নেই।'

হরিহর বললে, 'কিন্তু ওরা কারা?'

জয়ন্ত বললে, 'এদের মধ্যে একজন যে ফুয়াদ, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা আমি কতক কতক আন্দাজ করতে পেরেছি। ম্যাপের লাল কালির দাগ দেখে ফুয়াদ নিশ্চয়ই রাজাদের এই উপত্যকায় সন্ধান নিতে এসেছিল। তারপর হঠাৎ আমাদেরও এখানে দেখতে পেয়ে ফুয়াদ লুকিয়ে পড়ে—কিন্তু আমাদের গতিবিধির উপরে রাখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তারপর আমাদের পিছনে পিছনে ফুয়াদ আর তার সঙ্গীরাও দড়ি ধরে গর্তের ভিতরে নেমে আসে। কিন্তু এটা যে মৃত্যু-গহ্বর এতটা তারা অনুমান করতে পারেনি, আর এখানে ঢোকবার জন্যে আমাদের মতন আগে থাকতে প্রস্তুত হয়েও আসেনি। খুব সম্ভব, ওদের সঙ্গে একটার বেশি 'টর্চ' ছিল না আর পাছে আমরা দেখতে পাই সেই ভয়ে সে 'টর্চটা'ও সবসময় জ্বেলে রাখতে পারেনি। তাই আসবার পথেই ওদের দলের একজন লোক ওই কূপে ঝাঁপ খেতে বাধ্য হয়েছে। তারপর আমাদের রিভলভারের গুলিতে ওদের সেই একটি-মাত্র 'টর্চ'ও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। রিভলভারের গুলি এড়াবার জন্যে ওরা পালাবার চেষ্টা করেছে এই নিবিড় অন্ধকারে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকূপকে এড়াতে পারলে না। হয়তো এটা ভগবানেরই বিধান। ওরা না মরলে হয়তো ওদের হাতে মরতে হত আজ আমাদেরই। কিন্তু আমরা হচ্ছি 'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি'র সন্তান, তাই 'মহারাজ রামেসেসে'র সমাধিগুহার মধ্যে আমাদের মৃতদেহগুলোর ঠাঁই হল না। হরিহরবাবু, এইবারে আপনি নির্ভয় হতে পারেন। ফুয়াদ পাসার পালা সাঙ্গ হল, সে আর আপনাকে তাড়া করতে আসবে না।'

হরিহর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না। ব্যাপার দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি! বাপ!'

॥ অষ্টম ॥

তুচ্ছ আলিবাবার গুহা

তারা সবাই আবার রত্নগুহার ভিতরে ফিরে গেল।

মনের উত্তেজনায় প্রথম দৃষ্টিতে তারা যা দেখতে পায়নি, এবারে সেসবও তাদের নজর এড়িয়ে গেল না।

গুহার দেওয়াল কালো পাথরের কর্কশ গা ঢেকে রয়েছে অপূর্ব সব ভিত্তিচিত্র! কত হাজার হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদের নিপুণ হাতে আঁকা সেইসব ছবি, কিন্তু আজও তাদের বর্ণবৈচিত্র মলিন বা অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

কোথাও গাছে বসে আছে কপোত-কপোতী, জলে সাঁতার কাটছে হাঁসের দল, নদীর ধারে পাপিরাস-তৃণপত্রের পাশে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ছে বকজাতীয় অহিরিন পাখি; কোথাও দেখানো হয়েছে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পশুকে; কোথাও একটি মেয়ে বুনছে সুতো, একটি মেয়ে বাজাচ্ছে বীণা এবং একটি তরুণী ব্যস্ত ফোটা-ফুলের আঘ্রাণ নিতে; কোথাও কুমোর গড়ছে পাত্র, কোথাও পুরোহিতরা সারছে মন্দিরের কাজ, কোথাও রাজসভাসদরা চলেছে রাজসন্দর্শনে; কোথাও কুস্তিগিররা পরস্পরের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নিযুক্ত, কোথাও ধোপার দল কাপড় কাচছে বা শুকোচ্ছে বা পাট করছে, কোথাও রাখালরা গোরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে, কোথাও দড়া-বাজিকররা খেলা অভ্যাস করছে। কোথাও দেখা যায় শিকার ও শিকারিদের, কোথাও বসেছে নাচের আসর, কোথাও পটুয়ারা বসে বসে আঁকছে ছবি। এমনি দৃশ্যের পর দৃশ্য—সংসার, সমাজ, রাজসভা, শস্যখেত, খেলার মাঠ, যুদ্ধক্ষেত্র,

দেবতার মন্দির, প্রাসাদ, চাষার কুটির, হাটবাজার, নগর ও অরণ্য প্রভৃতি সত্যিকার জগতের যা-কিছু দ্রষ্টব্য নিয়ে আশ্চর্য এক চিত্রজগৎ।

মানিক উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললে, 'দ্যাখো জয়, চেয়ে দ্যাখো! গুহার দেওয়ালের উপরে বিরাজ করছে প্রাচীন মিশরের সমস্ত দৃশ্য।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ মানিক, সেকালের এদেশি শিল্পীরা সমাধিগৃহের ভিতরে সমসাময়িক যুগের ছোটো-বড়ো যা-কিছুকে এমনিভাবে ফুটিয়ে রাখত বলেই প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম, শিল্প আর সাহিত্য আজ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে আছে। প্রাচীন মিশর আজ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়েও দৃশ্যমান হয়ে আছে শিল্পীদের দৌলতে! দুনিয়ার আর কোনও মৃত-সভ্যতা শিল্পীদের সাহায্যে নিজেকে এমনভাবে অমর করে যেতে পারেনি। অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি আর ভারহুত প্রভৃতি স্থানে গেলে চিত্র, ভাস্কর্য আর স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে আর্যদের মহাভারতবর্ষের গৌবরময় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! প্রাচীন ভারতের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার কোনও ব্যবস্থাই আমাদের পূর্বপুরুষরা করে যেতে পারেনি। তাই আজ আমরা সন্দেহ প্রকাশ করলেও জোর করে বলতে পারি না যে, পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলোকপাত করেছিল আমাদের আর্য-ভারতবর্ষই! বেদ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হতে পারে, কিন্তু সভ্যতায় ভারত যে মিশরের অগ্রগামী এর কোনও প্রমাণ পাবার উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীন মিশর মরেও বেঁচে আছে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের জীবনের ধারা আজও বর্তমান, অথচ তার অতীত-গৌরবের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে মৃত্যুর কবলে!'

হরিহর বললে, 'ও জয়ন্তবাবু, কলেজের প্রফেসরের মতন প্রাচীন মিশর আর ভারতবর্ষকে নিয়ে লেকচার তো দিচ্ছেন, কিন্তু ওসব মূল্যবান আলোচনা কি বাসায় ফিরে করলেই ভালো হয় না?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'ঠিক বলেছেন হরিহরবাবু! কিন্তু আমিও যে বাঙালি জাতির একটি জ্যান্ত নমুনা, আমাদের যে স্থানোপযোগী কিছু করবার অভ্যাস নেই! আমরা ধর্মকর্ম করবার জন্যে জন্মাষ্টমী আর শিবরাত্রিতে ছুটে যাই থিয়েটারে নর্তকীর নূপুরধ্বনি শুনতে, বাঙালি মেয়ে-পুরুষের পোশাক খুঁজতে যাই সায়েবদের দোকানে আর মাসিক-সাহিত্যক্ষেত্রে বসে করি দৈনিকপত্রের সংবাদ নিয়ে আলোচনা! তাই আজ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে এসেও শোনাচ্ছি কিনা প্রাচীন সভ্যতার বক্তৃতা! ...তারপর হরিহরবাবু, আপনার কী আদেশ বলুন দেখি?'

অনেকটা টবের মতন দেখতে একটি সুন্দর কারুকার্যকরা পাত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হরিহর বললে, 'এটা কী বলতে পারেন?'

জিনিসটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে জয়ন্ত বললে, 'দেখছি, এটা হচ্ছে শ্বেতস্ফটিক দিয়ে গড়া এক জলঘড়ি।'

—'জলঘড়ি?'

—'হ্যাঁ। পৃথিবীতে তখন এইরকম পাত্র দিয়েই এখনকার ঘড়ির অভাব পূরণ করা হত। ভিতরদিকে তাকালেই দেখতে পাবেন এর গায়ে খোদা আছে Graduated Scale বা ক্রমাঙ্কিত মাপনদণ্ড। এর তলায় আছে একটি ছোটো ছ্যাঁদা। এই পাত্রটি জলপূর্ণ করলে পর

ওই ছ্যাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বাইরে বেরুতে থাকে, তারপর মাপনদণ্ডের হিসাবে কতটা জল কমল দেখে অনায়াসেই সময় নিরূপণ করা যায়। সেদিকার পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো ঘড়ির কথা কেউ জানত না। বহু শতাব্দী পরে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার-দি-গ্রেটের আগেও এইরকম জলঘড়ির সাহায্যেই মানুষের কাজ চলত।'

বিস্ফারিত চক্ষে হরিহর বললে, 'বাবা! মিশরের এত কথাও আপনি জানেন!'

—'প্রাচীন মিশরের আরও অনেক কথাই আমি বলতে পারি। বিজ্ঞানের রাজ্যেও সে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল শুনবেন নাকি?'

একখানা বাহু অর্ধোত্থিত করে করাঙ্গুলি বিস্তৃত করে হরিহর বললে, 'রক্ষা করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কথায় কথায় বেলা বেড়ে যাচ্ছে, এখন কী করব তাই বলুন।'

—'আপনি কী করতে চান?'

—'এই গুপ্তধন এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তো?'

—'আজকেই?'

—'তা নয়তো কী? কে আবার প্রাণ হাতে করে এই ভুতুড়ে-গুহায় ঢুকবে? আজই সব চুকিয়ে দিতে হবে।'

—'অসম্ভব!'

—'কেন?'

মানিক বললে, 'কেন যে অসম্ভব তাও বুঝতে পারছেন না হরিহরবাবু? আমাদের তিনজনের এমন সাধ্য নেই যে এক দিনে এতবড়ো ভাণ্ডারের এতরকম ঐশ্বর্য নিয়ে আমরা আজই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারব। কুলিমজুর ডাকাও সম্ভবপর নয়, এখনকার কথা বাইরের কারুকে জানানোও চলবে না, কেননা, গুপ্তধনের কাহিনি মিশরের রাজসরকারের কানে উঠলেই আমাদের বাড়া-ভাতে পড়বে ছাই।'

—'তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে চুপিচুপি, চোরের মতো!'

—'নিশ্চয়।'

—'তবেই তো!'

জয়ন্ত বললে, 'অতটা হতাশ হবেন না হরিহরবাবু! গুপ্তধন যখন পেয়েছি, ছাড়ব না! তবে কাকপক্ষীকে না জানিয়ে কেমন করে এই গুপ্তধন স্থানান্তরিত করা যায় সেটা পরামর্শ করে স্থির করতে হবে।'

—'তাহলে চটপট সেই পরামর্শটাই করে ফেলি আসুন না।'

—'এসব তাড়াতাড়ির কাজ নয় মশাই, তাড়াতাড়ির কাজ নয়। আবার নতুন করে উদ্যোগপর্ব আরম্ভ করতে হবে। আপাতত গুহা ছেড়ে বাসায় ফিরে যাই চলুন।'

—'বলেন কী, গুপ্তধন এখানে ফেলে?'

—'ভয় নেই হরিহরবাবু, আমরা ছাড়া গুপ্তধনের সন্ধান আর যারা পেয়েছে, তারা এখন কূপের তলদেশে চিরবিশ্রামশয্যায় শুয়ে আছে।'

—'কিন্তু আমরা চলে গেলেই ফুয়াদ পাশা যদি যক হয়ে গুপ্তধন আগলাতে আসে?'

—'বাজে বকবেন না, চলুন।'

—'না মশাই, আমার মন খুঁতখুঁত করছে। অন্তত—' বলেই হরিহর সেই সোনার পাত-দিয়েই মোড়া বৃহৎ পেটিকার দিকে এগিয়ে গেল।

মানিক বিস্মিতস্বরে বললে, 'আপনি কী করতে চান?'

পেটিকার গর্ভে হস্তচালনা করে হরিহর বললে, 'হাতের লক্ষ্মী ছাড়তে নেই। আপাতত পকেট ভরে যত পারি ধনরত্ন নিয়ে যেতে চাই।'

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, 'এ কথা মন্দ নয়। এসো মানিক, আমরাও হরিহরবাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি।'

হরিহর হিরা, মানিক ও রত্নালংকারে পকেটের পর পকেট ভরতে ভরতে বললে, 'যা খুশি, যত খুশি তুলে নিন! কে জানে বাবা আর ফিরতে পারব কি না! যে যা নেবে, তার ভাগে তাই পড়বে। এ-গুপ্তধনে আমাদের তিনজনেরই সমান অধিকার!'

কারুর কোনও পকেটেই আর তিলধারণের ঠাঁই নেই—কিন্তু পেটিকার গর্ভ তখনও প্রায়-পরিপূর্ণ হয়েই রইল।

মানিক অভিভূতস্বরে বললে, 'আমরা এখন যা নিয়ে যাচ্ছি তাই দিয়েই হয়তো মস্ত একটি রাজ্য ক্রয় করা অসম্ভব নয়। এ গুহার কাছে আলিবাবার গুহাও তুচ্ছ!'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, এইবারে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরো।'

সকলে আবার অগ্রসর হল। সেই ভয়াবহ পথ, সেই মৃত্যুকূপ!

—'মানিক!'

—'বলো জয়ন্ত!'

—'আসবার সময়ে খেয়াল করা হয়নি—এই গুহাপথে একটা গন্ধ পাচ্ছ কি?'

—'পাচ্ছি। এ-রকম গন্ধ পেয়েছি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে।'

সকলে পথের শেষ-প্রান্তে সেই নরকঙ্কাল-বিছানো গহ্বরে গিয়ে দাঁড়াল।

সচমকে ও বিস্ময়ে জয়ন্ত বলে উঠল 'সর্বনাশ!'

মানিক এবং হরিহর স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, যা অবলম্বন করে তারা নীচে নেমে এসেছে, সেই রজ্জুগাছা আর ভিতরে ঝুলছে না!

তারা হতভম্ব ও আড়ষ্ট হয়ে মূর্তির মতন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। নিজেদের চোখগুলোকে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না।

॥ নবম ॥

বিস্ময় ও বিভীষিকা

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনও কথা কইতে পারলে না। স্তব্ধ গহ্বরের মধ্যে ধ্বনির সৃষ্টি করতে লাগল কেবল তাদের উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাস।

তারপর সেই অসহ নীরবতা ভঙ্গ করে মানিক ডাকলে, 'জয়?'

—'হুঁ।'

—'ব্যাপার কী বলো দেখি?'

—'ভাবছি।'

হরিহর বললে, 'ভাববার আর কী আছে? যা হবার তা হয়েছে।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে, ফুয়াদ পাসা নীচেয় নেমে আমাদের জব্দ করবার জন্যে দড়িগাছা খুলে নিয়েছে।'

মানিক বিরক্তকণ্ঠে বললে, 'বাজে কথা বললেন না হরিহরবাবু!'

—'এটা কি বাজে কথা হল?'

—'আলবাত!'

—'কী রকম?'

—'ফুয়াদের হাত কি ষাট ফুট লম্বা যে সে নীচেয় নেমে ষাট ফুট ওপরে বাঁধা দড়ি খুলে রাখবে?'

—'তাহলে ফুয়াদের কোনও চ্যালা উপর থেকে দড়ি তুলে নিয়েছে।'

—'কেন সে তা নেবে? সে তো জানে, গুহার ভিতরে কেবল আমরা নই, তাদেরও দলবল আছে।'

এতক্ষণ পরে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি চুপ করো। হরিহরবাবুর শেষ অনুমান অসঙ্গত নয়। হয়তো ফুয়াদ গহ্বরের মুখে পাহারা দেবার জন্যে তার কোনও সঙ্গীকে রেখে নীচেয় নেমেছিল। হয়তো গুহার ভিতর থেকে রিভলভারের শব্দ আর আর্ত চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে সে দড়ি টেনে তুলে নিয়েছে। হয়তো সে ভেবেছে তার বন্ধুরা বিপদে পড়েছে। হয়তো সে বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্যে আরও লোকজন আনতে গিয়েছে। হয়তো তারা এখনই সদলবলে আবার গুহার ভিতর নেমে আসবে।'

মানিক বললে, 'তুমি তো অনেকগুলো 'হয়তো'র কথা বলে ফেললে দেখছি। কিন্তু আমাদের এখন উপায় কী?'

—'উপায় ভগবান। আমি তো কোনও উপায়ই দেখছি না।'

মানিক দৃঢ়স্বরে বললে, 'বেশ, আসুক শত্রুরা। তারা আমাদের চেনে না! জীবনে অনেক বিপদে পড়েছি, অনেক বিপদ এড়িয়েছি! আজও আমরা নিরস্ত্র নই।'

হরিহর কাঁচুমাচু-মুখে বললে, 'মানিকবাবু, তবে কি আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?'

—'তা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই।'

—'এই বন্দুক নিয়েই কি যুদ্ধ করতে হবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু আমি তো জীবনে কখনও বন্দুক ছুঁড়িনি।'

—'ছোড়েননি, আজ ছুড়বেন।'

—'অসম্ভব। আমি পারব না।'

মানিক এত বিপদেও হেসে ফেলে বললে, 'বেশ, তাহলে বিনা যুদ্ধেই শত্রুদের হস্তে জীবন সমর্পণ করবেন।'

—'ও বাবা, জীবন সমর্পণ কী গো? তাও আমি পারব না! আমার এখনও মরতে ইচ্ছে নেই।'

—'তাহলে আপনি শত্রুদের কাছে জোড়হস্তে দয়া ভিক্ষা করবেন আর বন্দুক হস্তে যুদ্ধ করে মরব আমরা দুজনে।'

হরিহর সন্দেহপূর্ণকণ্ঠে বললে, 'দয়া ভিক্ষা? উঁহু, শত্রুরা আমাকে দয়া করবে বলে মনে হচ্ছে না তো!'

ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে কী-একটা জিনিস সশব্দে গহ্বরের ভিতরে এসে পড়ল।

টর্চের আলো ফেলে জয়ন্ত বললে, 'দড়ি! আমাদেরই সেই দড়ি! মানিক, শত্রুরা এসেছে! তারা এইবার নীচে নামবে!'

পিঠে বাঁধা বন্দুকটাকে মুক্ত করে হাতে নিয়ে মানিক বললে, 'এই দড়ি ধরেই ওদের একে একে নীচে নামতে হবে তো? তাহলে জিতব আমরাই! ওরা এক-একজন করে নীচে নামবে, আর আমরা এক-একজন করে ওদের বধ করব। আমাদের বন্দুক ছুড়তেও হবে না, আমরা—'

মানিকের কথা শেষ না হতেই উপর থেকে মস্ত একখানা পাথর সশব্দে নীচের এসে পড়ল!

জয়ন্ত বললে, 'মানিক! হরিহরবাবু! সাবধান! শত্রুরা নির্বোধ নয়—তারা সন্দেহ করেছে আমরা এখানে হাজির আছি! আমাদের বধ করবার জন্যে তারা উপর থেকে পাথর ছুড়ছে, তারা—'

পরে পরে আরও দু-খানা প্রকাণ্ড পাথর গহ্বরের তলদেশে এসে পড়ল।

জয়ন্ত বললে, 'শিগগির! এমন একখানা পাথর যার মাথায় এসে পড়বে তারই অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে! শিগগির এদিকে এসো। হরিহরবাবু, আমার হাত ধরুন! মানিক! মাথা নীচু করে এসো—হ্যাঁ, এইদিকে!

তারা আবার সংকীর্ণ গুহাপথের ভিতরে এসে ঢুকল।

মানিক বললে, 'জয়, ওরাও তো আবার এই রত্নগুহার পথেই আসবে!'

জয়ন্ত বললে, 'না মানিক, এটা রত্নগুহার পথ নয়! হরিহরবাবুর বাবা তিনটি পথের উল্লেখ করেছেন, ভুলে যাচ্ছ কেন? রত্নগুহার পথ ডানদিকে সব-শেষে! এটি হচ্ছে মাঝের পথ—দেখছ না, এ পথটা রত্নগুহার পথের মতন অতটা সংকীর্ণ নয়, এর ভিতরে হামাগুড়ি দিতে হয় না—যদিও মাথা নীচু করে চলতে হয়?'

—'কিন্তু এ পথ গেছে কোনখানে?'

—'যেখানেই যাক, এ পথ হয়তো রত্নগুহার পথের মতন বিপজ্জনক নয়। তোমরা কেউ টর্চের আলো নিবিও না, সাবধানে আমার সঙ্গে এগিয়ে এসো!

তারা গুপ্তপথ ধরে যতটা-সম্ভব দ্রুতপদে অগ্রসর হতে লাগল। খানিক পরেই তারা এসে পড়ল এক প্রকাণ্ড গুহায়।

তিন-তিনটে টর্চ তিন-তিনটে আলোকরেখা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তারা গুহার নিবিড় অন্ধকার দূর করছে না, স্থানে স্থানে অন্ধকারকে করে দিচ্ছে কেবল খণ্ড খণ্ড।

খানিক তফাতে চোখ চালিয়ে জয়ন্ত হঠাৎ চমকে উঠল, চুপি চুপি বললে, 'দ্যাখো মানিক, দ্যাখো!'

মানিক ও হরিহর দুজনেই দেখলে।

অন্ধকারের ভিতরে জ্বলছে পরে পরে কতকগুলো অগ্নিশিখা!

—'মানিক, ওখানে রয়েছে আটটা আগুনের ভাঁটা! ওগুলো জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে! কী ওগুলো?'

একসঙ্গে তিনজনেই সেইদিকে টর্চের আলো ফেলেই চকিতে দেখে নিলে, চারটে সিংহ পাশাপাশি বসে সবিস্ময়ে তাদের নিরীক্ষণ করছে! দুটো সিংহ প্রকাণ্ড ও দুটো সিংহ ছোটো—সম্ভবত অপ্রাপ্তবয়স্ক!

টর্চের তীব্র আলোক তাদের মুখের উপরে গিয়ে পড়বামাত্র সিংহ চারটে ভীষণ গর্জন করে উঠে দাঁড়াল—তারপর শোনা গেল তাদের দ্রুতপদধ্বনি!

—'বন্দুক ধরো মানিক, বন্দুক ধরো!'

'আঁ!' বলে আর্তনাদ করে হরিহর ধপাস করে বসে পড়ল!

জয়ন্ত বললে, 'ভয় নেই হরিহরবাবু, ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন! টর্চের আলো চোখে পড়াতে সিংহরাই ভয় পেয়েছে! তারা গুহাপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল!'

মানিক বললে, 'আমরা সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করেছি—তাই এখানে চিড়িয়াখানার গন্ধ!'

হরিহর ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'মানুষ-শত্রুর ওপরে আবার চার-চারটে সিংহ! ওরে বাপ রে, এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না!'

জয়ন্ত বললে, 'কী আশ্চর্য, ইজিপ্টে সিংহ! সবাই তো জানে সিংহরা মধ্য-আফ্রিকার উপরে ওঠে না!'

মানিক বললে, 'বোধহয় এরা দৈবগতিকে এখানে এসে পড়েছে। খবরের কাগজে কিছুদিন আগে তুমি কি পড়োনি, কলকাতার অদূরে—অর্থাৎ হাওড়ায় একবার সুন্দরবননিবাসী রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার পাওয়া গিয়েছিল?'

—'হ্যাঁ, খবরটা আমিও পড়েছিলুম বটে।'

—'ইজিপ্টে যেমন সিংহের বাস নেই, হাওড়াতেও নেই তেমনি বাঘের বাসা।'

—'হয়তো তোমার অনুমানই সত্য।'

—'কিন্তু জয়ন্ত, আরও একটা আশ্চর্য কথা আছে।'

—'আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ। ভেবে দেখেছ কি, এই গুহার ভিতরে সিংহ এল কেমন করে? নিশ্চয় তরা ষাট ফুট উঁচু পাহাড়ের টং থেকে গর্তের ভিতরে লাফিয়ে পড়েনি?'

নিজের উরুদেশ সশব্দে একটা চপেটাঘাত করে জয়ন্ত বললে, 'ঠিক, ঠিক। এটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি। এখানে সিংহ এল কেমন করে? এ যে মস্ত প্রশ্ন! এর উত্তর তুমি পেয়েছ?'

—'পেয়েছি। এই গুহা থেকে বাইরে যাবার জন্যে নিশ্চয় আর-একটা পথ আছে।'

—'ঠিক। আর সে-পথ নিশ্চয় বিশেষ দুর্গম নয়, চতুষ্পদরা তা ব্যবহার করতে পারে।'

এক মুহূর্তে সমস্ত জড়তা ত্যাগ করে হরিহর একটি রীতিমতো বিস্ময়কর লম্ফ ত্যাগ করলে। চিৎকার করে বললে, 'আসুন, আসুন, আসুন, আমরা সেই পথের সন্ধান করি! আমরা যা পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট—চুলোয় যাক রামেসেসের গুপ্তধন! এখান থেকে আমি এখন সবেগে পলায়ন করতে চাই! ওরে বাপরে বাপ! 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর'! ওদিকে দলবদ্ধ দুরাত্মা, এদিকে ভোম্বলদাসের ভাগ্নে—সিংহ! তাই কি ছাই এক-আধটা! একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে সিংহ-চতুষ্টয়! এদিকে রাম, ওদিকে রাবণ—আমাদের অবস্থা হতভাগ্য মারীচের মতন—উঁহু, তারও চেয়ে খারাপ! এতদিন ধরে সযত্নে রক্ষাকরা পৈতৃক-প্রাণ, আমি তাকে এত সহজে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই!'

মানিক বললে, 'হরিহরবাবু, আপনি ভয়ংকর চ্যাঁচাচ্ছেন! পশুরাজরা বিরক্ত হয়ে এখনই ফিরে আসতে পারে!'

—'পারে নাকি? বাবা, তাহলে এই আমি গলা খাটো করলুম—পশুরাজদের আমি নিমন্ত্রণ করতে রাজি নই। কিন্তু দোহাই আপনাদের! বাইরে বেরুবার নতুন পথ যদি থাকে তাহলে এই অসম্ভব দুঃস্বপ্নের মুলুক থেকে পীঠটান দেওয়াই কি উচিত না?'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উচিত! আসুন তবে দেখা যাক, কোন পথ দিয়ে এখানে সিংহপরিবারের আবির্ভাব হয়েছে।'

জয়ন্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গুহায় আবদ্ধ আবহের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠল ঘন ঘন বন্দুক ও রিভলভারের আওয়াজ, সিংহদের কণ্ঠে ক্রুদ্ধ মেঘগর্জনের মতন ভৈরব হুহুঙ্কারের পর হুঙ্কার আর মানুষদের কণ্ঠে মর্মভেদী চিৎকার ও ক্রন্দনধ্বনি। সে কী ভয়ংকর শব্দতরঙ্গ—গুহার নিরেট পাথরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন দুঃসহ যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপতে আর কাঁপতে আর কাঁপতে লাগল!

হরিহর দুই হাত দুই কান চেপে বসে পড়ে বারবার বলতে লাগল, 'হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান।'

জয়ন্ত ও মানিক স্তম্ভিত ও নিশ্চল হয়ে রইল।

তারপরেই আচম্বিতে আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্বনি, পশু ও মানুষের গর্জন ও ক্রন্দন থেমে গেল একেবারে!

—'জয়ন্ত।'

—'হুঁ।'

—'এ কী কাণ্ড!'

—'যা হবার, যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে!'

—'সিংহরা আক্রমণ করেছে ফুয়াদের সঙ্গীদের?'

—'তা ছাড়া আর কী? যাক, এইবারে আমাদের নিজেদের গায়ের চামড়া অক্ষত রাখবার চেষ্টা করতে হবে।'

হঠাৎ গুহাপথের ভিতরে শোনা গেল অতি-দ্রুত পায়ের শব্দ!

জয়ন্ত বললে, 'বিপদ এইদিকেই আসছে। মানিক, বন্দুক নাও। হরিহরবাবু, উঠে দাঁড়ান, আমাদের সাহায্য করুন, দু-হাতে দুটো টর্চ নিয়ে ঠিক গুহাপথের মুখে আলো ফেলুন। পথ দিয়ে যে-মুহূর্তে কোনও মূর্তিমান-বিপদের আবির্ভাব হবে, আমরা গুলি করে মেরে ফেলব।'

পথ দিয়ে গুহার ভিতরে সবেগে এসে পড়ল একটা মূর্তি, ভালো করে কিছু দেখবার আগেই জয়ন্ত ও মানিক একসঙ্গে ছুড়লে বন্দুক এবং বিকট এক চিৎকার করে মূর্তিটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

মানিক বলে উঠল, 'এ তো সিংহ নয়, এ যে মানুষ!'

মূর্তিটা মাটির উপরে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

জয়ন্ত ছুটে তার কাছে গিয়েই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী! এ যে ফুয়াদ পাসা!'

মূর্তিটা মুখ তুলে জয়ন্তকে দেখে যন্ত্রণাবিকৃতস্বরে বললে, 'হ্যাঁ বাঙালিবাবু, আমি ফুয়াদ!'

—'তুমি তাহলে মরোনি?'

—'এখনও মরিনি বটে, কিন্তু আর আমার বাঁচবার আশা নেই!'

—'আমি জানতুম তুমি ঝাঁপ দিয়েছ কূপের জলে!'

—'না, কূপ গ্রাস করেছিল আমার সঙ্গীদের। কূপকে ফাঁকি দিয়ে আমি আবার বাইরের আলোতে পালিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু গুপ্তধনের লোভ সামলাতে না পেরে অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন নিয়ে ফের ফিরে এসেছি! এবারে তোমাদের মেরে গুপ্তধন নিশ্চয়ই দখল করতুম, কিন্তু হঠাৎ বিনা-মেঘে বজ্রের মতন এসে পড়ল ওই অসম্ভব সিংহগুলো! আমার দলের সবাই পড়েছে তাদের খপ্পরে, কেবল আমি তাদের কোনওরকমে এড়িয়ে এখানে এসেছি বটে, কিন্তু তোমাদের বন্দুক এড়াতে পারলুম না।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা কিন্তু বন্দুক ছুড়েছিলুম সিংহবধ করবার জন্যে। নরহত্যা করা আমাদের পেশা নয়।'

ফুয়াদ কষ্টে নিশ্বাস টানতে টানতে থেমে বললে, 'বুঝেছি। তোমাদের দোষ দিই না। হয়তো আজ আমি এমনিভাবেই মরব, দুনিয়ার মালিক খোদার এই বিধান।' তারপর হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'গুপ্তধন, গুপ্তধন! এখনই যে-দেশে যাত্রা করব সেখানে গুপ্তধনের দরকার হয় না—এখানকার যা-কিছু সব আমি তোমাদেরই দান করলুম।'

মিনিট-কয় পরেই ফুয়াদ পাসার মৃত্যু হল।

হরিহর বললে, 'আর আপনারা দেরি করবেন না, আসুন দেখা যাক বেরুবার পথ আছে কোন দিকে। সিংহরা এদিকে আসতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না, সিংহরা সামনে পেয়েছে এখন বিপুল ভোজ, এদিকে আসবার জন্যে তাদের তাড়া নেই।'

—'তবু বলা তো যায় না। পথটা খুঁজে বার করবে ক্ষতি আছে কি?'

—'না, ক্ষতি নেই। এসো মানিক, হরিহরবাবু বড়োই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।'

হরিহর দুই ভুরু তুলে ও দুই চোখ পাকিয়ে বললে, 'বলেন কী মশাই, ব্যস্ত হব না? আজ যা দেখলুম আর যা শুনলুম, আমিতে কি আর আমি আছি বাবা?'

মানিক বললে, 'এখন যেন যাচ্ছি, আবার তো আমাদের এইখানেই ফিরে আসতে হবে?'

—'এই নাক মলচি, এই কান মলচি, গুপ্তধনের পায়ে দূর থেকেই নমস্কার। চার-চারটে মানুষখেকো সিংহের গর্তে আবার আমি আসব? শর্মা সে ছেলে নয়, হুঁ।'

ছায়া-কায়ার মায়াপুরে

দিঘির মাঠে বাংলো

॥ এক ॥

মাসিক পত্রে কবিতা লিখি বলে বন্ধুমহলে নাম হয়েছিল, কবি।

আমার কবিতায় যে কবিত্ব নেই, সে কথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না।

কবিত্ব থাকে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে। এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষই কবি। কিন্তু ভাষায় সেই কবিত্বকে প্রকাশ করতে পারে খুব অল্প লোকই এবং আমি ওই অল্পসংখ্যকদের কেউ নই। যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবু আমি কবিতা লিখি কেন, তবে উত্তরে বলব, ওটা আমার মুদ্রাদোষ।

সম্প্রতি বাল্যবন্ধু সতীশের পত্র পেয়েছি। সতীশ গিয়েছিল পুজোর সময়ে বায়ুপরিবর্তনে। পশ্চিমের এক দেশ থেকে লিখেছে:

'কবি,

আমি যেখানে বাসা বেঁধেছি তার আশে-পাশে অজস্র কবিত্বের বাহার। এখানে উপর-পানে তাকালে ঝুলে-ভরা কড়িকাঠের বদলে দেখা যায় নীলার-রং-মাখানো অসীম আকাশ, পদব্রজে বেড়াতে বেরুলে নরহত্যাকারী মোটর ও ট্রামের বদলে চোখে পড়ে কেবল বনফুলে রঙিন পাহাড় ও নদীর হার-দোলানো স্নিগ্ধসবুজ খেতের পরে খেত এবং কান পেতে শুনলে হেটো লোকের হট্টগোল আর পাওনাদারের সচিৎকার তাগাদার বদলে শোনা যায় শুধু মুক্তবিহঙ্গের আর গিরি-নির্ঝরিণীর মতো সংগীত। অতএব বাঁধো তোমার মোটমাট, কেনো একখানা ইন্টার ক্লাসের টিকিট এবং চলে এসো আমার ঠিকানায়। তোমার উদরে অন্ন জোগান দেবার ভার গ্রহণ করব আমি।'

বলাবাহুল্য সতীশের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দেরি করলুম না।

॥ দুই ॥

সতীশের বাসায় পৌঁছে দেখলুম, অত্যুক্তি করেনি। যা আমার কবিতায় প্রকাশ পায় না, সেই কবিত্বই এখানে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে-বাতাসে, বনে-বনে, নদীর লহরে, প্রজাপতির পাখনায়, মৌমাছির গানে। নিজেকে কী নিঃস্বই মনে হল! একরত্তি একটি ঘাসের দুলদুলে ফুল, বাতাসের দীর্ঘশ্বাসও সইতে পারে না, কিন্তু তারই তিল-পরিমাণ পাপড়িতে যে অনন্ত ছন্দ ও কবিত্বের ইঙ্গিত, আমার শত শত বড়ো বড়ো কবিতাও তার কাছে নগণ্য! এখানে আমার কবিতার পাশ ফিরে শোবারও ঠাঁই নেই।

সতীশ বললে, 'কবি, এখানে খালি কবিত্ব নয়, তারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস পাওয়া যায়।'

আমি বললুম, 'কবিত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস স্বর্গেও নেই।'

—'স্বর্গে—অন্তত হিন্দুদের স্বর্গে—না থাকতে পারে কিন্তু মর্ত্যে আছে। টাকায় দুই গন্ডা রামপাখি কিংবা বিশ গন্ডা তস্য ডিম্ব! 'এমন দেশটি কোথায় গেলে পাবে খুঁজে তুমি'?'

চমৎকৃত হয়ে বললুম, 'তাহলে প্রাণপণে আমি প্রতিজ্ঞা করছি সতীশ, এ দেশকেই আমার স্বদেশ বলে মনে করব।'

সতীশ চোখ পাকিয়ে বললে, 'কবি, তুমি মিরজাফরেরও চেয়ে নিম্নশ্রেণির লোক!'

—'কেন?'

—'মিরজাফর স্বদেশ ভুলেছিলেন সিংহাসনের আর বিপুল ঐশ্বর্যের লোভে। আর তুমি এমনি পামর যে তুচ্ছ ফাউলের লোভে স্বদেশকেও ভুলতে চাও?'

—'ভুল সতীশ, ভুল! ফাউল তুচ্ছ নয়, আর ফাউল হচ্ছে আমার স্বদেশেরই একটি বড়ো সম্পদ। 'এনসাইক্লোপিডিয়া' খুলে দ্যাখো: ফাউল বিদেশি নয়, তার প্রথম জন্ম ভারতবর্ষেই। অতএব ফাউলের স্বদেশ হচ্ছে আমাদেরও স্বদেশ। ইউরোপের রসনা সেদিনও পর্যন্ত ফাউলের আস্বাদ জানত না, কিন্তু তার উপরে আমাদের জন্মগত অধিকার। ইউরোপ যখন শ্রীরামপক্ষীর স্বপ্নও দেখেনি, ভারতের বিরাট আকাশ আচ্ছন্ন করে উড়ত তখন ফাউলের পর ফাউল—কোটি কোটি নরম নধর রংচঙে ফাউল। এদেশে এত ফাউল থাকতে লক্ষ্মীদেবী 'আউল'-বাহিনী হলেন কেন, মাঝে মাঝে তাই ভেবে আমি অবাক হই, কেন না লক্ষ্মীমন্ত না হলে নিত্য কেউ ফাউলকারি খেতে পারে না। মা লক্ষ্মীর সঙ্গে ফাউলের সম্পর্ক বড়োই ঘনিষ্ঠ!'

সতীশ বললে, 'তোমার গভীর গবেষণার উপরে আর কথা চলে না। আজ তাহলে ফাউলের চপ, কাটলেট আর কারিই তোমার বরাদ্দ রইল।'

সেদিন সন্ধ্যার চাঁদ আসন্ন কোজাগরি পূর্ণিমার আনন্দে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তার রূপ দেখে মন আর বাসায় ফিরতে চাইলে না, পাহাড়ের একখানি পাথরের উপরে একলাটি বসে বসে দেখতে লাগলুম, ঝরনায় ঝরছে হিরের ধারা, আর শালবনে কালোর ফাঁকে ফুটছে আলোর চিত্রমালা!

এ সময়ে প্রত্যেক মানুষই মনে মনে কবিতা রচনা করে,—এমনকি শিশুরা পর্যন্ত। আমারও মন তখন যে-কাব্যকথা উচ্চারণ করছিল, অক্ষম ভাষায় তার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করব না।

কিন্তু আচম্বিতে শরতের এক বেরসিক মেঘ কোথা থেকে ছুটে এসে চাঁদের উপরে করলে যবনিকাপাত। শরতের মেঘ বটে, কিন্তু অভাবিতরূপে ঘন। চাঁদ-তারার আলোকিত নাট্যশালা একেবারে অন্ধকার!

এমন আকস্মিক দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। ভাগ্যে সঙ্গে ইলেকট্রিক টর্চটা ছিল, তাই কোনওরকমে পাহাড় থেকে নেমে বাসার পথ ধরতে পারলুম।

পৃথিবীর সৌন্দর্য আলোকের উপরে কতটা নির্ভর করে, তাই ভাবতে ভাবতে পথ চলছি, হঠাৎ বইল ঠান্ডা জোলো হাওয়া, এবং তার সঙ্গে-সঙ্গেই জাগল বজ্র-বিদ্যুতের সমারোহ! আরও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম বটে, কিন্তু পৃথিবীকে অনর্থক জ্বালাতন

করবে বলেই আজ যে অকালবাদলের আগমন হয়েছে, তাকে বোধহয় আর ফাঁকি দিতে পারব না!

টর্চে'র আলোতে পথের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, আমাদের বাসার অনতিদূরেই এসে পড়েছি। আমার ডান পাশেই রয়েছে একটা ছোটো মাঠ, স্থানীয় লোকেরা তাকে 'দিঘির মাঠ' বলে ডাকে।

বৃষ্টি শুরু হল,—প্রথমে বড়ো বড়ো দু-চার ফোঁটা। অনুভবে ফোঁটার আকার বুঝেই আন্দাজ করলুম বৃষ্টি খুব জোরেই আসবে।

অসময়ে স্নান করে দেহ আর জুতো-জামা-কাপড় ভেজাবার সাধ হল না। আশ্রয়ের জন্যে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখছি, হঠাৎ চোখে পড়ল দিঘির মাঠের নিবিড় অন্ধকারের বুক ছ্যাঁদা করে ফুটে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল অনেক জানলা-দরজা।

বৃষ্টির তোড় বেড়ে উঠল, আমিও বেগে ছুটলুম সেই আলো লক্ষ্য করে।

॥ তিন ॥

ছোটো বাঁশঝাড়ের পাশে ছোটো একখানি বাগান, তার মাঝখানে ছোটো একখানি বাংলো। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু লোকের দেখা বা সাড়া নেই।

চার-পাঁচটি ধাপ পেরিয়ে বারান্দা বা দালানের তলায় গিয়ে যখন দাঁড়ালুম তখন বৃষ্টির মুষলধারায় পৃথিবী হয়ে উঠেছে শব্দময়।

দালানের মাঝখানে এবং দুই দিকেই রয়েছে একটা একটা করে তিনটে দরজা। সব দরজাতেই পর্দা ঝুলছে।

একদিক থেকে মিহি নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'কে ওখানে?'

গলার আওয়াজটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললুম, 'আজ্ঞে, ভেজবার ভয়ে এখানে এসে একটু দাঁড়িয়েছি।'

নারীকণ্ঠ বললে, 'বেশ করেছেন। কিন্তু বাহিরে কেন, ভিতরে এসে বসতে পারেন।'

বুঝলুম, এমন কোনও শিক্ষিতা আধুনিক মহিলা কথা কইছেন, পর্দার আড়ালে থেকেও যিনি পর্দাপ্রথার ধার ধারেন না। অতএব অসংকোচে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম।

ছোটো ঘর। মেঝের উপরে খুব পুরানো কার্পেট পাতা। মাঝখানে রয়েছে মার্বেলের সেকেলে একটা গোল টেবিল, তার উপরে রয়েছে একটা সেকেলে বড়ো ল্যাম্প এবং টেবিলের চারপাশে রয়েছে খানকয় ভারী ভারী সেকেলে চেয়ার। একটু তফাতে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন একটি মহিলা,—তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে বিস্মিত করে দেয়। মহিলার কোলের উপরে পড়ে আছে একখানি খোলা বই, বোধহয় এতক্ষণ তিনি বই পড়ছিলেন।

হঠাৎ গর্জন-শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি, ইজিচেয়ারের পিছন থেকে একটা কালো

কুকুরের মস্ত মুখ উঁকি মারছে। তার চোখদুটো আগুন-ভরা! ত্রস্তপদে আমি আবার পিছিয়ে পড়লুম। ভেড়া ছাড়া আর কোনও চতুষ্পদ জীবকে আমি বিশ্বাস করি না।

মহিলা ধমক দিয়ে বললেন, 'টাইগার! চুপ!' কুকুরের মুখখানা আবার চেয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতি মিষ্ট হাসি হেসে তিনি আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'ও কী, ভয় পাচ্ছেন কেন? একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন না, টাইগার আপনাকে আর কিছু বলবে না।'

চেয়ারের উপরে বসে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটিও আর-একবার বিশেষ ভাবে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন আমার অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গেলেন, বইখানা মুখের সামনে তুলে ধরে আবার পড়তে শুরু করে দিলেন!

তিনি যখন আমাকে লক্ষ করছিলেন আমিও তখন লক্ষ করেছিলুম, তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক উগ্রভাবে ভরা! তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হলে, মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছটফট করতে থাকে।

বাহিরের ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ তমিস্রার ভিতর থেকে ভেসে আসছে বৃষ্টিধারার প্রচণ্ড ঐকতান। তাই শুনতে শুনতে আরও লক্ষ করলুম, মহিলাটি অপূর্বসুন্দরী ও যুবতী বটে এবং তাঁর মুখে-চোখেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ আছে বটে, কিন্তু তাঁর সাজপোশাক একেবারেই আধুনিক নয়। প্রাচীন তৈলচিত্রে সেকালকার ইংরেজি-শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদের যে-রকম সাজপোশাক দেখা যায়, এঁরও পরনে অবিকল সেইরকম জামাকাপড়!

ঘরের প্রত্যেক ছবি ও তার গিল্টি করা ফ্রেমগুলোও সেকেলে। ওই যে মস্ত ঘড়িটা টক টক শব্দে সময়ের গতি নির্দেশ করছে, তারও জন্ম নিশ্চয় আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে! এই গৃহের মধ্যে গত যুগ যেন বন্দি ও অচল হয়ে আছে।

মহিলার হাতের বইখানার দিকে আমার নজর পড়ল। মলাটের উপরে লেখা রয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী।'

আর কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এতদিন পরে আপনি 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ছেন?'

মহিলা বইখানি নামিয়ে অল্পক্ষণ স্থির-চোখে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এতদিন পরে বলছেন কেন? আমি তো শুনেছি বইখানি সবে বাজারে বেরিয়েছে!'

সবে বাজারে বেরিয়েছে! তবে কি কোনও অপোগণ্ড লেখক 'দুর্গেশনন্দিনী' নামে নতুন একখানা বই লিখেছে? বাঙালি লিখিয়েদের এ নষ্টামি হচ্ছে চিরকেলে। পুরানো নাটক-উপন্যাসের নামেই তাঁরা নতুন বইয়ের নাম রাখেন। তাঁদের বিশ্বাস বোধহয়, পুরানো নামের খাতিরেই লোক নতুন বই না কিনে পারবে না।

আবার শুধলুম, 'ওখানি কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নয়?'

মহিলাটি বললেন, 'হ্যাঁ, এখানি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকেরই লেখা। নতুন লেখক। নাম আগে কখনও শুনিনি।'

মহিলাটি বেশ গম্ভীর মুখে পরিহাস করতে পারেন দেখে, আমি মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলুম।

আমাকে হাসতে দেখে মহিলাটির মুখে বিরক্তিমাখা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। এমন সময়ে ঘড়িতে টং টং করে দশটা বাজল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে পড়ে বললেন, 'মাপ করবেন, বাড়ির ভিতরে আমার একটু কাজ আছে! যতক্ষণ বৃষ্টি না ধরে, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই আসছি। আয়, টাইগার!' তিনি ভিতরের এক দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং টাইগারও আবার চেয়ারের পিছন থেকে বেরিয়ে অগ্নিময় দৃষ্টিতে আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনিবের অনুসরণ করলে। পাশের ঘরের আলো দপ করে নিবে গেল।

বৃষ্টির শব্দ তখন কমে এসেছে—আকাশেও স্থানে স্থানে মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এ-ঘরের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে পড়ছে—নিশ্চয়ই ল্যাম্পে তৈলের অভাব! হঠাৎ দরজা দিয়ে আমার দৃষ্টি গেল পাশের ঘরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দপ দপ করে জ্বলছে দুটো ক্ষুধার্ত বন্য চক্ষু! আমার বুক শিউরে উঠল! টাইগার কি আমাকে একলা পেয়ে ভালো করে আদর করতে আসছে? কিন্তু তারপরেই সন্দেহ হল, ও চোখ দুটো বোধহয় টাইগারের নয়! কারণ চোখ দুটো জ্বলছে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচুতে। টাইগারের চোখ অত উঁচুতে উঠবে কী করে? তারপরেই মনে হল, হয়তো আমাকে ভালো করে দেখবার জন্যেই, টাইগার ওই অন্ধকার ঘরের কোনও টেবিলের উপরে লাফিয়ে উঠে পড়েছে।

আমিও উঠে পড়ে এক লাফে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, পড়ুক গে! টাইগারের চেয়ে বৃষ্টি ঢের বেশি নিরাপদ!

কিন্তু বাংলোর বাইরে এসেই মনে পড়ল,—ওই যাঃ, তাড়াতাড়িতে ভুলে ইলেকট্রিক টর্চটা টেবিলের উপরে ফেলে এসেছি। তখনই আবার ফিরে দাঁড়ালুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সেই আলোকোজ্জ্বল বাংলো হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে ডুব দিয়েছে! এবং সেখানে কেবল ধক ধক করছে ভয়ানক দুটো চলন্ত ও জ্বলন্ত চক্ষু। তারপরেই শুনলুম, অতিশয় খনখনে গলায় খিল খিল করে কে হেসে উঠে, সেই ভিজে রাতের স্তব্ধতাকে করে তুললে সচকিত।

টর্চের কথা ভুলে গিয়ে বাসার উদ্দেশে দিলুম দৌড়। এবং দৌড়তে-দৌড়তেই ভাবতে লাগলুম, বাংলোর সমস্ত আলো হঠাৎ এক সঙ্গে নিবে গেল কেন? ওই জ্বলন্ত চোখদুটো কার? অমন করে হাসলে কে? আর কেনই বা হাসলে? আমার পালানো দেখে?

॥ চার ॥

ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে বাসায়। আমার চেহারা দেখেই সতীশ বলে উঠল, 'এ কী কবি, এ কী মূর্তি!'

আমি কাদামাখা জুতোজোড়া খুলতে খুলতে বললুম, 'আস্ত মূর্তিটাকে যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, সেজন্যে ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিই।'

—'কেন হে, কেন?'

ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'বৃষ্টির ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহ মাঠের ভাঙা মন্দিরে ঢুকে পেয়ে ছিলেন দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে। বৃষ্টির ভয়ে আমিও দিঘির মাঠের বাংলোয় ঢুকে পেয়েছি নবযুগের অসীম এক সুন্দরীকে—হাতে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', মুখে তাঁর সকৌতুক প্রলাপ। আলাপ বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে ওসমানের ভূমিকায় অভিনয় করতে এল, এক বিপুলবপু সারমেয়-অবতার। ওসমান তরবারি ব্যবহার করত, কিন্তু এ ব্যবহার করে খালি বড়ো বড়ো দাঁত। কাজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছি।'

সতীশ সবিস্ময়ে বললে, 'এর মধ্যে যে দস্তুরমতো রোমান্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে হে!'

—'রোমান্স নয় ভাই, মিস-অ্যাডভেঞ্চার! বিউটি অ্যান্ড বিস্টের আর একটা নতুন নমুনা। রূপে মুগ্ধ হলুম, আর টাইগারের দাঁত দেখে পালিয়ে এলুম।'

সতীশ সাগ্রহে বললে, 'কবি, তোমরাই হচ্ছ ভাগ্যবান জীব। এখানে এসেই রোমান্স আবিষ্কার করলে! ব্যাপারটা খুলে বর্ণনা করো দেখি।'

একে একে সব কথা বললুম। সব শুনে সতীশ প্রায় হতভম্বের মতন বললে, 'দিঘির মাঠের ধার দিয়ে এতবার আনাগোনা করেছি, কিন্তু ওখানে যে এমনধারা এক চিত্তাকর্ষক রহস্যময় বাংলো আছে, কোনওদিন তো আমি লক্ষ করিনি! একেই বলে কবির দৃষ্টি। বন্ধু, কাল সকালেই তোমার ওই জ্যান্ত আবিষ্কারটিকে স্বচক্ষে দর্শন করতে যাব। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো?'

বললুম, 'কিন্তু কাল সকালে তো আর বৃষ্টি পড়বে না! কী অছিলায় আবার সেখানে মুখ দেখাতে যাব? টাইগারকে একটু আদর করব বলে?'

সতীশ বললে, 'দূর ওসব নয়, তুমি বলবে গিয়ে, তোমার 'টর্চটা' নিয়ে যেতে এসেছ।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, এ ওজর অকাট্য বটে! কিন্তু এখন ওসব বাজে কথা রাখো, উদর-দেবতার পুজোর দরকার। এইবারে থালা-বাটি ভরে তোমার বহু-বিজ্ঞাপিত ফাউলের নৈবেদ্য নিয়ে এসো, এই আমি আসনে বসে ধ্যানস্থ হলুম।'

সকালে উঠে সতীশের সঙ্গে দিঘির মাঠে গিয়ে অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেলুম।

কোথায় সেই বাংলো? মাঠময় ঝোপঝাপ, দু-চারটে ছোটো-বড়ো গাছ, সেখানে বাড়িঘর কিছুই নেই। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে দেখলুম খালি পানায় সবুজ দিঘির ধারে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে গোটাকয় বক, আর একটা গাছের ডালে স্থির হয়ে বসে আসে তিনটে শকুন।

সতীশ বললে, 'কবি, আমি জানি, দিঘির মাঠে বাংলো-টাংলো কিছুই নেই। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তোমাকে বলতে পারি—'পথিক, তুমি পথ ভুলেছ?'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'না, তা বলতে পারো না! পাহাড়ের ঝরনাতলা থেকে বাসায় ফিরতে গেলে, এই মেঠো পথ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। 'টর্চে'র আলোতে কাল আমি ওই বাঁশঝাড়কে পষ্ট দেখেছিলুম—বাংলোখানা ছিল ওরই পাশে।'

সেইদিকে এগুতে এগুতে সতীশ বললে, 'কবি, তুমি কি বলতে চাও আলাদিনের দৈত্য এসে সেই বাংলোখানাকে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে?'

আমি জবাব না দিয়ে পায়ে পায়ে বাঁশঝাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু দ্যাখো সতীশ, কী আশ্চর্য! ভাঙা ইটের স্তূপ আর ভিতের চিহ্ন দেখছ? এক সময়ে এখানে সত্যি-সত্যিই বাড়িঘর ছিল!'

সতীশ সায় দিয়ে বললে, 'তা হয়তো ছিল। আর সেই সময়েই হয়তো তোমার দুর্গেশনন্দিনীর অসীম-সুন্দরী পাঠিকা তার দীপ্তচক্ষু টাইগারকে নিয়ে এখানে বাস করত। কবি, তুমি কি এইখানে বসে বসে মনের মতো স্বপ্ন দেখছিলে?'

উত্তর খুঁজে পেলুম না। কী করে সতীশকে বোঝাব, আমি মিথ্যা স্বপ্ন দেখিনি, সত্য-সত্যই এইখানে এক আলোকময় বাংলোয় এসে উঠেছি, ঝড়-বৃষ্টির কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি, এক বিচিত্র সুন্দরীর সঙ্গে কথা কয়েছি এবং তারপর অন্ধকারে ভীষণ এক কুকুরের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছি!

সতীশ হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে ভাঙা ভিতের উপরে হেঁট হয়ে পড়ে কী-একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলে। অবাক হয়ে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলুম, কালকের ভুলে-ফেলে-যাওয়া আমার সেই 'ইলেকট্রিক টর্চ'টা! তাহলে আমি পথ ভুলিনি! সত্যই আমি এখানে এসেছিলুম!... তবে? তবে কাল যা দেখেছি সেগুলো কী?

ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিলে! তাহলে এখানে কি কোনও অজানা অদৃশ্য রহস্যের আত্মা বিরাজ করছে?

কোনওরকমে হাসি চেপে সতীশ একবার শিস দিলে। তারপর বললে, 'একেই বলে কবির দৃষ্টি! ধন্য! কবি, আলাদিনের দৈত্যও তোমার কাছে হার মানে।'

ভারী রাগ হল। ভাবলুম, দি ঠাস করে সতীশের গালে এক চড় বসিয়ে!

পিশাচ

॥ এক ॥

বাড়িওয়ালা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, এ বাড়িখানা নিয়ে আমি রীতিমতো বিপদে পড়ে গিয়েছি। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা মিথ্যে নয়। এ বাড়িতে গেল তিন মাসের মধ্যে তিনজন লোক মারা পড়েছে! আর সেই তিনটি মৃত্যুই রহস্যময়। এ বাড়িতে আর বোধহয় নতুন ভাড়াটে আসতে রাজি হবে না।'

বিমল বললে, 'ব্যাপারটা আমাদের একটু খুলে বলবেন কি?'

বাড়িওয়ালা বললে, 'ব্যাপারটা এখন সবাই জানতে পেরেছে। সুতরাং আমার আপত্তি নেই।'

কুমার বললে, 'এ বাড়িতে যিনি শেষ-ভাড়াটে ছিলেন, সেই রামময়বাবুর নাম আমরা শুনেছি। উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে তিনি খুব নাম কিনেছেন।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আসবার আগে কিন্তু আমার বাড়ির কোনও দুর্নামই ছিল না। কলকাতার কাছেই যতটা-সম্ভব নির্জনে বসে উদ্ভিদশাস্ত্র আলোচনা করবেন বলেই এই বাড়িখানা তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়ির পিছনকার বাগানে তিনি হরেকরকম দামি গাছ-গাছড়া আনিয়ে নানারকম পরীক্ষা করতেন। পাছে কোনও অভিজ্ঞ লোক তাঁর বাগানে গিয়ে গাছ-গাছড়ার ক্ষতি করে, সেই ভয়ে কারুকে তিনি সেখানে যেতে দিতেন না—এ বিষয়ে তাঁর নিষেধ ছিল খুব স্পষ্ট। কিন্তু মাসতিনেক আগে একদিন সকালবেলায় দেখা গেল, রামময়বাবুর উড়ে বেয়ারাটার মৃতদেহ বাগানের ভিতরে পড়ে রয়েছে! তার সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা কালশিরা—তার দেহকে যেন অনেকগুলো দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। তাঁর গলাতেও ফাঁসির দাগ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য আর ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে, তার দেহের ভিতরে এক ফোঁটাও রক্ত বা রস ছিল না। কে যেন তার শরীরের সমস্ত রক্ত আর রস একেবারে নিংড়ে বার করে নিয়েছিল! পুলিশ এল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের কোনও কিনারাই হয়নি। রামময়বাবু রটিয়ে দিলেন, তাঁর বাগানে ভূত আছে,—কেউ যেন আর তার ত্রিসীমানায় না যায়!'

বিমল বললে, 'তারপর থেকে রামময়বাবুও কি আর বাগানের ভিতরে যেতেন না?'

বাড়িওয়ালা বললে, 'যেতেন বই কি! বাগানের ভিতরেই তাঁর সারা বেলা কেটে যেত। তারপর শুনুন। মাস দেড়েক আগে আর এক সকালে বাগানের ভিতরে আর একটা অচেনা লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পায়, সে হচ্ছে একজন পুরানো দাগি চোর, চুরি করবার মতলবেই এখানে এসে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। সে-হতভাগ্যের গায়েও ছিল তেমনি লম্বা লম্বা কালশিরার ডোরা আর তার দেহের ভিতরেও একফোঁটা রক্ত বা রস ছিল না!'

বিমল খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'তারপর রামময়বাবু কেমন করে খুন হলেন, সেই কথা বলুন।'

বাড়িওয়ালা বললে, 'খুন? না, খুন নয়। হপ্তাখানেক আগে বাড়ির একটি ঘর থেকে রামময়বাবুর মৃতদেহ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন, তাঁকে কেউ হত্যা করেনি, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

কুমার শুধোলে, 'তাঁর দেহেও কি কালশিরার দাগ ছিল? রক্ত আর রস কেউ শোষণ করেছিল?'

বাড়িওয়ালা মাথা নেড়ে বললে, 'মোটেই না, মোটেই না! তাঁর মৃতদেহের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু হুজুগে লোকরা তা বিশ্বাস করবে কেন? রামময়বাবুর মৃত্যু নিয়েও তারা মহা হই-চই লাগিয়ে দিয়েছে!'

বিমল বললে, 'আপনার আর কিছু বলবার নেই?'

—'আছে, তবে সে বিশেষ কিছু নয়। রামময়বাবু মারা পড়বার আগেই, ওই বাগানের ভিতরে প্রায় ইঁদুর, ছুঁচো, প্যাঁচা, বাদুড় আর চামচিকের মরা দেহ পাওয়া যেত। তাদের দেহেও রক্ত কি রস থাকত না!'

বিমল উত্তেজিত ভাবে বললে, 'আপনি যেসব জীবের নাম করলেন তারা সবাই নিশাচর। বাগানে কি মরা-কাক, চিল বা চড়াই পাখি পাওয়া গেছে?'

—'না। ও বাগান সাংঘাতিক হয় রাত্রেই। সন্ধ্যার পর আজকাল ওর আশপাশ দিয়ে কেউ তাই হাঁটিতে চায় না। সকলেরই বিশ্বাস, রাত্রে ওখানে পিশাচের আবির্ভাব হয়। রামময়বাবুর মৃত্যুর পর থেকেই বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। ওখানে আর কেউ বাস করতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

কুমার বললে, 'কিন্তু আমরা যদি ওখানে কিছুদিন বাস করতে চাই?'

বাড়িওয়ালা খানিকক্ষণ বিস্মিত নেত্রে কুমার ও বিমলের মুখের পান তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'তাহলে আমার আপত্তির কোনও কারণই নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, সব কথা শোনবার পরেও ওখানে গিয়ে আপনারা যদি কোনও বিপদে পড়েন, সেজন্যে আমাকে পরে দায়ী করতে পারবেন না। আমি ভাড়া দিই অর্থলাভের জন্যে, নরহত্যার জন্যে নয়।'

বিমল বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের রক্ত শোষণ করে, আজও বোধহয় এমন পিশাচের সৃষ্টি হয়নি। তাহলে এই কথাই রইল। আজ বৈকালেই আমরা ওই বাড়িতে গিয়ে উঠব।'

॥ দুই ॥

বিমল ও কুমার বৈকালের পরে সেই রহস্যময় বাড়িতে এসে উঠল। টালিগঞ্জ থেকে যে-পথটি রিজেন্ট পার্কের পাশ দিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে চলে গিয়েছে, তারই একপাশে এই সঙ্গীহীন বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ধু ধু করছে মাঠ আর শষ্যখেত, মাঝে মাঝে এক-একটা পোড়ো পুকুর বা জলাভূমি অস্তগামী সূর্যকিরণে চক চক করে উঠছে। জায়গাটা নির্জন বটে!

বাড়ির পিছনেই খানিকটা জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এইটেই হচ্ছে রামময়বাবুর বাগান।

বাগানের ঠিক উপরেই দোতলার একটা ঘরে গরম জলে চা মিশাতে মিশাতে বিমল বললে, 'আচ্ছা কুমার, তুমি ভূত-পেত্নী-পিশাচ বিশ্বাস করো?'

কুমার বললে, 'সাধারণ লোকে যখন ভূতের গল্প বলে তখন আমি তা হেসে উড়িয়ে দিই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও যখন ভূতপ্রেত নিয়ে মাথা ঘামান, তখন তা আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না বটে, কিন্তু বিশ্বাসও করতে প্রবৃত্তি হয় না।'

বিমল বললে, 'পিশাচরা নাকি মানুষের মতন দেহধারী হলেও মানুষ নয়। অনেক সময়ে প্রেতাত্মারা নাকি মানুষের মৃতদেহের ভিতরে এসে আশ্রয় নেয়। তখন সেই মড়া জ্যান্ত হয়ে জীবিত মানুষদের রক্ত চুষে খায়। লোকের কথা মানতে গেলে বলতে হয়, পাশের ওই বাগানে অমনি কোনও জ্যান্ত মড়া রোজ রাত্রে জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করতে আসে।'

বিমল ও কুমার দুজনেই জানলা দিয়ে বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগান আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বিমল চা ঢেলে একটা পিয়ালা কুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'কিন্তু এই নির্বোধ পিশাচটা রক্তপানের জন্যে আর কি কোনও ভালো জায়গা খুঁজে পেলে না? ওই পাঁচিল-ঘেরা বাগানটুকুর ভিতরে ক-টা জীবই বা আসতে পারে?'

সামনের টেবিলের উপরে এক চাপড় বসিয়ে দিয়ে কুমার বলে উঠল, 'ঠিক! বাগানের বাইরে এত বড়ো বড়ো জীব থাকতে সে এখানে বসে অপেক্ষা করবে কেন?'

বিমল হেসে বললে, 'হ্যাঁ, তবে যদি বলো, এই পিশাচটি অত্যন্ত বিলাসী, কবির মতো, ফুলের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে, তাহলে—'

কুমার বাধা দিয়ে বললে, 'আমি ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমার মত হচ্ছে, এখানে পিশাচ-টিশাচ কিছুই আসে না!'

বিমল মৌনমুখে চা পান করতে লাগল। কুমারও আর কিছু বললে না।

চারিদিকে সন্ধ্যার নীরবতা ক্রমেই বেশি ঘনিয়ে উঠছে.....

আচম্বিতে পাশের ঘরে একটা শব্দ হল—কে যেন কী-একটা মাটির উপরে ফেলে দিলে!

বিমল ও কুমার দুজনেই চমকে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর দ্রুতপদে পাশের ঘরে ছুটে গেল।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে একটা মস্ত বিড়াল।

বিমল হাস্যমুখে গর্জন করে বললে, 'তবে রে দুরাত্মা পিশাচ! এমন করে আমাদের ভয় দেখানো? রোস তো!'

বিড়ালটা প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে জানলা-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল!

কিন্তু তার কয়েক সেকেন্ড পরেই বাগানের ভিতর থেকে একটা বিড়ালের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক আর্তনাদ জেগে উঠল—মাত্র একবার! তারপরেই সব চুপচাপ!

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বাগানে গিয়ে বিড়ালটা অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন?'

কুমার দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললে, 'দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি!'

বিমল তাড়াতাড়ি বললে, 'খবরদার! যা দেখবার, কাল সকালে দেখলেই চলবে। মনে রেখো, রাত্রে ও-বাগান বিপজ্জনক।'

—'কী বিমল, তুমি ভয় পেলে নাকি?'

—'না ভাই, একে ভয় বলে না। এ হচ্ছে সাবধানতা। সকালে আগে বাগানটা দেখি, তারপর ওখানে রাত্রিবাস করব।'

॥ তিন ॥

রামময়বাবুর বাগান সাধারণ লোকের কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হবে না। কারণ সকলে যেসব বিখ্যাত ফুলগাছকে আদর করে, তাদের কোনওটাই সেখানে নেই।

কিন্তু সেখানে যেসব গাছ-গাছড়া রয়েছে, তার অনেকেরই পরিচয় বিমল ও কুমার জানে না। ফার্ন, পাতাবাহার, ঝাউ, ক্যাকটাস ও পাম জাতীয় এমন অনেক গাছ সেখানে রয়েছে, বাংলা দেশে যাদের দেখা মিলে না।

একদিকে রয়েছে অনেকরকম অর্কিড।

বিমল বললে, 'কুমার, তোমার-আমারও তো বাগানের শখ আছে, কিন্তু এ-রকম অর্কিড কখনও দেখেছ কি?'

কুমার বললে, 'না। এগুলো বোধহয় ভারতবর্ষের অর্কিড নয়।'

বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'বাঃ, বাঃ, কী চমৎকার! দ্যাখো কুমার, দ্যাখো! আর সব অর্কিডের মাঝখানে, বাঁধানো বেদির উপরে যে প্রকাণ্ড অর্কিডটা রয়েছে! অর্কিড যে অত বড়ো আর তার ফুল যে এমন অদ্ভুত হয়, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতুম না। গাঢ় বেগুনি ফুল আর তার প্রত্যেক পাপড়ির মুখ থেকে যেন টকটকে রক্ত ঝরে পড়ছে! রক্তমুখো অর্কিড-ফুল!'

কুমার সেইদিকে এগিয়ে গিয়েই বলে উঠল, 'বিমল, শিগগির এদিকে এসো!'

বিমল কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, কালকের সেই বিড়ালটার মৃতদেহ সেইখানে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে!

দুজনে অবাক হয়ে অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'তাহলে কাল আমরা এই বিড়ালটারই মরণের কান্না শুনেছি! কে একে বধ করলে? কোন অজানা বিভীষিকা এই বাগানে বাস করে? আজ রাত্রে তা বোঝবার চেষ্টা করব!'

॥ চার ॥

পেট্রলের একটা চারশো-বাতি লণ্ঠন ও দুটো বন্দুক নিয়ে বিমল ও কুমার সন্ধ্যার পর বাগানে এসে বসল।

খানিক আলোয় খানিক কালোয় বাগানের বিচিত্র গাছগুলোকে আরও অদ্ভুত দেখাতে লাগল।

বাড়িওয়ালা সত্য কথাই বলেছিল, সন্ধ্যার পরে ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। কারণ দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরেও আশপাশ থেকে তারা কোনও মানুষেরই সাড়া পেলে না। তাদের মনে হল, এ যেন সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই, কেবল অভিশপ্তরাই এখানে বাস করতে পারে।

দু-তিনটে প্যাঁচা ও বাদুড় শূন্যকে শব্দিত করে কোথায় উড়ে গেল। বিমল ও কুমার দুজনেই তাদের উড়ন্ত দেহের দিকে মুখ তুলে দেখলে—হয়তো তারা আশা করেছিল যে, এখনই কোনও অজ্ঞাত শত্রু তাদের দেহ ধরে বাগানের জমিতে পেড়ে ফেলবে!

বিমল বললে, 'কুমার, একটা চমৎকার মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ কি?'

—'পাচ্ছি। কিন্তু এ বাগানে সকালে কোনও ফুলও দেখিনি, কোনও সুগন্ধও পাইনি।'

—'হয়তো এ ফুল রাত্রে ফোটে। আমার যেন মনে হচ্ছে, সুগন্ধ আসছে ওই অর্কিডগুলোর দিক থেকেই।'

—'আচ্ছা, আমি দেখে আসছি'—এই বলে কুমার উঠে পড়ল।

বিমল দেখলে, কুমার ধীরে ধীরে অর্কিডগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর সেই রক্তমুখো অর্কিডফুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই এক আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমারের দেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে বিষম ছটফট করতে লাগল!

চোখের পলক ফেলবার আগেই বিমল সেখানে গিয়ে হাজির হল এবং কুমারের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা বুঝতে তার বিলম্ব হল না। সে তখনই রিভলভার তুলে অর্কিডগাছটাকে লক্ষ্য করে উপরি উপরি দুইবার গুলিবৃষ্টি করলে, তারপর মাটি থেকে কুমারের বন্দুকটা নিয়ে আরও দু-বার ছোড়বার পরেই রক্তমুখো ফুলসুদ্ধ অর্কিড-গাছটা দু-খানা হয়ে ভেঙে পড়ল!

কুমার তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার সারা দেহ জড়িয়ে অনেকগুলো লম্বা শুয়া বা দাড়া থর থর করে কাঁপছে! বিমল তাড়াতাড়ি ছুরি বার করে সেইগুলো কাটিতে বসল!

॥ পাঁচ ॥

কুমারের জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু তার সর্বাঙ্গ তখন ফোড়ার মতন টাটিয়ে রয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে বিমল বললে, 'আসল ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল। কেতাবে পড়েছিলুম, দক্ষিণ আমেরিকা ও আরও কোনও কোনও দেশে এমন কোনও কোনও জাতের অর্কিড পাওয়া যায়, যারা জীবজন্তুর রক্তশোষণ করতে পারে। উদ্ভিদশাস্ত্রে পণ্ডিত রামময়বাবু ওই-রকম এক মারাত্মক অর্কিড এনে এখানে পালন করছিলেন। দিনে সে নিরাপদ ছিল, কিন্তু রাত্রে তার ফুলে গন্ধ জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রক্তপান করতে চাইত! তখন গন্ধ ছড়িয়ে নানা জীবজন্তুকে কাছে আকর্ষণ করে এই পিশাচ অর্কিড অক্টোপাসের মতন শুয়া দিয়ে তাদের আক্রমণ করত!'

ভীমেডাকাতের বট

॥ এক ॥

বড়োদিনের ছুটিতে আমাদের বন্ধু অসিতের দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

বৈকালে শশা, নারিকেল, মুড়ি ও ফুলুরির থালা এবং চায়ের পিয়ালা টেবিলে সাজিয়ে নিয়ে বসে আমরা সবাই মিলে গল্প করছিলুম।

অসিত বিনয় জানিয়ে বললে, 'পাড়াগেঁয়ে 'লাইট রিফ্রেশমেন্টে' হয়তো পেট ভরলেও তোমাদের মন ভরবে না। কিন্তু কী করব ভাই, এখানে পেলিটি কি ভীম নাগের কোনও আত্মীয়ই বাস করে না।'

পরিতোষ টপ করে একখানা মস্তবড়ো কপির ফুলুরি মুখের গর্তে ফেলে দিয়ে বললে,

'বহুত-আচ্ছা! কলকাতায় যা পাওয়া যায়, পাড়াগাঁয়ে এসে আমরা তা চাই না। কিন্তু অসিতভায়া, তুমি বোধহয় ভুলে গিয়েছ যে, আমি দুনিয়ার আলো দেখেছি সেই পূর্ব-বাংলায়, যেখানে কাঁচালঙ্কাকে মনে করা হয় মুড়ি-ফুলুরির অলংকারের মতন। তুমি কাঁচালঙ্কাকে 'বয়কট' করেছ কেন?'

প্রিয়নাথ বললে, 'যেহেতু আমরা বাঙাল নই।'

এবারে একখানা পেঁয়াজির বড়াকে চোখের নিমিষে উড়িয়ে দিয়ে পরিতোষ বললে, 'তোমরা বাঙাল নও, কিন্তু তোমরা হচ্ছ বিখ্যাত ঘটিচোর। তাই লাল কাঁচালঙ্কা দেখলে লাল-পাগড়ির কথা মনে করে ভয়ে তোমাদের বুক কাঁপে।'

শ্রীপতি দুই হাত আন্দোলন করে বললে, 'বাঙাল আর ঘটিচোর! তোমরা দুজনেই ক্ষান্ত হও! অকারণে গৃহবিবাদে দরকার নেই! তার চেয়ে অসিতের মুখ থেকে শোনা যাক, তার দেশে দ্রষ্টব্য আছে কী কী?'

অসিত বললে, 'এখানকার ধোঁয়া-ধুলোহীন আকাশ, মোটরের উৎপাতহীন মেঠোপথ, আর জনতার-চিৎকারহীন প্রান্তরের মধ্যে তোমরা হয়তো দ্রষ্টব্য কিছুই খুঁজে পাবে না। তবে আমাদের খঞ্জনা নদীর ধারে গেলে তোমরা অনেক হাঁস শিকার করতে পারবে। ঘুঘু, 'স্নাইপ' আর চকাও পাওয়া যায়।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আমি হচ্ছি বৈষ্ণবকুলতিলক। জীবহিংসা আমার পক্ষে মহাপাপ!'

পরিতোষ বললে, 'তুমি হচ্ছ ভণ্ড দি গ্রেট। আমাদের দলে তোমার চেয়ে মুরগিখোর আর কেউ নেই।'

প্রিয়নাথ বললে, 'হতে পারে। মুরগি ভক্ষণ করা আর নিধন করা এক কথা নয়।'

শ্রীপতি বললে, 'আহা হা, আবার বাক্যযুদ্ধ কেন? প্রিয়নাথ কেন শিকারে যেতে চায় না, আমি তা জানি। বন্দুকের শব্দ শুনলে তার পেটের অসুখ হয়। কিন্তু সে কথা যাক। কী বলছিলে অসিত! এখানে দেখবার জায়গা কিছুই নেই?'

অসিত একটু ভেবে বললে, 'দ্যাখো, এখানে একটি দেখবার বিষয় আছে বটে, কিন্তু তোমরা সেটাকে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে!'

আমি বললুম, 'কেন?'

—'তোমরা হয়তো বলবে, সেটা মোটেই দ্রষ্টব্য নয়।'

—'তবু সেটা কী শুনতে ইচ্ছা করি।'

—'ভীমেডাকাতের বটগাছ।'

—'বটগাছ তো পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু এ বটগাছের নামটা 'ইন্টারেস্টিং' বটে!'

—'এর কাহিনিও কেবল 'ইন্টারেস্টিং' নয়, 'থ্রিলিং'!'

পরিতোষ বললে, 'আরও দু-ডজন ফুলুরির 'অর্ডার' দিয়ে কাহিনিটা তুমি আমাদের কাছে বলতে পারো।'

—'তথাস্তু।'

॥ দুই ॥

অসিত বলতে লাগল:

'নবাবি আমলের পর বাংলা দেশে তখন ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়েছে। খালি ইংরেজ নয়, দেশ জুড়ে তখন ঠগি, ডাকাত আর বোম্বেটারাও রাজত্ব আরম্ভ করেছে। দূর-দেশে যেতে হলে লোকে তখন প্রাণ হাতে করে পথে বেরোয়।

সেই সময়েই এ অঞ্চলে ভীমেডাকাতের নামে সবাই হত থরহরি কম্পমান! তোমরা সবাই নিশ্চয় বিশেডাকাতের নাম শুনেছ? বিশে ছিল অত্যাচারী ধনীর যম, কিন্তু গরিবের মা-বাপ। তাকে অনায়াসেই বিলিতি ডাকাত রবিনহুডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ডাকাত হলেও বিশের মধ্যে উদার মনুষ্যত্বের অভাব ছিল না।

কিন্তু ভীমেডাকাত ছিল সম্পূর্ণ উলটো-ধরনের মানুষ। গরিব বা ধনী কারুকেই সে ছেড়ে দিত না। কেবল ডাকাতি নয়, নরহত্যাতেও ছিল তার উৎকট আনন্দ! শোনা যায়, দু-এক আনা পয়সার জন্যেও সে অগুনতি মানুষ খুন করেছে। সাধারণ ডাকাতরা টাকা পেলে মিছামিছি খুন-খারাপি করে না। ভীমে কিন্তু আগে করত খুন, তারপর নিত টাকাকড়ি। যে কালীকে পুজো করে ভীমে ডাকাতি করতে বেরুত, সেই কালীমূর্তির গলায় আর কোমরে সে পরিয়ে দিয়েছিল আসল নরমুণ্ড ও কঙ্কালের মালা। কালীঠাকুরের হাতে সে নাকি প্রতি রাত্রেই নিত্য-নতুন মানুষের রক্তমাখা কাঁচা মাথা ঝুলিয়ে দিত। বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দিরে সেই ডাকাতে-কালী আজও বিরাজ করছেন, কিন্তু তাঁর ভীষণ অলংকারগুলো অনেকদিন আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে।

ভীমের চেহারাও ছিল নাকি ভয়াবহ। তার মতন লম্বা-চওড়া লোক কেউ কখনও দেখেনি, আর তার রংও ছিল মিশমিশে কালো। সেই কালো মুখে তার টকটকে লাল চোখদুটো জ্বলত আগুনের ভাঁটার মতন। তার মূর্তি দেখলেই লোকে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ত।

ভীমেডাকাতের অত্যাচারে এঅঞ্চলে লোক-চলাচল যখন বন্ধ হয়ে গেল, অনেকেই যখন দেশ ছেড়ে দেশান্তরে পালাতে লাগল, তখন এক সায়েব এল সেপাইদের নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে।

কয়েক মাস ধরে বহু চেষ্টার পর ভীমের দলের কয়েকজন ধরা পড়ল বটে, কিন্তু ভীমের পাত্তা পাওয়া ভার। বিপদ দেখলেই সে তার 'রণ-পা'-এ চেপে হাওয়ার আগে উধাও হয়ে যেত। 'রণ-পা' কী জানো? দুটো লম্বা বাঁশের লাঠি, তাতে আছে পা রাখবার জায়গা। এই রণ-পা ছিল বাংলার সেকেলে ডাকাতদের ভারী-আদরের বস্তু, কারণ তার উপরে চড়ে তারা এক রাত্রেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পথ অনায়াসেই পার হয়ে যেতে পারত। 'রণ-পা'য়ে উঠে ভীমে যে কোথায় সরে পড়ত, তার খোঁজ আর কেউ পেত না।

কিন্তু সাহেব ছিলেন মহা বুদ্ধিমান। একদিন ভীমে সদলবলে এক গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়েছে, এমন সময়ে সায়েবও সেখানে এসে পড়লেন সদলবলে। সেপাইরা বন্দুক ছুড়লে, জনকয়েক ডাকাত মরল বা জখম হল, বেগতিক দেখে ভীমে 'রণ-পা'-এ চড়ে লম্বা দিলে,

সায়েবও এবারে ঘোড়ায় চেপে তার পিছু নিলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না যেতেই সায়েবের ঘোড়া গেল ভীমের 'রণ-পা'র কাছে হেরে। খানিক পরেই ভীমেডাকাতের টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না।

কিন্তু সায়েবের চোখ বড়ো সাফ। তিনি দেখলেন, ধূলিধূসরিত পথের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে ভীমের 'রণ-পা'র দীর্ঘ রেখা! সেই চিহ্ন ধরে তিনি এগুতে লাগলেন! মাইল চার পরে 'রণ-পা'র চিহ্ন যেখানে শেষ হল, সেখানে দেখা গেল যুগযুগান্তরের পুরানো বিপুল এক বুড়ো বটগাছকে! ততবড়ো বটগাছ দেখা যায় না, তার গুঁড়ির বেড় প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাত। সেই গুঁড়ি আর শত শত ঝুরির উপরে ভর দিয়ে এই একটিমাত্র বটগাছ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছোটোখাটো অরণ্যের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মোটা মোটা প্রত্যেক ঝুরি এক-একটা আলাদা গাছের গুঁড়ির মতন শিকড় গেড়েছে মাটির ভিতরে।

সায়েব আন্দাজ করলেন, ভীমে নিশ্চয় এই মস্ত গাছে চড়ে ঘন ডাল-পাতার আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে। পিঠে বন্দুক বেঁধে তিনিও গাছে উঠলেন। কিন্তু বহুক্ষণ এ-ডালে ও-ডালে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ভীমকে পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে সাহেব যখন মাটিতে নেমে পড়বার জোগাড় করছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল, বটের গুঁড়ির উপর দিয়ে ধোঁয়ার চক্র বেরিয়ে আসছে!

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সায়েব আরও-উপরে উঠে উঁকি মেরে দেখেন, বটের প্রকাণ্ড গুঁড়িটা একেবারে ফাঁপা, আর তার ভিতরে পরম আরামে বসে ভীমেডাকাত আপন মনে হুঁকোয় দম মারছে!

তামাকখোর ভীমে সে-যাত্রা আর রক্ষা পেলে না। এক ছিলিম তামাকের লোভেই সে নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিলে। সেই বটগাছেরই এক ডালে তাকে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মরবার সময়েও সে ভয় পেলে না। দম্ভ করে বললে, 'সায়েব, আমি আমার এ আস্তানা ছেড়ে নড়ব না! ভূত হয়ে এখানেই রাজত্ব করব, এখানে যে আসবে সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না!'

সেই ফাঁপা বটগাছই আজ 'ভীমেডাকাতের বট' নামে বিখ্যাত। শত শত ঝুরির শিকড় দিয়ে রস টেনে সে কেবল বেঁচেই নেই, আকারে আগেকার চেয়েও আরও বড়ো হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের প্রত্যেকেরই কাছে সে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস হয়ে পড়েছে।

কিন্তু রাতের বেলায় কেউ তার ত্রিসীমানায় যায় না।

ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, ভীমেডাকাতের কথা পরীক্ষা করবার জন্যে, সেকালে কোনও কোনও অতিবড়ো ডানপিটে রাত্রে ওই বটগাছের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ আর ফিরে আসেনি, কোনওরকম চিহ্ন না রেখেই তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আজ আর কেউ ভীমেডাকাতের কথা পরীক্ষা করতে সাহস করে না। সেই বটগাছের চারিদিকের জমি আজ জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। জলাভূমির কাছে জ্যান্ত মানুষের বসবাস নেই, আছে কেবল মড়াদের রাজ্য—অর্থাৎ গোরস্থান।'

অসিতের কাহিনি শেষ হলে পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাহলে তোমাদের বিশ্বাস,

রাত্রে সেই বটগাছের কাছে গেলে আজও ভীমেডাকাতের সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা আছে?'

—'লোকে তো তাই বলে।'

—'বটগাছটা এখান থেকে কত দূরে?'

—'চার মাইল।'

পরিতোষ বিপুল উৎসাহে বলে উঠল, 'আজ দ্বাদশীর চাঁদ উঠবে আকাশে। তারই আলোতে আমরা ভীমেডাকাতের সঙ্গে দেখা করব।'

অসিত বললে, 'কিন্তু—'

শ্রীপতি বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তুর নিকুচি করেছে। আমরা আজ হাতে-নাতে প্রমাণ করতে চাই, সেকেলে গাঁজাখুরি উপকথা কোনওকালেই সত্য হয় না।'

কেবল প্রিয়নাথ আমতা আমতা করে বললে, 'ওই বটগাছটাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু ওই যে গোরস্থানের কথা বললে, ওটা আমার ভালো লাগছে না।'

কিন্তু তার প্রতিবাদ আমরা কেউ আমলেও আনলুম না।

॥ তিন ॥

শীতকালের কুয়াশায় আচ্ছন্ন চাঁদের আলো দেখলেই শনিগ্রস্ত বলে মনে হয়। একেবারে নির্জন পথ, ঝিঁঝির ডাকে শব্দময় ও বুনো পুষ্পপত্রে গন্ধময়। বহুদূর থেকে নিস্তব্ধ রাত্রির বক্ষ ভেদ করে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে চলন্ত রেলগাড়ির আওয়াজ। এ আওয়াজ আগেও অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আজকে শুনে মনে হল, ওই রেলগাড়িতে চড়ে যেন ইহলোকের যাত্রীরা চলেছে পরলোকের দিকে!

বন্ধুদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম। তাদেরও শ্বাস-প্রশ্বাস হয়েছে দ্রুত, কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। মুখে কেউ মানি আর না মানি, আসন্ন কোনও অলৌকিক ভাবের প্রভাবে আমাদের সকলেরই মন আজ মোহগ্রস্ত!

এখানে মানুষের শেষ-আশ্রয় হচ্ছে সরকারি ডাকবাংলো। তাকেও পিছনে ফেলে মাইল-খানেক এগিয়ে গেলুম।

তারপর একদিকে আঙুল দেখিয়ে অসিত চুপি চুপি বললে, 'ওটা হচ্ছে গোরস্থান।'

মৃতের সেই মৌন জগতেও জীবন্ত ঝিঁঝিদের ভাঙা গলার অশ্রান্ত আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কী-একটা কালো জন্তু আমাদের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে একটা উঁচু কবরের আড়ালে পালিয়ে গেল। প্রিয়নাথ ছিল সব-পিছনে, সে এগিয়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তার মুখের ভাব অস্বাভাবিক।

শ্রীপতি বললে, 'কিন্তু সেই বুড়ো বটগাছটা কোথায়?'

অসিত নীরবে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

একটা মস্তবড়ো জলাভূমি দৃষ্টিসীমা জুড়ে ধু ধু করছে এবং তারই উপরে পড়ে হিম্রে

দাঁতের মতন চকচক করে জ্বলছে কুয়াশার আধমরা চাঁদের আলো! জায়গায় জায়গায় কুয়াশা এত ঘন যে, তাকে ঠেলে চোখ চলে না। জলারই একপাশে পাহাড়ের মতন উঁচু প্রকাণ্ড একটা ঢিপির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, শূন্যের অনেকটা পূর্ণ করে বিপুল সেই বটগাছ। কেউ বলে না দিলে আমরা তাকে অরণ্য বলেই ধরে নিতুম। আবছায়ামাখা রহস্যময় জ্যোৎস্নায় বৃদ্ধ বটের ডালপালা শীতার্ত হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং তার তলায় জমে আছে বিরাট ও নিরেট একটানা অন্ধকার।

প্রিয়নাথ অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'ওগুলো কী? ওগুলো? ওই যে, নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে? কী ওগুলো?'

শ্রীপতি বললে, 'আলেয়া।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, যাদের দেখা যায় না তারা ওই জলায় আগুনের ফুটবল নিয়ে 'ওয়াটার-পোলো' খেলছে!'

মনে মনে ভাবছি, এ স্থানটা গোরস্থানের চেয়েও স্তব্ধ, কারণ এখানে ঝিঁঝিরাও ডাকছে না! ঠিক সেই সময় নানা শব্দে চতুর্দিক হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠল! প্রথমে চিৎকার করে উঠল বিকট স্বরে একপাল শেয়াল, তারপরই কোথা থেকে চেঁচাতে লাগল তিন-চারটে প্যাঁচা এবং তারপরই শুনতে পেলুম মাথার উপরে একদল বাদুড়ের ডানার ঝটপট ঝটপট শব্দ—যেন কী দেখে ভয় পেয়ে তারা প্রাণপণে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ সচকিত কণ্ঠে বললে, 'ওহে, এখানে দাঁড়িয়ে মিছামিছি আর হিম লাগিয়ে আর শীতে কেঁপে কী হবে? এবারে ফেরা যাক, আর নয়!'

পরিতোষ ঠাট্টা করে বললে, 'কী হে অসিত, তোমার ভীমেডাকাত কোথায়?'

শ্রীপতি বললে, 'ভীমেডাকাত আজ বোধ হয় নরকের দরজা খোলা পায়নি!'

আচম্বিতে একটা বরফের মতন ঠান্ডা-কনকনে হাওয়ার ঝটিকা উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলেয়াদের দলে যেন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—কাকে দেখে তারা যেন দু-ভাগে ভাগ হয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ কাঁদো কাঁদো গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কুয়াশার একটা মেঘ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! ওর পিছনে কী আছে, কে জানে!'

পরিতোষ চিৎকার করে বললে, 'কোথায় হে ভীমেডাকাত। দয়া করে একবার দেখা দাও!'

সেই মুহূর্তে শুনতে পেলুম, জলার জলে ছপ-ছপ-ছপ-ছপ-ছপ-ছপ করে কীসের শব্দ উঠল।

দুই চোখ পাকিয়ে অসিত ক্ষীণ স্বরে বললে, 'মনে হচ্ছে কে যেন 'রণ-পা'-এ চড়ে জলা পেরিয়ে আমাদের দিকেই আসছে!'

আড়ষ্ট ভাবে অবরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীপতি বললে, 'কোথায় 'রণ-পা'?...কোথায় কে?'—তার স্বরে এখন কিন্তু আর কৌতুকের ভাব ছিল না।

আমি দুর্বল স্বরে বললুম, 'কেবল একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর একখানা ঘন কুয়াশার মেঘ হু হু করে এগিয়ে আসছে।'

প্রিয়নাথ হঠাৎ বিকট ও বিশ্রী এক চিৎকার করে পাগলের মতন দৌড় মারলে। সে অমন ভাবে চেঁচিয়ে না পালালে আমরা কী করতুম জানি না, কিন্তু ভয় হচ্ছে এমন সংক্রামক যে, দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমরাও ছুটতে লাগলুম প্রিয়নাথের সঙ্গে সঙ্গে!

গোরস্থান ছাড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক ছোটবার পর আমরা আবার দাঁড়িয়ে পড়লুম।

পরিতোষ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ঘটি, তুমি হঠাৎ পালিয়ে এমন ভয় দেখালে কেন?'

প্রিয়নাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বাঙাল, তোমাকে তো আমার পিছু নিতে বলিনি, তুমি পালালে কেন?'

পরিতোষ কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত শিউরে উঠে থেমে গিয়ে আবার দৌড় মারবার উপক্রম করলে! আমরাও আড়ষ্ট হয়ে শুনতে পেলুম, আমাদের পিছনে পথের উপরে জেগে উঠেছে, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের খটমট শব্দ!

শ্রীপতি সভয়ে বললে, 'রণ-পা'র শব্দ কি ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতো?'

কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিলে না, কারণ তখন আমরা সকলেই ঘৌড়দৌড়ের ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতবেগে আবার ছুটতে শুরু করেছি! পিছনের শব্দও যত এগিয়ে আসে, আমরাও ততবেশি পা চালাতে থাকি—এ যেন সাক্ষাৎ-মৃত্যুর সঙ্গে ভীরু জীবনের দৌড়ের পাল্লা!

এবারে একেবারে এসে থামলুম ডাকবাংলোর সীমানার মধ্যে! আমাদের দমাদ্দম পদাঘাতে বাংলোর দরজা ভেঙে পড়ে আর কী! রক্ষী দরজা খুলে দিয়ে বিস্মিত স্বরে বললে, 'কী হয়েছে বাবু, কী হয়েছে?'

আমি বললুম, 'কিছু হয়নি। আজ রাত্রে আমরা এখানে থাকব।'

একটা ঘরে ঢুকে যে যেখানে পারলুম হাত-পা এলিয়ে বসে পড়লুম।

বাইরের স্তব্ধ পথের উপরে আবার সেই ভয়াবহ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। বেশ বুঝলুম, শব্দটা বাংলোর সীমানার মধ্যে এসে থামল!

আমার হৃৎপিণ্ড বুকের ভিতরে ছটফট করে লাফাতে লাগল!

রক্ষী আবার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে পরিতোষ ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরে উন্মত্তের মতন বলে উঠল, 'খবরদার, দরজা খুলে দিয়ো না!'

রক্ষী আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দরজা খুলে দেব না কী বাবু? আজ যে এখানে পুলিশ-সায়েবের আসবার কথা আছে!'

॥ চার ॥

ঘোড়া থেকে নেমে পুলিশসায়েবই বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

আমরা বোকা এবং বোবার মতন পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম।

খানিক পরে পরিতোষ বললে, 'ওই কাপুরুষ প্রিয়নাথই যত নষ্টের গোড়া!'

প্রিয়নাথ বললে, 'জলায় যাবার রাস্তা খোলাই আছে। তুমি আবার সেখানে গেলে আমি বারণ করব না।'

অসিত বললে, 'হতে পারে, পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পুলিশসায়েবই আসছিলেন। কিন্তু জলার জলে যে ছপ ছপ করে শব্দ হচ্ছিল, সেটা কীসের শব্দ?'

শ্রীপতি বললে, 'হয়তো কোনও জন্তু সাঁতরে জলা পার হচ্ছিল। আমরা রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি, কাল আমরা আবার এই বটগাছ দেখতে আসব।'

কিন্তু যাঁরা এই কাহিনি শুনছেন তাঁদের কানে কানে আমি জানিয়ে রাখছি যে, পরদিনের সন্ধ্যায় বটগাছ দেখতে আসবার কথা আমরা সকলেই আশ্চর্যরূপে ভুলে গিয়েছিলুম। আজও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই ছপ ছপ শব্দ শুনি আর গলদঘর্ম হয়ে জেগে উঠি! আজও মনে মনে প্রশ্ন জাগে, সে শব্দটা কীসের?

তোমরা কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো?

ডালিয়ার অপমৃত্যু

॥ ক ॥

বিমলের বাড়ির ছাদের উপরে ছোটোখাটো একটি ফুলের বাগান ছিল। সেখানে বছরের নানা সময়ে জুঁই, চামেলি, বেল, হাসনুহানা, গন্ধরাজ ও গোলাপ প্রভৃতি তো ফুটতই, তার উপরে ছোটো-বড়ো কাঠের বাক্সে ও টবেও দেখা যেত নানা-জাতের মরশুমি ফুলের রঙের বাহার।

সেদিন সকালে বিমল বসে বসে কতগুলো চারাগাছের গোড়ায় সার দিচ্ছে, এমন সময়ে কুমারের আবির্ভাব।

মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকিয়েই বিমল বললে, 'কুমার, তোমাকে আজ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

কুমার বললে, 'আমার এক বন্ধু বড়ো বিপদে পড়েছে। তারই কথা ভাবছি।'

—'বন্ধুটি কে? আর বিপদই বা কী?'

—'তাকে তুমিও চেনো। সুবোধ রায়, কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। চুরির দায়ে পড়েছে।'

—'চুরি!'

—'হ্যাঁ। কিন্তু সে চুরি করেনি।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক বলে বোধ হচ্ছে। ঘরের ভিতরে চলো।'

দুজনে ছাদের পাশের ঘরের ভিতরে গিয়ে বসল। রামহরিকে চা তৈরি করতে বলে বিমল ফিরে বললে, 'আচ্ছা ভাই, এখন তোমার বন্ধুর বিপদের কথা বলো।'

কুমার বললে, 'তাহলে গোড়া থেকেই শোনো....সুবোধের দাদামশাই বিপিনবাবু খুব ধনী লোক। কিন্তু তাঁর ছেলে নেই, আছেন কেবল দুই মেয়ে। বড়োমেয়ের এক ছেলে, নাম অনন্ত বসু। সুবোধের মা হচ্ছেন ছোটোমেয়ে। অনন্ত আর সুবোধ দাদামশাইয়ের কাছেই থাকে, কারণ তারাই তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী।

বিপিনবাবু অনেকদিন থেকেই উদরী রোগে ভুগছেন। সম্প্রতি ডাক্তাররা জবাব দিয়ে বলে গেছেন, তিনি আর মাসখানেকের বেশি বাঁচবেন না। কাজেই বিপিনবাবু স্থির করেছেন, আসছে সোমবার তিনি উইল করে দুই নাতিকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন।

ইতিমধ্যে গেল-কাল রাত্রে বিপিনবাবুর লোহার সিন্ধুক থেকে একসুট মুক্তার গহনা অদৃশ্য হয়েছে! গহনাগুলি ছিল বিপিনবাবুর স্বর্গীয় স্ত্রীর—অর্থাৎ সুবোধের দিদিমার। তাদের দাম হবে নাকি পঁচিশ হাজার টাকা।

ইনস্পেকটার সদানন্দবাবুকে তুমি তো চেনো? এই মামলার ভার পড়েছে তাঁরই উপরে। তিনি সন্দেহ করছেন সুবোধকে।'

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, 'সন্দেহের কারণ?'

'প্রথমত, গেল কাল বিপিনবাবুর রোগশয্যার পাশে বসে রাত কাটিয়েছে সুবোধই। আর সিন্ধুকের চাবি যে তার দাদামশায়ের মাথার বালিশের নীচে ছিল, এ কথা সে জানত। দ্বিতীয়ত, আজ সকালে লোহার সিন্ধুকের তলায় সুবোধের দেরাজ আর টেবিলের চাবি পাওয়া গেছে। পুলিশের মতে, এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।'

—'লোহার সিন্ধুক কি বিপিনবাবুর শয়নগৃহেই থাকত?'

—'না, অন্য ঘরে।'

—'তোমার বন্ধু যখন সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে, তখন উইল হবার ঠিক আগেই বোকার মতন এমন চুরি করবে কেন?'

—'পুলিশ একটা উদ্দেশ্যও আবিষ্কার করেছে। সুবোধ 'শেয়ার মার্কেটে' গিয়ে 'স্পেকুলেশন' করত। ওই কাজে লোকসান হওয়াতে তার বিশ হাজার টাকা দেনা হয়েছে! পুলিশের মতে, সুবোধ চুরি করে ওই দেনা শুধতে চায়।'

—'বিপিনবাবু নিজে কী বলেন?'

—'তিনি রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছেন। সুবোধ যে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।'

—'বিপিনবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তাহলে সুবোধের মাসতুতোভাই অনন্ত?'

—'তা ছাড়া আর কী।'

—'সুবোধের সঙ্গে অনন্তের বেশ বনিবনাও আছে?'

—'হ্যাঁ। সুবোধের এই বিপদে অনন্ত অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। এমনকি আমার সামনেই সে কেঁদে ফেললে।'

—'লোহার সিন্ধুকের ভিতর কেবল কি ওই একসুট মুক্তার গহনা ছিল?'

—'না, ছিল আরও অনেক কিছুই, কিন্তু চোর কেবল ওই মুক্তার গহনাগুলোই সরিয়েছে। এইজন্যেই তো পুলিশ সন্দেহ করছে যে, এ চোর বাহির থেকে আসেনি।'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'দ্যাখো কুমার, গোয়েন্দাগিরি করা আমার কাজ নয়। তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে পারব বলেও মনে হচ্ছে না। তবু চলো, একবার বিপিনবাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।'

॥ খ ॥

বিমল ও কুমার বিপিনবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে, দেউড়িতে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে কুমার একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে, 'সুবোধবাবু কোথায়?'

সে বললে, 'বড়দাদাবাবুর বসবার ঘরে।'

কুমার বললে, 'অনন্তবাবুর বৈঠকখানায়। এসো বিমল!'

উঠোনের পাশের সুদীর্ঘ দালান পার হয়ে কুমারের সঙ্গে বিমল একটি বড়ো ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখলে, সেখানে চারজন লোক বসে আছে। পুলিশইনস্পেকটার সদানন্দবাবু, তাঁর একজন সহকারী, অনন্ত ও সুবোধ।

বিমলকে দেখেই সদানন্দবাবু বলে উঠলেন, 'একী, আপনি যে এখানে! 'অ্যাডভেঞ্চারে'র খোঁজে বুঝি?'

বিমল হেসে বললে, 'যেসব বঙ্গবীর ঘরের কোণে কি চৌকির তলায় 'অ্যাডভেঞ্চার' খোঁজে, আমি তাদের দলে নই। সুবোধবাবুকে অল্পস্বল্প চিনি, কুমারের মুখে তাঁর বিপদের কথা শুনে দেখা করতে এলুম।'

সুবোধ এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে বসেছিল। এখন মৃদুস্বরে বললে, 'বিমলবাবু, চোর অপবাদ হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়াও ভালো ছিল। আমি নির্দোষ!'

অনন্ত ছলছল চোখে বললে, 'সুবোধ আমার ভাই। সে কখনও চোর হতে পারে না।'

সদানন্দবাবুর সামনের টেবিলের উপরে রুমালের খুঁটে বাঁধা কতকগুলো চাবিসুদ্ধ রিং-য়ের দিকে বিমলের চোখ পড়ল। সে বললে, 'ওই চাবিগুলোই কি লোহার সিন্ধুকের তলায় পাওয়া গেছে?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

বিমল চাবি-বাঁধা রুমালখানা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলে। দেখলে, রুমালের এককোণে রেশমি সুতোয় একটি 'এস' অক্ষর বোনা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে, 'সুবোধবাবু, এই রুমাল আর চাবি আপনার?'

ম্লানমুখে সুবোধ বললে, 'হ্যাঁ আজ দু-দিন ওই রুমাল আর চাবি আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

বিমল বললে, 'সদানন্দবাবু, আপনারা আর কোনও সূত্র পেয়েছেন?'

—'এইমাত্র ওই বাগানের ভিতরে একটি মুক্তা-বসানো আংটি কুড়িয়ে পেয়েছি।'

—'মুক্তার আংটি? দেখি!'

সদানন্দবাবু আংটিটি বিমলের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই আংটিটিও চোরাই মালের সঙ্গেই ছিল. চোরের অগোচরে কী করে পড়ে গিয়েছে।'

ঘরের কোলেই দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট একটি বাগান। আংটি থেকে মুখ তুলে বিমল সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে। খানিকক্ষণ পরে বললে, 'দেখছি বাগানে যেতে গেলে এই ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। চোরও তাহলে এই ঘর দিয়েই বাগানে গিয়েছিল?'

অনন্ত বললে, 'অসম্ভব! কাল রাত্রে আমি নিজের হাতে এই ঘর বন্ধ করে শুতে গিয়েছি!'

বিমল সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে, 'আচ্ছা সুবোধবাবু, আপনি কি এসেন্স ভালোবাসেন?'

তার এই অর্থহীন, অসংলগ্ন প্রশ্ন শুনে একটু বিস্মিত স্বরে সুবোধ বললে, 'জীবনে কখনও আমি এসেন্স ব্যবহার করিনি। এসেন্স ভালোবাসেন আমার দাদা!'

—'অনন্তবাবু?'

—অনন্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বেশ, বেশ! কোন গন্ধ আপনি বেশি পছন্দ করেন?'

—'বকুল। কিন্তু কী আশ্চর্য, হঠাৎ আপনি এসেন্সের কথা তুললেন কেন?'

—'মনে হল, তাই জিজ্ঞাসা করলুম! আসুন সদানন্দবাবু, এসো কুমার, আমরা একবার বাগানটাও ঘুরে আসি।'

॥ গ ॥

বাগানটি আকারে তিন কাঠার বেশি হবে না। নানান গাছে নানান রকম ফুল ফুটে রয়েছে। একটি ছোট্ট কৃত্রিম পাহাড় ও ঝরনাও রয়েছে। চারিদিকে মৌমাছি ও প্রজাপতিরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে।

এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে বিমল বললে, 'বাগানটিকে খুব যত্ন করা হয় দেখছি।'

অনন্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই এক শখ নিয়েই আমার সারাদিন কেটে যায়। এ বাগান একা আমিই তৈরি করেছি। এখান থেকে কেউ একটি ফুল ছিঁড়লেও আমার সহ্য হয় না। আমার অগোচরে পাছে কেউ এখানে ঢোকে, সেই ভয়েই বাগানে ঢোকবার দরজা করেছি আমার বৈঠকখানার ভিতরে।'

এক জায়গায় অনেকগুলো ডালিয়াগাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় দুলছিল। বিমল খানিকক্ষণ তাদের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'চমৎকার ফুল ফুটেছে তো!'

অনন্ত গর্বিত স্বরে বললে, 'ফুটবে না, প্রত্যেক গাছটিকে যে আমি যত্ন করি!'

একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিমল বললে, 'কিন্তু এত যত্নেও ও-গাছটি এমন নেতিয়ে পড়েছে কেন?'

অনন্ত বললে, 'বোধহয় শিকড়ে পোকা-টোকা ধরেছে।'

সদানন্দবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'এই কি ফুলগাছ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়? আপনারা পাগল হলেন নাকি?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'সদানন্দবাবু, আপনারা বড়ো বড়ো মামলা করেন, বড়ো বড়ো প্রমাণ দেখেন, বড়ো বড়ো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান! কিন্তু ছোটো ছোটো ব্যাপারকে একেবারে এতটা ঘৃণা করবেন না। গাছের শিকড়ে পোকা-ধরাটা সব সময়ে খুব তুচ্ছ বিষয় না হতেও পারে!'—এই বলেই সে একটানে সেই নেতিয়ে-পড়া ডালিয়াগাছটা মাটি থেকে উপড়ে তুলে ফেললে।

অনন্ত হাঁ হাঁ করে বলে উঠল, 'ছি ছি, কী করলেন!'

বিমল আচম্বিতে সেইখানে বসে পড়ে যেখানে গাছটা ছিল সেখানকার মাটির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটা ক্যাশবাক্স টেনে বার করলে।

কুমার সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'ও কী কাণ্ড!'

বিমল সহাস্যে বললে, 'গাছের গোড়ায় ক্যাশবাক্স আর বাক্সের ভিতরে মুক্তার গহনা! সদানন্দবাবু, এখনই আপনি অনন্তবাবুকে অনায়াসেই হাতকড়ি পরিয়ে থানায় চালান দিতে পারেন!'

॥ ঘ ॥

সদানন্দবাবু বললেন, 'কেমন করে আপনি এত সহজে চোর ধরলেন?'

বিমল বললে, 'ব্যাপারটা খুব সহজ বলেই। গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল অনন্তের উপরে। সুবোধবাবু যদি তাঁর দাদামশাইয়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে লাভ হবে কার? অনন্তের! তাই বিপিনবাবু যেই উইল করতে চাইলেন, অমনি সুবোধবাবুকে চোর সাজানো হল, সুবোধবাবুর নাম-লেখা রুমালে বাঁধা চাবির গোছা পাওয়া গেল, লোহার সিন্দুকের তলায়! দু-দিন পরে যে তার মৃত্যুমুখ মাতামহের অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে, সে যে এমন বোকা বা পাগলের মতন চুরি করে নিজের সর্বনাশ করবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না......সদানন্দবাবু, ওই রুমালে যে বকুলের এসেন্সের মৃদু গন্ধ ছিল, এই সামান্য বিষয়টা আপনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি এটাকে আমার কাজে লাগিয়েছি। এই জন্যেই যখন শুনলুম সুবোধবাবু এসেন্স ব্যবহার করেন না আর অনন্ত বকুলের এসেন্স ভালোবাসে, তখনই বুঝলুম এই চাবিসুদ্ধ রুমালখানা চুরি করে চোর তার যে-পকেটে রেখেছিল সেখানে তার নিজের এসেন্স-মাখানো রুমালও ছিল। এই সামান্য প্রমাণেই জানতে পারলুম, সুবোধবাবু নিরপরাধ। আপনার মুখে শুনলুম, বাগানে চোরাই মুক্তার আংটি পাওয়া গেছে; অনন্তের মুখে শুনলুম, এ বাগান তার নিজের, আর ঘটনার সময়ে বাগানে যাবার পথ ছিল বন্ধ,—অর্থাৎ সে ভিন্ন আর কেউ এখানে আসতে পারত না। তখনই মনে প্রশ্ন জাগল, তবে এ বাগানে চোরাই মাল পাওয়া গেল কেমন করে? নিশ্চয়ই সে চোরাই মাল নিয়ে বাগানে এসেছিল, আর সেই সময়ে কোনও-গতিকে আংটিটা বাইরে পড়ে গিয়েছিল! বাগানে চোরাই মাল নিয়ে আসবার কারণ কী? চোর নিশ্চয়ই মাল লুকোবার জন্যে ওখানে গিয়েছিল। তার পরের প্রশ্ন—মালগুলো কোথায় লুকানো হয়েছে? আমি লক্ষ করে দেখলুম,

বাগানের সব ফুলের গাছই সতেজ আর সজীব, কেবল একটি পরিপুষ্ট ডালিয়াগাছ অসম্ভবরকম নেতিয়ে পড়েছে! তখনই আমার মন বললে, গাছের গোড়ায় কোনও সন্দেহজনক গলদ আছে! অনন্ত বুদ্ধি খাটিয়েছিল যথেষ্ট! সে ভেবেছিল যে, ডালিয়াগাছের গোড়া খুঁড়ে চোরাই মাল পুঁতে রাখলে কেউ আর কোনও সন্ধান পাবে না। কিন্তু শিকড়ে চোট লেগে গাছটি যে মরো মরো হবে, আর তাই দেখে কারুর মনে যে সন্দেহ হবে, এতটা সে আন্দাজ করতে পারেনি! হায় হায় সদানন্দবাবু, চোরের পাল্লায় পড়ে এমন সুন্দর একটি ডালিয়াগাছ যে অপঘাতে মারা পড়ল, এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কেন না ফুলকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি।...চলো কুমার, আর আমাদের এখানে থাকবার দরকার নেই!'

বিমল ও কুমার বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সদানন্দবাবু চমৎকৃত কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য লোক এই বিমলবাবু! জুলিয়াস সিজারের মতন উনিও অনায়াসে বলতে পারেন, Veni, vidi, vici—আমি এলুম, আমি দেখলুম, আমি জয় করলুম!' যেন তাক লাগিয়ে দিয়ে গেল হে!'

অগাধ জলের রুই-কাতলা

॥ এক ॥

টেলিফোনের রিসিভারটা ধরে বিমল বললে, 'হ্যালো! কে? সুন্দরবাবু? নমস্কার মশাই, নমস্কার। কী বলছেন? আমাদের দরকার? কেন বলুন দেখি? পরামর্শ করবেন? কীসের পরামর্শ? রহস্যময় হত্যাকাণ্ড, আসামি নিরুদ্দেশ? কিন্তু সেজন্যে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কী হবে বলুন, আমরা তো ডিটেকটিভ নই। আপনার ডিটেকটিভবন্ধু জয়ন্তবাবুর কাছে যান না! তিনি অন্য একটা মামলা নিয়ে কলকাতার বাহিরে গিয়েছেন? ও! আচ্ছা, আসতে ইচ্ছে করেন, আসুন,—কিন্তু আমরা বোধহয় আপনার কোনও কাজেই লাগব না, কারণ গোয়েন্দাগিরিতে আমরা হচ্ছি নিতান্ত গোলা ব্যক্তি, কিছুই জানি না বললেও চলে। কী বলছেন? আমাদের ওপরে আপনার গভীর বিশ্বাস? ধন্যবাদ!.......এখানে এসে চা খাবেন? বেশ তো। গোটা-দুয়েক 'এগপোচ' পেলেও খুশি হবেন? চারটে 'পোচ' পেলেও আপত্তি করবেন না? তথাস্তু!' রিসিভারটা রেখে দিয়ে বিমল ফিরে বললে, 'বাঘা, রামহরিকে ডেকে আন তো!'

বাঘা তখন উপরদিকে মুখ তুলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ভাবছিল, দেয়ালের গা থেকে ওই টিকটিকিটাকে কী উপায়ে টেনে নীচে নামানো যায়। বিমলের ফরমাজ শুনে সে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মানুষের ছোটো ছোটো কোনও কোনও কথা কুকুর হলেও বাঘা বুঝতে পারত। যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁরাই এ কথা জানেন।

একটু পরেই বাহির থেকে রামহরির গলা পাওয়া গেল—'ছাড় ছাড়! ওরে হতচ্ছাড়া, কাপড় যে ছিঁড়ে যাবে, এমন ছিনেজোঁক ধড়িবাজ কুকুর তো কখনও দেখিনি!' তার পরেই

দেখা গেল, রামহরির কোঁচার খুঁট কামড়ে ধরে বাঘা তাকে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে এনে হাজির করলে।

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমিই বুঝি বাঘাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ?'

বিমল হেসে বললে, 'লেলিয়ে দিইনি, তোমাকে ডেকে আনতে বলেছি। শোনো রামহরি, মিনিট-দশেকের মধ্যেই ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু এখানে এসে পড়বেন, তিনি তোমার হাতে তৈরি চা আর 'এগ্‌পোচের' পরম ভক্ত। অতএব, বুঝেছ?'

রামহরি ঘাড় নেড়ে বললে, 'সব বুঝেছি।'

কুমার ঘরের এক কোণে বসে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। মুখ তুলে বললে, 'আর বুঝেছ রামহরি, আমাদেরও পেটে যে খিদে নেই, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না।'

রামহরি বললে, 'সব বুঝেছি। তোমরা দুটিতে যে বাঘার মতোই পেটুক, আমি তা খুব জানি। খাবারের নাম শুনলেই তোমাদের খিদে পায়।'

কুমার বললে, 'খাবারের নাম তো দূরের কথা রামহরি, তোমার নাম শুনলেই আমাদের খিদের ঘুম ভেঙে যায়? বুঝেছ?'

—'সব বুঝেছি। ভয় হয়, এইবারে কোনদিন হয়তো আমাকেই গপ করে গিলে ফেলতে চাইবে'—বলতে বলতে রামহরি বেরিয়ে গেল।

বিমল বললে, 'কুমার, সেই 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্নের'* মামলার পর থেকেই আমাদের উপরে সুন্দরবাবুর বিশ্বাস খুব প্রবল হয়ে উঠেছে দেখছি। কী একটা হত্যাকাণ্ড তদ্বির করার ভার পড়েছে তাঁর উপরে, তাই নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছেন।'

কুমার বললে, 'হত্যাকাণ্ডটা নিশ্চয়ই রহস্যময়, নইলে পরামর্শের দরকার হত না।'

অল্পক্ষণ পরেই মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ শুনে বিমল পথের ধারের জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, গাড়ির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করছে সুন্দরবাবুর কাঁসার রেকাবির মতো তেলা টাক এবং ধামার মতন মস্ত ভুঁড়ি।

বিমল হাঁকলে, 'রামহরি, অতিথি দ্বারদেশে, তুমি প্রস্তুত হও।'

॥ দুই ॥

টেবিলের উপরে তখনও চা এবং খাবারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল।

বিমল সোফার উপরে ভালো করে বসে বললে, 'সুন্দরবাবু, এইবারে আপনার হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুরু করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তাহলে শুনুন। যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম মোহনলাল বিশ্বাস। লোকটি খুব ধনী, আর তাঁর বয়স যাটের কম নয়। তিনি নিজের বাড়িতে একলাই বাস করতেন, কারণ তাঁর স্ত্রী-পুত্র কেউ আর বেঁচে নেই। আত্মীয়ের মধ্যে আছেন কেবল এক ভাগিনেয়, তিনিই বর্তমানে তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী, তাঁর নাম ভূপতিবাবু। কিন্তু

*হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড দেখুন।

তিনিও মোহনবাবুর বাড়িতে থাকেন না। তার প্রথম কারণ ভূপতিবাবু বেড়াতে আর শিকার করতে ভালোবাসেন বলে আজ তিন বৎসর ধরে ভারতের বাইরে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কলকাতায় ভূপতিবাবুরও নিজের বাড়ি আছে। মোহনবাবুর বাড়ির পিছনেই একটি ষাট-সত্তর গজ লম্বা বাগান, তারপরেই একটি ছোটো রাস্তার উপরে ভূপতিবাবুর বাড়ি।

'মাসখানেক আগে মোহনবাবু নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়ে যে, ভূপতিবাবুও খবর পেয়ে বিদেশ থেকে চলে আসেন। তিনি তখন রেঙ্গুনে ছিলেন।

'তারপর কিন্তু মোহনবাবুর অবস্থা আবার ভালোর দিকে ফিরতে থাকে। ডাক্তারদের মতে, ভূপতিবাবুর আশ্চর্য সেবা-শুশ্রূষার গুণেই মোহনবাবুর অবস্থা হয় আবার উন্নত।

'কিন্তু তবু যম তাঁকে ছাড়লে না, তাঁর কাল ফুরিয়েছিল। পরশুদিন দুপুরবেলায় মোহনবাবু দোতলার ঘরে বিছানার উপরে আধ-শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঘরের ভিতরে আর কেউ ছিল না।

'পাশের ঘরে ছিল 'নার্স'। মোহনবাবুর ঘরে ঢুকবার দরজা আছে একটিমাত্র। সেই দরজার সামনেই বারান্দার উপরে মাদুর বিছিয়ে বিশ্রাম করছিল বাড়ির পুরানো চাকর চন্দর। তাকে এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে কোনও লোকের ঘরের ভিতরে ঢোকবার উপায় ছিল না। সে ছেলেবেলা থেকে এই বাড়িতেই কাজ করছে। চন্দর এত বিশ্বাসী লোক যে, সকল রকম সন্দেহের অতীত।

'ভূপতিবাবু তখন আহার ও বিশ্রাম করবার জন্যে নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় ছিল দারোয়ান। সে বলে, বাহির থেকে কোনও লোক বাড়ির ভিতরে ঢোকেনি। চন্দর বলে, সে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল, বারান্দা দিয়ে কোনও লোক তাকে পেরিয়ে ঘরের ভিতরে যায়নি।

'বেলা তখন দেড়টা। ঘরের ভিতর থেকে মোহনবাবু হঠাৎ উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন।

'সেই চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে 'নার্স' ছুটে এল। চন্দরও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। তারপর তারা দুজনেই একসঙ্গে দরজা ঠেলে মোহনবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

'মোহনবাবুর মুখ দিয়ে তখন ফেনা উঠছে, আর গলা দিয়ে বেরুচ্ছে গোঁ গোঁ আওয়াজ। দেখতে দেখতে তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

'নার্স, ও চন্দর দুজনেই নিশ্চিতভাবে বলেছে, ঘরের ভিতরে মোহনবাবু ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

'খবর পেয়ে ভূপতিবাবু ও-বাড়ি থেকে ছুটে এলেন। তখনই ডাক্তারও এসে পড়লেন। কিন্তু তাঁর সামনেই অল্পক্ষণ পরে মোহনবাবুর মৃত্যু হল। ডাক্তারের মতে, মৃত্যুর কারণ হচ্ছে কোনও রকম তীব্র বিষ।

'অকারণে বিষের সৃষ্টি হয় না। মোহনবাবুর কাঁধের উপরে বিদ্ধ হয়ে ছিল অদ্ভুত একটি অস্ত্র। এমন অস্ত্র আমি জীবনে দেখিনি। এটা যে বিষাক্ত, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। এই দেখুন'—বলে সুন্দরবাবু মোড়কের ভিতর থেকে খুব সন্তর্পণে কাঠির মতন একটি জিনিস বার করলেন।

বিমল সাগ্রহে সেটিকে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। লম্বায় সেটি এক বিঘৎ। চওড়ায় নরুণের চেয়ে মোটা নয়। তার মুখটা তীক্ষ্ণ, আর এক দিকে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটি সোলার চোঙা বা নল বসানো।

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, এই কাঠিটি কোন কাঠ দিয়ে তৈরি, বুঝতে পেরেছেন?'

—'হুম, না।'

—'সাগুকাঠ দিয়ে।'

—'কাঠ-ফাট নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমাদের এখন জানা দরকার, ওই বিষাক্ত কাঠের সূচ দিয়ে মোহনবাবুকে আঘাত করলে কে? অস্ত্রটা তো আর আকাশ থেকে খসে পড়েনি?'

কুমার বললে, 'কার উপরে আপনার সন্দেহ হয়?'

—'কপাল-দোষে সন্দেহ করবার কোনও লোকই পাচ্ছি না। ঘরের আশেপাশে হাজির ছিল কেবল দুজন লোক—'নার্স' আর চন্দর। কিন্তু মোহনবাবুকে খুন করবে তারা কোন উদ্দেশ্যে? মোহনবাবুর ঘরের ভিতর থেকে টাকা বা কোনও দামি জিনিসও চুরি যায়নি। তাঁর মৃত্যুতে তাদের কোনওই লাভ নেই, বরং লোকসান আছে। মোহনবাবুর মৃত্যুর জন্যে লাভ হবে খালি ভূপতিবাবুর। কারণ তিনিই তাঁর বিশ লাখ টাকা দামের সম্পত্তির মালিক হবেন। কিন্তু তাঁর উপরেও সন্দেহ করবার উপায় নেই। কারণ প্রথমত, ঘটনার সময়ে তিনি যে নিজের বাড়িতেই ছিলেন এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে এ বাড়িতে আর চন্দরের চোখ এড়িয়ে মোহনবাবুর ঘরে ঢোকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয়ত, তিনি যদি মোহনবাবুর মৃত্যু চাইতেন, তবে সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে 'নিউমোনিয়া'র কবল থেকে উদ্ধার করতেন না। চতুর্থত, মোহনবাবুর মৃত্যুতে তিনি এমন কাতর হয়ে পড়েছেন যে তা আর বলা যায় না। হুম, ভালো কথা। এটা আপনাকে এখনও বলা হয়নি! ভূপতিবাবু অঙ্গীকার করেছেন, মোহনবাবুর হত্যাকারীকে যে ধরে দিতে পারবে, তাকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন!'

বিমল বললে, 'বলেন কী, বি-শ হা-জার টা-কা!'

—'হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো মামলাটা নিয়ে এতবেশি মাথা ঘামাচ্ছি। কিন্তু হায় রে, ব্যাপার যা দেখছি, হত্যাকারীর নাগাল পাওয়া একরকম অসম্ভব বললেও চলে। হুম, আমার কপাল বড়ো মন্দ!'

বিমল খানিকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সাগুকাঠের সেই কাঠিটির দিকে। তারপর সে বললে, 'বিশ হাজার টাকা পুরস্কার! এ লোভ সামলানো শক্ত। আচ্ছা সুন্দরবাবু, এ বিষয় নিয়ে আমি ভূপতিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেশ তো, এখনই আমার সঙ্গে চলুন না।'

॥ তিন ॥

ভূপতিবাবুর বাড়িখানি বড়ো নয়, কিন্তু দিব্য সাজানো-গুছানো।

তিনি বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন, সুন্দরবাবু তাঁর সঙ্গে বিমল ও কুমারের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভূপতিবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, চেহারা লম্বা-চওড়া, রং ফরসা, মুখশ্রী সুন্দর।

বিমল হাসিমুখে বললে, 'আপনার বিশ হাজার টাকার গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি।'

ভূপতি বললেন, 'হ্যাঁ, হত্যাকারীকে ধরতে পারলেই ওই টাকা আমি উপহার দেব। এর মধ্যেই আমি বিশ হাজার টাকার একখানি চেক আমার অ্যাটর্নির কাছে জমা রেখেছি।'

বিমল নীরবে কৌতূহলী চোখে ঘরের সাজসজ্জা লক্ষ করতে লাগল। এ ঘরের ভিতরে এলেই বোঝা যায়, এর মালিক খুব শিকার-ভক্ত লোক। মেঝের উপরে বাঘ-ভাল্লুকের ছাল পাতা এবং দেয়ালের গায়ে টাঙানো রয়েছে বুনো বাঘ আর হরিণের মাথা বা শিং ও হরেক-রকম ধনুক, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র।

বিমল বললে, 'আপনি কি শিকার করতে খুব ভালোবাসেন?'

ভূপতি বললেন, 'খুব—খুব বেশি ভালোবাসি। শিকারের লোভে আমি কোথায় না গিয়েছি—আফ্রিকা, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সিলোন, বর্মা কিছুই আর বাকি নেই। ওই যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেখছেন, ওগুলিও আমি নানান দেশ থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।'

সুন্দরবাবু বললেন 'হুম, আমিও শিকার করতে ভালোবাসি। তবে আপনি করেন জন্তু-শিকার, আর আমি করি মানুষ-শিকার।'

বিমল বললে, 'মোহনবাবুর বাড়ি এখান থেকে কোন দিকে?'

সুন্দরবাবু বললেন 'উত্তর দিকে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখুন না, ওই যে, বাগানের ওপারে ওই লাল বাড়িখানা! দোতলার ডান পাশে সব-শেষে যে-ঘরখানা দেখছেন, ওই ঘরেই হতভাগ্য মোহনবাবুর মৃত্যু হয়েছে। মাঝখানের জানলার দিকে চেয়ে দেখুন, যে খাটে তিনি শুতেন তারও খানিক অংশ এখান থেকে দেখতে পাবেন।'

ভূপতি দুঃখিত স্বরে বললেন, 'ও-ঘরের দিকে তাকালেও আমার বুকটা হু হু করে ওঠে!'

বিমল সহানুভূতির স্বরে বললে, 'এটা তো খুবই স্বাভাবিক, ভূপতিবাবু।...আপনি কি এই বাগান পেরিয়েই ওই বাড়িতে যেতেন?'

—'না, ওর ভিতর দিয়ে যাবার কোনও উপায়ই নেই। একে তো ওর চারিদিকেই উঁচু পাঁচিল, তার উপরে ওটা হচ্ছে পরের বাগান। বাগানের ওপার থেকে ও-বাড়িতে ঢোকবার কোনও দরজাও নেই।'

সুন্দরবাবু বিমলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে এসে বিশ হাজার টাকার পাকা খবরটা পেলেন তো? এখন চলুন, আমার হাতে অনেক কাজ রয়েছে।'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। ভূপতিবাবুর এই ঘরখানি আমার ভারী ভালো লাগছে—'

বলতে বলতে ও চারিদিকে তাকাতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই বর্শাটা কোন দেশের ভূপতিবাবু?'

—'বোর্নিওর।'

বিমল হাত বাড়িয়ে বর্শাটা নামাতে গেল, কিন্তু ভূপতি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, করেন কী, করেন কী, ওর ফলায় বিষ আছে!'

কিন্তু বিমল তৎক্ষণাৎ বর্শাটা নামিয়ে নিয়েছে। সে শান্ত ভাবে বললে, 'ভয় নেই, আমি খুব সাবধানেই এটা নাড়াচাড়া করব। কিন্তু এর ফলায় কী বিষ আছে। ইপোগাছের বিষ?'

ভূপতি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'আপনি কী করে জানলেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বিমল বললে, 'বর্শার ডান্ডিটা তো দেখছি জাজাং-কাঠে তৈরি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এর ডান্ডিটা আবার ফাঁপা! এর কারণ কী বিমলবাবু?'

—'কারণ এর দ্বারা বর্শার কাজ চালানো গেলেও আসলে এটি বর্শা নয়, বোর্নিওয়ে একে কী বলে ডাকা হয় ভূপতিবাবু?'

—'আমার মনে নেই।'

—'আমার মনে আছে। এর নাম হচ্ছে সুম্পিটান।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা, কী বিচ্ছিরি নাম। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে? আপনিও কি বোর্নিওয়ে গিয়েছিলেন?'

—'গিয়েছিলুম। সুম্পিটান ব্যবহার করতেও শিখেছিলুম। এটা একবার ধরুন না, আপনাকেও এর ব্যবহার হাতে-নাতে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি ভুঁড়ি দুলিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'হুম, না, আমি ওর ব্যবহার-ট্যবহার শিখতে চাই না। শেষটা কি বিষ-টিষ লেগে খুন-টুন হব? আপনিও আপদ রেখে দিয়ে আসবেন তো আসুন! আমার হাতে ছেলেখেলা করবার সময় নেই!'

—'আর একটু সবুর করুন সুন্দরবাবু, আপনাকে সুম্পিটানের বাহাদুরিটা না দেখিয়ে আমি এখান থেকে এক পা নড়ছি না। হ্যাঁ, সাগুকাঠের কাঠিটা আমাকে একবার দিন তো।'

সুন্দরবাবু কাঠিটা বিমলের হাতে দিয়ে আশ্চর্য স্বরে বললেন, 'আপনার মতলোবটা কী?'

বিমল জবাব না দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সাগুকাঠের লাঠিটা আগে বর্শার ফাঁপা ডান্ডির গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তারপর জানলা গলিয়ে সেটাকে দুই হাতে তলার দিকে ধরে উঁচু করে ফেললে। তারপর ডান্ডির তলার দিক মুখে পুরে দুই গাল ফুলিয়ে খুব জোরে দিলে বিষম এক ফুঁ!

বাগানের ওপারে মোহনবাবুর বাড়ির ছাদের উপরে একটা চিল চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ সে ঘুরতে ঘুরতে ধুপ করে মাটির উপরে পড়ে গেল।

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কোথাও কিছু নেই, খামোকা চিলটা পড়ে গেল কেন?'

বিমল বর্শাটা নামিয়ে সহজ ভাবেই বললে, 'আপনার সাগুকাঠের কাঠিটা তার গায়ে গিয়ে বিঁধেছে। সুন্দরবাবু, সুম্পিটানের ইংরেজি নাম কী জানেন? 'ব্লো-পাইপ'! বোর্নিওর লোকেরা 'ব্লো-পাইপে' বিষাক্ত কাঠি ঢুকিয়ে এইভাবে জন্তু বা শত্রু নিপাত করে। এই তিরকাঠির গতি বড়ো কম নয়, সত্তর গজ দূরেও সে মারাত্মক। বোর্নিওয় কাঠিতে ইপো গাছের বিষ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কাঠিতে অন্য কোনও রকম বেশি-তীব্র বিষ মাখানো হয়েছে।...আরে, আরে, ভূপতিবাবু! পায়ে পায়ে পিছু হটে কোথায় যাচ্ছেন? আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইছি বটে, কিন্তু ওই আরশিখানার দিকে চেয়ে আপনার ওপরেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছি! পালাবার চেষ্টা করবেন না, আমি বর্শা ছুড়লে আপনি মারা পড়তে পারেন। আপনার মতন দুরাত্মা ছুঁচোকে মেরে আমি হাতে গন্ধ করতে চাই না। আসল ব্যাপার কী জানেন সুন্দরবাবু? এই ভূপতি মোহনবাবুর লোক-দেখানো সেবা করেছিল, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি এ যাত্রা কিছুতেই রক্ষা পাবেন না! কিন্তু মোহনবাবু যখন আবার সামলে উঠে ভূপতির বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার জোগাড় করলেন, ভূপতি তখন মরিয়া হয়ে 'ব্লো-পাইপে'র আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সে বোর্নিওয় গিয়ে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করতে শিখেছিল। এখান থেকে খাটের উপরে শয্যাশায়ী মোহনবাবুকে দেখা যায়। এখান থেকে পথের কাঁটা সরালে ভূপতিকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ বাংলা দেশের পুলিশ ওই সাগুকাঠের আসল রহস্য চিনবে কী করে? অতএব সে নির্ভাবনায় করে বসল বিশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা। ভূপতি হচ্ছে অগাধ জলের রুই-কাতলা। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশ দৈবগতিকে ডেকে এনেছে জল-স্থল-শূন্যের পরিব্রাজক বিমল আর কুমারকে! কাজে-কাজেই ভূপতির পুরস্কার ঘোষণা ব্যর্থ হল না, সে যখন ফাঁসিকাঠে দোললীলার সুখ উপভোগ করবে, তখন আপনি আর আমি করব বিশ হাজার টাকা আধাআধি ভাগ করে নেবার সাধু চেষ্টা! কী বলেন?'

সুন্দরবাবু পকেট থেকে হাতকড়ি বার করে ভূপতির দিকে এগুতে এগুতে কেবল বললেন, 'হুম!'

সুন্দরবাবুর এই বিখ্যাত 'হুম' হচ্ছে আশ্চর্য শব্দ। এর দ্বারা তিনি হাস্য, করুণ, রৌদ্র, অদ্ভুত ও শান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নয় রকম রসেরই ভাব প্রকাশ করতে পারেন।

তারা তিন বন্ধু

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

কুকুর-কাহিনি

অটল, পটল ও নকুল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় চায়ের দোকানে বসে আছে। হঠাৎ রাস্তা থেকে একটা মিশকালো বিলাতি কুকুর এসে চায়ের দোকানের ভিতরে ঢুকল।

নকুল খাচ্ছিল একখানা কেক। কুকুরটা লুব্ধ চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে নকুল এক টুকরো কেক তার দিকে নিক্ষেপ করলে। সেটুকু খেয়ে ফেলেই কুকুরটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে টপ করে নকুলের কোলের উপরে লাফিয়ে উঠে দিলে তার গাল চেটে।

নকুল খাপ্পা হয়ে এক ধাক্কা মেরে তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে কোঁচার খুঁটে নিজের মুখ মুছতে লাগল।

চায়ের দোকানের কোণে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। কুকুরটা তাঁর কাছে গিয়ে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে। তার দিকে এক টুকরো রুটি ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কুকুরটা দেখছি খুব দামি!'

অটল এক মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে বললে, 'দামি? এর কত দাম হবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তা বলতে পারি না। তবে এর যদি 'পেডিগ্রি' থাকে তাহলে হাজার টাকা দামও হতে পারে। এটা কার কুকুর?'

অটল অম্লানবদনে বললে, 'আমাদের। এর নাম টম। আয় রে টম, আয়! টম, টম!'

পটল ডাকলে, 'জ্যাক!'

নকুল ডাকলে, 'জিমি!'

কিন্তু কুকুরটা কোনও ডাকই গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। অটল তখন বকলস ধরে তাকে হিড় হিড় করে কাছে টেনে আনলে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে একবার সন্দিগ্ধ-চোখে তিন বন্ধুর পানে তাকিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পটল বললে, 'কী হে, কুকুরটাকে তুমি ধরে রাখলে কেন? বেচে ফেলবে নাকি?'

অটল বললে, 'উঁহু! বেচতে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি? শুনছি কুকুরটা দামি। নিশ্চয় কোনও বড়োলোকের কুকুর, পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে। ওকে ফিরে পাবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা হতে পারে।'

নকুল বললে, 'ও আমার কুকুর।'

—'কী রকম?'

—'আমি ওকে কেক খেতে দিয়েছি। ও আমার গাল চেটে দিয়েছে।'

'বেশ, আমিও তাহলে ওকে ওমলেট খেতে দিচ্ছি।'

পটল বললে, 'আমিও বিস্কুট দিচ্ছি।'

কুকুরটা বুদ্ধিমান। ওমলেট ও বিস্কুট কিছুই ছাড়লে না।

অটল বললে, 'কুকুরটা এখন আমাদের তিনজনেরই হল। পুরস্কারের টাকাও আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব। চলো, একে নিয়ে বাসায় যাই।'

কিন্তু রাস্তায় নেমে কুকুরটা তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল না। তিনজনে তাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি টানাহ্যাঁচড়া করছে, এমন সময়ে দেখা গেল একটা পাহারাওয়ালা তাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

তারা ভয় পেয়ে কুকুরের জন্যে তখনই একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেললে।

বাসার সামনে নেমে নকুল বললে, 'কিন্তু মেসের লোকেরা কুকুর দেখলে কী বলবে?'

অটল বললে, 'তারা দেখতে পেলে, তবে তো? আজ রাতটা ওকে আমাদের ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে পারব।'

রাত যখন নিশুতি তখন বিকট চিৎকারে অটলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বেলে সে দেখলে, কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে কুকুরটা শেয়ালের মতন গলায় প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—ও-ও-ও-ও, ও-ও-ও-ও, ও-ও-ও-ও।

পটল ও নকুল আঁতকে জেগে উঠল। তারপরই ঘরের বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ ও দরজায় দুম-দাম ধাক্কা শোনা গেল।

বাইরে থেকে কে বললে, 'ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?'

বিপদে নকুলের মাথা খুব খেলে, সে বললে, 'আমাদের অটল দাঁত-কটকট করছে বলে কেঁদে সারা হচ্ছে।'

বাহির থেকে আর-একজন বললে, 'বাপ রে, দাঁত-কটকট করলে মানুষ যে অমন করে চ্যাঁচাতে পারে, তা এই প্রথম জানলুম।'

আর-একজন বললে, 'আমার মনে হচ্ছে যেন, কুকুরের কান্না।'

আর-একজন বললে, 'অটলবাবুর দাঁত ফের কটকট করলে আমরা পুলিশ ডাকব।'

অটল চাপা-গলায় মুখ খিঁচিয়ে এবং নকুলকে ঘুসি দেখিয়ে বললে, 'পাজি ছুঁচো কোথাকার। কাল আমি মুখ দেখাব কেমন করে? আমাকে কুকুর বানিয়ে ছাড়লে।'

পটল আর নকুল হি হি করে হাসতে লাগল।

পরের দিন ভোরবেলায়, মেসের লোক জাগবার আগেই তিন বন্ধু কুকুর নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কুকুরটা ক্রমাগত লম্বা দেবার চেষ্টা করছে দেখে তার জন্যে একগাছা শিকল কেনবারও দরকার হল। অটল একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে খবরের কাগজগুলো উলটেপালটে দেখে এসে বললে, 'না, পুরস্কার ঘোষণা করে এখনও কেউ বিজ্ঞাপন দেয়নি।'

পটল বললে 'কুকুর নিয়ে এমন টো টো করে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব।'

নকুল বললে, 'আজ রাত্রে অটলের আবার দাঁত-কটকট করলে মেসের লোক বিশ্বাস করবে না।'

অটল বললে, 'চৌধুরিদের বাগানের মালি বনমালীকে আমি চিনি। যতদিন না পুরস্কার ঘোষণা হয়, এ আপদকে তার জিম্মায় রেখে আসি চলো।'

পটল বললে, 'তার চেয়ে ও-আপদকে এখুনি বিদায় করে দাও না ভায়া!'

অটল মাথা নেড়ে বললে, 'ইল্লি নাকি? ওর জন্যে আমাদের ট্যাকের পয়সা খরচ হয়নি?'

চৌধুরিদের বাগানের বনমালী বললে, 'কুকুরটাকে আমি হপ্তা-খানেকের জন্যে বাগানে বেঁধে রাখতে পারি, কিন্তু ওর খোরাকি জোগাবে কে?'

অটল ঠং করে একটা টাকা ফেলে দিলে।

দিন-দুয়েক পরে বনমালী বাগানে বসে কতকগুলো ফুলগাছের শুকনো ডাল কেটে দিচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে, একজন এয়া গালপাট্টা-গোঁফওয়ালা বেঁটে পেটমোটা লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে বাবুদের কুকুরটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারও হাতের শিকলিতে বাঁধা আর একটা মিশকালো কুকুর।

বনমালী বললে, 'কাকে খুঁজছেন মশাই?'

লোকটা বললে, 'কারুকে খুঁজছি না, তোমাদের কুকুরকে দেখছি। ও বোধহয় আমার কুকুরের যমজ ভাই!'

দুটো কুকুরই তখন পরস্পরকে দেখে ভয়ানক তর্জন-গর্জন ও লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে—দুজনেই যেন দুজনকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়?'

—'না মশাই, ও কারুকে কামড়ায় না।'

—'আমার কুকুরও আগে কামড়াত না, কিন্তু পরশু খুকিকে আর কাল গিন্নিকে কামড়েছে। দু-চার দিনের মধ্যেই ওকে বিদায় করে দিতে হবে দেখছি, নইলে গিন্নি নাকি বাপের বাড়ি চলে যাবেন।'

বনমালী বললে, 'কিন্তু দুটো কুকুরই তো দেখতে অবিকল একরকম! একবার চোখের আড়াল হলে আমি চিনতেই পারব না কোনটা কার কুকুর!'

—'চিনতেই পারবে না? বটে!'

লোকটা খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'এ দুটো কুকুরের গলার মাপও একরকম কি না দেখি।' সে নিজের কুকুরের বকলস খুলে অন্য কুকুরটার গলায় পরালে এবং তার বকলসটা নিজের কুকুরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, 'আরে, এদের গলার মাপও যে একরকম! নিশ্চয় এরা যমজ ভাই।'

বনমালীর তখন বাজে কথা কইবার অবসর ছিল না, সে আবার নিজের কাজে মন দিলে।

পরের দিন সকালে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসেই বিপুল উৎসাহে অটল বললে, 'কেয়া মার দিয়া। পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

তিন বন্ধু ঊর্ধ্বশ্বাসে বনমালীর সন্ধানে ছুটল। বনমালীর কাছ থেকে কুকুর নিয়ে তারা

তাড়াতাড়ি চলে গেল বটে, কিন্তু মিনিট-পনেরো পরেই আবার হন্তদন্তের মতন ফিরে এল। তখন বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল বনমালী।

অটল মারমুখো হয়ে বলে উঠল, 'হতভাগা, বদমাইশ! এ কার কুকুর?'

—'না, না! এ আমাদের কুকুর নয়! বকলসটা আমাদের বটে, কিন্তু কুকুরটা একেবারে নতুন! যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, সে দেখেই চিনে ফেলেছে। হায়, হায় পঞ্চাশ টাকা!'

বনমালীর তখনই মনে পড়ে গেল, কালকের সেই গোঁফ-গালপাট্টার কথা। সে মনে মনে সমস্তই বুঝতে পারলে, কিন্তু মুখে এমন ভাব দেখালে, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নকুলের দাঁও-মারা

অটল ও পটল বিমর্ষ মুখে বাড়ির সামনেকার রোয়াকে চুপ করে বসে আছে।

আজ সকালে উঠে তারা পকেট ঝেড়ে দেখেছে—তাদের দুজনের কাছে মোট সাড়ে-উনিশটি পয়সা আছে। তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রায় যাকে বলে, ভাঁড়ে-মা-ভবানী আর কী? এমন অবস্থায় কাষ্ঠহাসি ছাড়া আর কোনওরকম হাসিই হাসা যায় না।

কিন্তু অটল ও পটল কাষ্ঠহাসি হাসতে নারাজ। তাই তাদের মুখ বিমর্ষ।

তাদের একমাত্র আশা এখন নকুল।

দেশে একমাত্র জমি-জমা আছে। সেই জমি-ভাড়ার টাকা সে অনেক দিন পরে আদায় করতে গিয়েছে।

আজ নকুলের আসবার কথা। তারই পথ চেয়ে অটল ও পটল রোয়াকে বসে আছে তীর্থের কাকের মতন।

খানিক পরে দেখা গেল, একখানা গোরুর গাড়ির আগে আগে নকুল আসছে বাসার দিকে।

পটল বললে, 'নকুলের মুখ হাসি হাসি, নিশ্চয় খবর ভালো।'

অটল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কী হে ভায়া, টাকা দিয়েছে?'

নকুল বললে, 'দিয়েছে বটে, কিন্তু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। আজ তিন বছর পরে গেলুম, মোটে আড়াই শো টাকা।'

অটল বললে, 'হিপ হিপ হুর রে।'

পটল জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু নকুল, তোমার সঙ্গে গোরুর গাড়ি কেন? গাড়ির ওপরে অতবড়ো বাক্সে করে কী এনেছ হে? আমাদের জন্যে ফল-ফসল নাকি?'

নকুল রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'ওটা বাক্স নয়। ওর ওপর-দিকটা খোলা, অর্থাৎ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঘেরা আছে। একবার উঁকি মেরে দেখেই এসো না।'

কৌতূহলী অটল গোরুর গাড়ির উপরে গিয়ে উঠল। বাক্সটা তার চিবুক পর্যন্ত উঁচু। ডিঙি মেরে বাক্সের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই সে 'বাপ!' বলে চেঁচিয়ে রাস্তার দিকে লম্ফত্যাগ করলে।

পটল বললে, 'কী হল, কী হল?'

অটল বললে, 'বাঘ!'

—'তুমি কী বলছ হে? বাপ, না বাঘ?'

—'দুই-ই। ওটা বাক্স নয়, খাঁচা। ওর ভেতরে আছে একটা মস্ত বাঘ!'

—'বাঘ?'

নকুল বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু ভারী পোষ-মানা বাঘ!'

অটল বললে, 'বাঘ যে পোষ মানে, এ কথা মানতে আমি রাজি নই। পটল, এখান থেকে সরে পড়ি এসো, নকুলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

নকুল বললে, 'তোমরা হচ্ছ কাপুরুষের অবতার। একটা পোষা বাঘকে এত ভয়। আগে সব কথা শোনো। আমাদের গাঁয়ের জমিদার বাঘটাকে পুষেছিলেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন। দেশে গিয়ে শুনলুম, জমিদারবাড়ির লোকেরা বাঘটাকে পুষতে রাজি নন। বিলিয়ে দিতে চান। এতবড়ো দাঁও মারবার সুযোগ আমি ছাড়তে পারলুম না। তাই বাঘটাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি।'

অটল মুখভঙ্গি করে বললে, 'মরে যাই! বুদ্ধির গলায় দড়ি! বাঘ নিয়ে তুমি কী করবে শুনি?'

—'সস্তায় বাঘ বিক্রি আছে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।'

—'মরা বাঘের চামড়া বিক্রি হতে পারে, কিন্তু একটা ধেড়ে জ্যান্তবাঘকে কেউ কিনবে না।'

—'ও-বাঘটা ধেড়ে নয়। নিতান্ত ছোকরা, বয়স মোটে চার বছর তিন মাস। সার্কাস-ওয়ালারা খবর পেলে এখনই কিনে ফেলবে।'

পটল বললে, 'কিন্তু যতদিন না তারা খবর পায়, বাঘটাকে কোথায় রাখবে? আমাদের এটা হচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়ি। বাড়ির ভেতরে অতবড়ো একটা বাঘ দেখলে ভাড়াটেরা কী-রকম গোলমাল করবে তা বুঝতে পারছ?'

নকুল বললে, 'বাঘের খাঁচাটা থাকবে বাড়ির পাশের ওই জমিতে।'

পরদিন নকুল বাঘের জন্যে বেশ-খানিকটা মাংস ও হাড়ের ছাঁট নিয়ে এল।

বাঘের খাওয়া দেখবার জন্যে অটল ও পটল কৌতূহলী হয়ে নকুলের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাঘ কিন্তু মাংসের ছাঁট দু-একবার শুঁকেই ব্যাঘ্র-ভাষায় একটি ছোট্ট গর্জন করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ল্যাজ আছড়াতে লাগল।

অটল বললে, 'জমিদারের বাঘ কিনা! আভিজাত্য আছে। মাংসের ছাঁটে মন ওঠে না—গোটা পাঁঠা খেতে চায়।'

নকুল বললে, 'আমার মনে হয়, জমিদারবাড়ির জন্যে ওর মন কেমন করছে। সেখানে ও খাঁচার মধ্যে থাকত না—ওর জন্যে ছিল একটা বড়ো ঘর, আর খানিকটা রেলিং-ঘেরা জমি।'

অটল সন্দিগ্ধ ভাবে বললে, 'খাঁচাটা তেমন মজবুত নয় দেখছি। এখানেও ওকে বেশিদিন খাঁচার ভেতরে থাকতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

নকুল একটা লাঠি দিয়ে মাংসের ছাঁটগুলো বাঘের মুখের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

বাঘ মহা-বিরক্ত হয়ে বিষম ধমক দিয়ে খাঁচার দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

অটল, পটল ও নকুল—তিনজনেই একসঙ্গে সুদীর্ঘ লম্ফ-ত্যাগ করলে।

তারপর—দৌড়, দৌড়, দৌড়।

দোতলায় উঠে নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢুকে অটল দরজা বন্ধ করবার জন্যে ফিরেই দেখে, বাঘও দোতলায় এসে হাজির হয়েছে।

দরজা বন্ধ করা আর হল না। তিনজনেই একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

নকুল একটা টেবিলের উপর উঠে সেখান থেকে লাফ মেরে ঘরের লোহার কড়ি ধরে ঝুলতে লাগল।

অটল ও পটল একটা সেকেলে খুব-উঁচু ও প্রকাণ্ড আলমারির উপরে কোনওরকমে উঠে পড়ে হুমড়ি খেয়ে বসে রইল।

বাঘও ঘর ভুল করলে না। সে-ও ভিতরে ঢুকে, প্রথমে কড়ি-ধরে দোদুল্যমান নকুলের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে অটল ও পটলকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

অটলের মনে হল, আগে কাকে ভক্ষণ করবে বাঘ সেই কথাই চিন্তা করছে।

সে কম্পিত স্বরে চুপি চুপি বললে, 'বাঘটা খালি খালি আমার দিকেই তাকাচ্ছে। ভাই পটল, তুমি আমার সামনে এসো। আমি তোমার পিছনে গা ঢাকা দিই।'

পটল দস্তুর মতন দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতন বললে, 'না। তুমি হচ্ছ নরহস্তী, তোমাকে দেখে বাঘের জিভে জল আসা অসম্ভব নয়।'

অটল বললে, 'মানলুম। সেইজন্যেই তো আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। আর আমি যদি নরহস্তীই হই, তুমি হচ্ছ মানুষ-হাড়গিলে। তোমাকে দেখে বাঘের লোভ উপে যেতে পারে, অতএব তুমি সামনে এসো।'

পটল জোরে মাথা নেড়ে বললে, 'পাগল। এমন সাংঘাতিক পরীক্ষায় আমি রাজি নই। তোমার আড়ালে আমি নিরাপদে আছি। বাঘ মোটেই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।'

কিন্তু অটল নাছোড়বান্দা, সে পটলের পিছনে যাবার জন্যে গুঁতোগুঁতি শুরু করলে—পটল যত বাধা দেয়, তার গোঁ তত বেড়ে ওঠে।

একে অটল-পটলের দেহের ভারে আলমারিটার মাথা রীতিমতো ভারী হয়ে উঠেছিল, তার উপরে আবার এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি!

হঠাৎ আলমারিটা হেলে দড়াম করে মাটির উপর পড়ে গেল।

নকুল এতক্ষণ দুই চোখ মুদে কড়ি ধরে ঝুলছিল। আলমারি পতনের শব্দে এবং অটল ও পটলের আর্তনাদে দারুণ ভয়ে তার দেহ হিম ও দুই হাত অবশ হয়ে গেল এবং পরমুহূর্তে আঙুল আলগা হয়ে গিয়ে কড়ি থেকে সে অবতীর্ণ হল একেবারে বাঘের পিঠের উপরে।

ওদিকে ভূপতিত আলমারির মাথা থেকে দুই-দুইজন মানুষকে দুই দিকে ছিটকে পড়তে দেখে, বাঘ বিপুল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

তারপরেই যখন হাউমাউ করে চেঁচিয়ে তার পিঠে এসে পড়ল নকুল, তখন এমন অভাবনীয় হুলুস্থুলু কাণ্ড সে আর সহ্য করতে পারলে না। ভয়ে ও রাগে গাঁ গাঁ করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বাঘ তৎক্ষণাৎ সেই বিপজ্জনক ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনজন মানুষের সঙ্গে বাঘের চিৎকার এবং আলমারি ও নকুলের দেহের পতনশব্দ শুনে ফ্ল্যাটবাড়ির সমস্ত ভাড়াটিয়া হইচই তুলে ছুটে এল।

কিন্তু তার পরই মূর্তিমান ব্যাঘ্রের আবির্ভাব দেখে তাদের পিলে গেল চমকে। বলা বহুল্য, তৎক্ষণাৎ যে যেদিকে পারলে দৌড় মেরে দমাদম শব্দে দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে।

এদিকে বাঘের পিঠ থেকে মেঝের ওপরে আছড়ে গড়িয়ে পড়ে নকুলের ধারণা হল সে আর বেঁচে নেই।

সে আর টুঁ-শব্দ উচ্চারণ করলে না, বোধহয় মরা মানুষের কথা কওয়া উচিত নয় বলেই।

অটল ও পটল অল্প-বিস্তর চোট খেয়েছিল বটে, কিন্তু তারা সেই অবস্থাতেই আত্মরক্ষার চেষ্টা ভুললে না।

অটল হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢুকল, এবং পটল চটপট উঠে ঘরের দরজায় দিলে খিল তুলে।

বাড়ির কে থানায় ফোন করে দিয়েছিল, থানা থেকে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালার সঙ্গে ইনস্পেকটার এসে দেখেন—বাঘটি খাঁচায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

খাঁচার দরজা বন্ধ করার শব্দে বাঘ মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে—তারপরই আবার মুখ নামিয়ে চোখ মুদে ফেললে। বাঘের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায়, খাঁচার বাইরে আসবার জন্যে তার মনে আর কোনও আগ্রহই নেই।

ইনস্পেকটার বললেন, 'বাঘটা দেখছি পোষা। একে বধ করে লাভ নেই।'

ইনস্পেকটার বললেন, 'তা হলে বাঘটাকে অলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক।'

নকুল সাগ্রহে বললে, 'উত্তম প্রস্তাব'।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মহারাজা চোর-চূড়ামণি বাহাদুর

অপূর্ব বাগচী স্ট্রিটে আজকাল বড়োই চোরের উপদ্রব হয়েছে।

এ চোর হচ্ছে বিষম চোর। উপর-উপরি বারো-চৌদ্দ খানা বাড়িতে চুরি হয়ে গেল, কিন্তু পুলিশ কোনও চুরিরই কিনারা করতে পারলে না।

গোয়েন্দা বিভাগের মস্ত মস্ত মাথাওয়ালারা মাথা ঘর্মাক্ত করে অবশেষে আবিষ্কার করে ফেললেন, এসব চুরি মাত্র একজন চোরের কীর্তি নয়।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলেও চুরি বন্ধ হল না। বুদ্ধিমান চোরেরা বেছে বেছে ঘটনাস্থল নির্বাচন করেছিল চমৎকার। কারণ অপূর্ব বাগচী স্ট্রিটে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের অধিকাংশই ধনবান বলে বিখ্যাত। এমনকি তাঁদের মধ্যে একজন 'রাজাবাহাদুর' ও একজন 'স্যার' উপাধিধারীরও অভাব নেই।

অটল-পটল-নকুল লক্ষ্মীপ্যাঁচার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলেও আজকাল ওই রাস্তাতেই বাস করত।

পাড়ায় একটি শখের থিয়েটার-ক্লাব ছিল, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন রাজা দুর্গাপ্রসাদ ও স্যার গঙ্গারাম!

গেল দুই রাত্রে তাঁদের দুজনেরই অট্টালিকার মধ্যে বিনা সমারোহে চোরের শুভাগমন হয়েছিল।

রাজাবাহাদুর ও স্যার গঙ্গারাম চোরেদের উপরে হয়েছেন অগ্নিশর্মা এবং পুলিশের উপরে হারিয়েছেন বিশ্বাস। তাঁরা দুজনে ঘোষণা করলেন, যে চোর ধরতে পারবে তাকে তাঁরা হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করবেন।

অটল বললে, 'হে মা কালী, যদি দশ টাকার পুজো পেতে চাও, তাহলে চোরকে একটিবার মাত্র আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।'

পটল দীর্ঘশ্বাস ফেলে গানের সুরে বললে, 'হায় রে, এমন দিন কি হবে মা তারা?'

নকুল বললে, 'আমাদের বাড়িতে এলেও চোর তো আর ঢোল বাজাতে বাজাতে আসবে না। সে এখন এসে কখন পালাবে কেমন করে আমরা জানব?'

অটল বললে, 'তবু প্রস্তুত হতে দোষ নেই। হাজার টাকা কম টাকা নয়। এসো, খানিকক্ষণ পরামর্শ করা যাক।'

মা কালী অটলের প্রার্থনা শুনলেন।

দিন-তিনেক পরেই গভীর রাত্রে অটল নাক-ডাকা থামিয়ে ফেলে ঘরের ইলেকট্রিক বাতি জেলে দেখলে, একটা মহা লম্বা-চওড়া যমের মতন দেখতে চোর তার আলমারির পাল্লা ধরে টানাটানি করছে।

অটল এক গাল হেসে বললে, 'অবশেষে তুমি এসেছ বন্ধু? আমি যে তোমার পথ চেয়েই জেগে জেগে নাক ডাকাচ্ছিলুম।'

চোর গর্জন করে একখানা চকচকে ছোরা বার করলে।

ফস করে একটা রিভলভার বার করে অটল বললে, 'শান্ত হও ভায়া, শান্ত হও। ছোরার চেয়ে রিভলভার বড়ো জিনিস, এ কথা জানো তো? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।'

চোর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অটল বললে, 'পাছে তোমার ঢুকতে কষ্ট হয়, সেই ভয়ে আজ তিন দিন ধরে আমাদের বাড়ির সব দরজাই খোলা রেখেছি। আর দেওয়ালের উপরে ওই যে ইলেকট্রিক-ঘণ্টার বোতাম দেখছ, তোমার পায়ের শব্দ পেয়েই ওটি আমি টিপে দিয়েছি। কেন জানো? ওই বোতাম টিপলেই বাড়ির আর-দুটো ঘণ্টা বাজবে, আর আমার দুই বন্ধু জেগে উঠে পাড়ার লোককে খবর দিতে ছুটবে।...

দরজার দিকে অত ঘন ঘন তাকাচ্ছ কেন? ভাবছ, হঠাৎ এক লাফে পগার পার হবে? আর সময় নেই ভায়া, আর সময় নেই। ওই শোনো, সিঁড়ির ওপরে পায়ের শব্দ। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে!'

তিন-চার মুহূর্ত পরেই ঘরের মধ্যে পটল ও নকুলের সঙ্গে প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর, স্যার, গঙ্গারাম ও আরও বারো-তেরো জন লোক।

সকলেরই হাতে মোটা মোটা লাঠি।

অটল খাট থেকে নেমে এসে বললে, 'প্রিয় চোর, এইবারে ছোরাখানা পরিত্যাগ করো দেখি।'

চোর ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিলে।

সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে অটল বললে, 'যদি চাও তো এই রিভলভারটা এখন তোমাকে দান করতে পারি। এটি হচ্ছে আমাদের ক্লাবের থিয়েটারি-রিভলভার—একেবারে কাঠ দিয়ে তৈরি।'

চোর কটমট করে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

রাজাবাহাদুর দুই পা পিছিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রাসকেলকে এখনই পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়া হোক।'

স্যার গঙ্গারাম বললেন, 'এ চোরটা হচ্ছে এখন অটলবাবুর সম্পত্তি। উনি যা বলেন তাই হবে।'

অটল বললে, 'পটল। নকুল। চোরকে নিয়ে যা যা করতে হবে, তোমাদের সব মনে আছে তো?'

পটল ও নকুল ঘাড় নাড়লে। অটল বললে, 'চলুন এইবারে সবাই মিলে ক্লাবের দিকে যাত্রা করা যাক।'

রাজাবাহাদুর ও স্যার গঙ্গারামও কৌতূহল দমন করতে পারলেন না, সকলের সঙ্গে তাঁরাও ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন।

চোরকে একখানা টুলের উপর বসিয়ে সবাই তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রইল।

নকুল একখানা পকেটবুক ও পেনসিল নিয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'হে চোর, তোমার নাম কী?'

চোর জবাব দিলে না।

পটল বললে, 'ওর নাম ছিঁচকে।'

নকুল তাই লিখে নিয়ে বললে, 'ছিঁচকে, তোমার বয়স কত?'

জবাব নেই।

পটল বললে, 'ছিঁচকে এখনও কথা কইতে শেখেনি। লেখো, ওর বয়স এক বছর দু-মাস দেড় দিন।'

নকুল বললে, 'ছিঁচকে, তোমার ঠিকানা কী?'

পটল বললে, 'নিশ্চয়ই চোরা-বাজারে।'

অটল বললে, 'ছিঁচকে, তোমার গা দিয়ে বড়োই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তোমাকে এখন স্নান করতে হবে।'

পটল বললে, 'এ বাড়ির পিছনেই একটা ছোটো পুকুর আছে। ছিঁচকেকে সেইখানে নিয়ে চলো।'

তখন পৌষ মাসের শেষ, কনকনে শীত। বাড়ির পিছনে ছিল একটা পানায় ভরা পচা পুকুর। পুকুরের দিকে তাকিয়েই চোর বলে উঠলে, 'আমি সাঁতার জানি না।'

পটল ও নকুল একসঙ্গে বলে উঠল, 'ছিঁচকে কথা কইতে শিখেছে—ছিঁচকে কথা কইতে শিখেছে!'

অটল বললে, 'ছিঁচকে আজ যখন কথা কইতে শিখেছে, তখন সাঁতারই বা শিখবে না কেন? নকুল, একগাছা মোটা দড়ি নিয়ে এসো তো!'

দড়ি বাঁধা হল চোরের কোমরে। পটল ও নকুল তাকে ধরে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে।

'বাবা রে, মা রে' বলে বিকট আর্তনাদ করে চোর জলের ভিতরে ডুবে গেল নিরেট পাথরের মতন। অটল তখন দড়ি ধরে তাকে আবার ডাঙার উপরে টেনে তুললে।

পটল ও নকুল আবার তাকে ধাক্কা মারলে—আবার সে জলের ভিতরে পড়ে ডুবে গেল।—অটল আবার তাকে উপরে টেনে আনলে। এমনি ব্যাপার চলল খানিকক্ষণ ধরে।

অটল বললে, 'মনে হচ্ছে পাঁক আর জল খেয়ে খেয়ে ছিঁচকের ভুঁড়ি রীতিমতো ফুলে উঠেছে। আরও জল খেলে ওর ভুঁড়ি ফেটে যেতে পারে।'

রাজাবাহাদুর বললেন, 'ওর ভুঁড়ি ফাটবার আগে শীতের চোটে কেঁপে কেঁপে আমি মারা পড়ব যে! এইবারে ওকে থানায় পাঠিয়ে দাও।'

অটল বললে, 'আমার সম্পত্তি পুলিশের হাতে সমর্পণ করব না। পটল! নকুল! ছিঁচকেকে নিয়ে এইবারে কী করতে হবে মনে আছে তো? যাও, ওকে নিয়ে যাও!'

পটল ও নকুল চোরকে নিয়ে ক্লাবের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাকি সবাই ক্লাবের রিহার্সাল-রুমে এসে দাঁড়ালেন। মিনিট-দশ পরেই পটল ও নকুল চোরকে সেখানে নিয়ে এল—তার মাথায় টিনের মুকুট, পায়ে জরির জুতো, পরনে রাজার পোশাক এবং একগালে চুন ও একগালে কালি।

সকলেই বুঝলেন এ পোশাক এসেছে থিয়েটারেরই ভাণ্ডার থেকে।

অটল বললে, 'পটল, একখানা বড়ো কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে কালি দিয়ে লেখো—

'মহারাজা চোর-চূড়ামণি বাহাদুর।' নকুল কাগজখানা তুমি গঁদ দিয়ে ছিঁচকের পিঠের ওপরে মেরে দাও।'

চোরের দুই গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তখন ঝর ঝর করে চোখের জল।

স্যার গঙ্গারাম বললেন, 'তোমাদের থিয়েটারের অভিনয়ের চেয়ে আজকের পালাটা আমি বেশি উপভোগ করছি।'

চোরের দিকে তাকিয়ে অটল বললে, 'হে মহারাজ, আপনি ক্রন্দন করছেন কেন?'

পটল বললে, 'আমাদের চড় খেয়ে! মহারাজ কিছুতেই রাজবেশ পরতে রাজি হচ্ছিলেন না।'

চোর বললে, 'না হুজুর, সেজন্যে আমি কাঁদছি না। ও-রকম চড়-চাপড় খাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে। কিন্তু এর পরেও আমাকে নিয়ে আরও কী করতে চান, তাই ভেবেই আমার কান্না পাচ্ছে।'

অটল বললে, 'মহারাজ, নির্ভয় হোন। আর আমাদের কোনও কর্তব্য নেই। আপনি এখন অনায়াসেই স্বরাজ্যে প্রস্থান করতে পারেন।'

চোর বললে, 'তাহলে আমার কাপড়-চোপড়গুলো ফিরিয়ে দিন।'

অটল বললে, 'উঁহু! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দ্যাখো। সকালের আলো ফুটেছে। রাজবেশে রাস্তায় তোমাকে দিব্যি মানাবে।'

চোর চমকে উঠে বললে, 'বাপ রে, এ পোশাকে আমাকে পথে দেখলে লোকে যে আমার পিছনে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করবে।'

—'তা করবে। তোমার জন্যে আমি তিন রাত ঘুমোইনি। আমার ঘুম পেয়েছে। শিগগির বেরোও এখান থেকে।'

চোর ধপাস করে বসে পড়ে আবার কেঁদে ফেলে বললে, 'আমি যাব না। তার চেয়ে আমাকে পুলিশে দিন।'

অটল, পটল ও নকুল তিনজনেই চোরের পিঠে মারলে তিন লাথি।

চোর তখন তাড়াতাড়ি পলায়ন করতে বাধ্য হল।

রাজাবাহাদুর বললে, 'হাতে পেয়ে চোরটাকে ছেড়ে দেওয়া ভালো হল না।'

অটল বললে, 'ভেবে দেখুন রাজাবাহাদুর, ওর মুখে আজকের গল্প শুনলে আর কোনও চোরই কি এ পাড়ায় উঁকি মারতে সাহস করবে?'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

কেমন করে তোতলামি সারে

নতুন বেহারাটি তোতলা—অসম্ভব রকম তোতলা। সেদিন সকালে অটল তাকে বললে, 'বনমালী—বনমালী।'

বনমালী বলতে চায় 'হুজুর', কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরুল খালি 'হু-হু-হু-হু-হু-হু-হু—।'

পটল বললে, 'থাক বনমালী, থাক। তুমি যা বলতে চাও বুঝেছি। কথা থামিয়ে কাজ করো দেখি। বিশু ময়রার খাবারের দোকান চিনতে পারবে তো?'

বনমালী বলতে চায়, 'পারব', কিন্তু বার-দশেক 'পা' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে হতাশ ভাবে কেবল মাথা নেড়েই জানালে—হ্যাঁ।

অটল ও পটল তো হেসেই অস্থির, কিন্তু নকুল একবারও হাসবার চেষ্টা করলে না। বরং তার মুখ দেখলে মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে।

অটল বললে, 'কী হে বনমালী, আবৃত্তি শুনেও তোমার মুখে হাসির চিহ্ন নেই কেন?'

নকুল গম্ভীরভাবে বললে, 'আমি হাসব কেমন করে ভাই? আমি যে ভুক্তভোগী।'

পটল বললে, 'তার মানে?'

নকুল বললে, 'তখন তোমাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলুম ভয়ানক তোতলা,—হয়তো বনমালীরও চেয়ে।'

পটল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তোমার তোতলামি সারল কেমন করে হে?'

নকুল বললে, 'সে এক ইতিহাস। শুনতে চাও তো বলতে পারি।'

অটল বললে, 'নিশ্চয়ই শুনতে চাই।'

নকুল আরম্ভ করলে,—

তোতলামির জন্যে জীবনটা আমার ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের হাসি-কৌতুক, অপরিচিতদের বিদ্রূপ, এসব ছিল আমার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, কোনও নতুন লোক আমার সঙ্গে কথা কইতে এলেই, আমার মাথায় যেন ভেঙে পড়ত আকাশ।

অবশেষে এক বড়ো ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলুম।

ডাক্তার আমাকে শুধোলেন, 'আপনার কী দরকার?'

আমি বললুম, 'আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ'

ডাক্তার বললেন, 'কী বলতে চান, বলুন।'

—'আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ'

ডাক্তার বললেন, 'বুঝেছি। গান গেয়ে বলুন।'

'গা-গা-গা-গা-গা-গা-গান.... ?

—'হ্যাঁ, গান গেয়ে।'

আমি হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলুম।

ডাক্তার বললেন, 'প্রায়ই দেখা যায়, যেসব তোতলা মানুষ সাধারণভাবে কোনও কথাই বলতে পারে না, গানের সুরে কথা বলতে তাদের আর বাধা হয় না। আপনি যা বলতে চান, গান গেয়ে আমাকে বলুন।'

আমি গানের সুরে বললুম—

'আমার বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু তোতলা বলে কেউ আমাকে পছন্দ করছে না। বড়োই বিপদে পড়েছি ডাক্তারবাবু। আপনি যদি একটা উপায় বাতলে দেন।'

ডাক্তার বললেন, 'বিশেষভাবে কোন কোন কথা আপনার আটকে যায়?'

আমি আবার গান গাইবার উপক্রম করতেই ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আর গান নয়। আপনার বক্তব্য লিখে জানান।'

একখানা কাগজ নিয়ে পেনসিলের সাহায্যে আমি আমার তোতলামির কথা বর্ণনা করলুম।

কাগজখানা পাঠ করে ডাক্তার খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিশেষ শক্ত 'কেস' নয়। এ রকম 'কেস' আমি আরোগ্য করেছি। আপনাকে একটা উপায় বলে দিতে পারি।'

আমি গান গেয়ে বললুম, 'বলুন ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

ডাক্তার বললেন, 'তোতলামি হচ্ছে একটা মানসিক ব্যাধি মাত্র। তোতলারা প্রায়ই মুখচোরা হয়। কথা কইতে গিয়ে ভয় পেয়ে থতোমতো খেয়ে তাদের কথা আটকে যায়। আপনাকে কী করতে হবে শুনুন। প্রতিদিনই আপনি অন্তত তিনজন অচেনা মানুষের কাছে কথা কইবার চেষ্টা করবেন, তা হলেই দেখবেন, দিনে দিনে আপনার কথা কইবার ভয় কমে যাচ্ছে, আর আপনার তোতলামিও কমে যাচ্ছে একটু একটু করে।'

ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর হাতে আটটি টাকা গুঁজে দিয়ে, এই নতুন জ্ঞান নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন আমি দেশে থাকতুম। দেশে ফেরবার জন্যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনের কামরায় উঠে বসলুম। ডাক্তার যে উপায় বাতলে দিলেন, সেটা ঠিক আমার মনের মতন হল না। স্বভাবতই আমার প্রকৃতি হচ্ছে লাজুক। চেনা লোকের সঙ্গেই আমি কথা কইতুম খুব কম, আর অচেনা লোক দেখলেই হয়ে যেতুম ঠিক বোবা।

ডাক্তারের উপদেশ মানতে গেলে এই স্বভাবটি আমাকে বদলাতে হবে দেখছি। কঠিন কর্তব্য।

কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, হঠাৎ এক মস্ত লম্বা ও বেজায় ষণ্ডা ভদ্রলোক কামরার ভিতরে এসে উঠলেন। ভাবলুম, এঁকে নিয়েই পরীক্ষা শুরু করা যাক।

কিন্তু মনের ভিতর থেকে কোনও ভরসাই পেলুন না। লোকটির যে-রকম গুন্ডার মতন চেহারা, যদি চটে যায়!

কিন্তু আমার আগেই, ভদ্রলোক বেঞ্চের উপরে বসেই কথা শুরু করলেন, 'কী-কী-কী-কী-কী-রকম মেঘলা দেখছেন! আজ-জ-জ-জ-জ-জল না হয়ে ছা-ছা-ছা-ছা-ছাড়বে না দেখছি।'

বিষম দমে গেলুম, এই তোতলা ভদ্রলোকের কথার উত্তরে যদি আমিও তোতলামি প্রকাশ করি, তাহলে নিশ্চয়ই উনি ভেবে নেবেন আমি ওঁকে ব্যঙ্গ করছি। দরকার নেই বাবা কথা কয়ে। শেষটা কি ঘুসি খেয়ে প্রাণে মারা পড়ব?

কিন্তু আমি জবাব দিলুম না দেখে, ভদ্রলোক বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কী-কী-কী-কী-কী-রকম লোক আপনি? জ-জ-জ-জ-জবাব দিচ্ছেন না যে ব-ব-ব-ব-বড়ো। কা-কা-কা-কা-কালা? না বো-বো-বো-বাবা?'

বুদ্ধিমানের মতন তখনই ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলুম, সত্যিই আমি কালা ও বোবা।

ভদ্রলোক তখন ঠান্ডা হয়ে দরদ জানিয়ে বললেন, 'আ-আ-আ-আ-হা, কা-কা-কা-কালা বো-বো-বো-বো-বাদের কী-কী-কী-কী-ক-ক-ক-ক-কষ্ট!'

আমাদের দেশে যেতে হলে মাঝে একবার গাড়ি বদলাতে হয়।

যে-স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হবে, সেখানে নেমে দেখলুম ট্রেন আসতে তখনও দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগলুম। তখন মেঘ কেটে গিয়েছে।

আকাশ সুনীল। পায়চারি করতে করতে স্টেশনের বাইরে গিয়ে পড়লুম। রাস্তায় কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হল না। জায়গাটি বড়ো নির্জন। কোনও অচেনা লোকেরা সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে পড়লুম।

একজায়গায় একখানা বাড়ি দেখলুম। তার ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—'পাগলা গারদ'।

আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মূর্তির আবির্ভাব হল।

মাথায় তার কোনও প্রতিমা থেকে খুলে নেওয়া পুরোনো একটা মটুক। গায়ে জড়ানো লাল রঙের একখানা গামছা। পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে জরির জুতো। সে মাঝে মাঝে হ্যাফপ্যান্টের পকেটে হাত পুরে দিয়ে আবার বার করে নিয়ে শূন্য হাতেই যেন কী ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে। আমাকে দেখেই হাসিমুখে একবার ঘাড় নাড়লে।

যদিও লোকটির সাজপোশাক যুৎসই নয়, তবু আমি স্থির করলুম এর সঙ্গে খানিক আলাপ করলে মন্দ হবে না।

বললুম, 'চ-চ-চ-চ-চমৎকার নীল আকাশ।'

সে বললে, 'আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম। আমিই আজ আকাশকে চমৎকার হবার হুকুম দিয়েছি।'

একটু ভড়কে গেলুম। তবু জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কী-কী-কী-কী ছ-ছ-ছ-ছ-ছড়াতে ছ-ছ-ছ-ছ ছড়াতে যাচ্ছেন?'

লোকটি একগাল হেসে বললে, 'মোহর। গরিবদের দেখলে আমার দুঃখ হয়, তাই তাদের মুঠো মুঠো মোহর দান করছি।'

আরও বেশি ভড়কে গেলুম। বললুম, 'ও।'

শূন্য হাত মুঠো করে লোকটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমিও একমুঠো মোহর চাও নাকি? এই নাও।'

বললুম, 'ধ-ধ-ধ-ধন্যবাদ। আ-আ-আ-আপতত আ-আ-আ-আমার মোহর দ-দ-দ-দরকার নেই।'

লোকটি এগিয়ে এসে তার হাতের ভিতর আমার হাত নিয়ে বললে, 'আমি হচ্ছি—চিনদেশের সম্রাট। ওই হচ্ছে আমার প্রাসাদ।' বলেই ইঙ্গিতে পাগলা-গারদের বাড়িটা দেখিয়ে দিলে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। বুঝলুম—খুব লোকের পাল্লায় পড়েছি।

চিনসম্রাট আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের একটা গুদামঘরের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ঘরটি বেশ নির্জন, না?'

মাথা নেড়ে সায় দিলুম একান্ত নাচারের মতন। এই নির্জনতা ভয়াবহ।

চিনসম্রাট বললেন, 'আমি এখন তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।'

আমি বললুম 'তা-তা-তা-তা-তাই নাকি?'

চিনসম্রাট বললেন, 'হ্যাঁ। নরবলি সম্বন্ধে তোমার মত কী?'

ভয়ে ভয়ে জানালুম, নরবলি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

চিনসম্রাট বললেন, 'তোমার পছন্দে-অপছন্দে কিছুই এসে যায় না। কারণ আমি নরবলি পছন্দ করি। আমার রাজ্যে রোজই নরবলি হয়। আজও হবে। এখন ঘরের ভেতরে ঢোকো দেখি।'

নরবলি সম্বন্ধে সম্রাটের উদারতা দেখে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। মনে হল আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হবার চেষ্টা করছে।

ঘরের ভিতরে গিয়ে সম্রাট বললেন, 'তোমার কাছে একখানা বড়ো ছুরি আছে?'

জানালুম বড়ো বা ছোটো কোনওরকম ছুরিই আমার কাছে নেই।

সম্রাট এতক্ষণের পরে আমার হস্ত ত্যাগ করে বললেন, 'ওইখানে চুপ করে একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘরটা খুঁজে দেখি ছুরি কি কাটারি পাওয়া যায় কি না।'

পরমুহূর্তেই আমি মস্ত এক লাফ মেরে—সম্রাটের অগোচরেই ঘরের বাইরে এসে পড়লুম। তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলুম।

তখন ট্রেন এসে পড়েছে। আর-এক লাফে একখানা কামরার ভিতর গিয়ে পড়ে একেবারে বেঞ্চির তলায় ঢুকে অদৃশ্য হবার ব্যবস্থা করলুম।

সেই অবস্থায় বেঞ্চির তলায় উবু হয়ে শুয়ে হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে দেখি, কামরার ভিতর এসে ঢুকলেন একটি আধা-বয়সি মহিলা। হাতে ছাতা, খবরের কাগজ ও খানকয়েক কেতাব।

মহিলাটি ডাকলেন, 'কুলি, কুলি, স্টেশনে অত গোলমাল কীসের?'

কুলি বললে, 'গারদ থেকে একটা পাগলা পালিয়েছে।'

'সর্বনাশ!' বলে শিউরে উঠেই মহিলা গাড়ির দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন।

ট্রেন চলতে লাগল, খানিক পরে মহিলাটির দেহের উপরার্ধ একখানা খোলা খবরের কাগজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। অতিশয় নিঃশব্দে একটু একটু করে দেহ সরিয়ে বেঞ্চির তলা থেকে আমি আত্মপ্রকাশ করলুম।

তারপর বেঞ্চির উপর উঠে বসে একটা সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 'আঃ' শব্দটি উচ্চারণ করলুম।

যে-কামরাতে এতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে হঠাৎ এই মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনেই মহিলাটি এমন ভয়ানক চমকে উঠলেন যে, খবরের কাগজখানা তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। তাঁর মুখ একটা দেখবার মতন অপূর্ব জিনিস।

কিন্তু তিনি একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না। যেন একেবারে থ হয়ে গিয়েছেন।

যদিও মেয়েদের সামনে আমি আরও বেশি মুখচোরা হয়ে পড়তুম, তবু স্থির করলুম এঁর সঙ্গে দুই-চারিটা বাক্য-বিনিময় করা উচিত।

কারণ, ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়েছেন, প্রতিদিন আমাকে অন্তত তিনজন সম্পূর্ণ-অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

কিন্তু বাক্যালাপ করতে গিয়েই তোত্‌লামির বিপুল বন্যায় আমার কথা বলবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ করে, মহিলাটিরও দুই চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল।

তখন চট করে মনে পড়ে গেল ডাক্তারবাবুর আর একটি উপদেশ। সাধারণ ভাবে কথা কইতে না পারলে গানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

আমি গানের খুব মধুর সুরে বললুম, 'দেখছেন আজকের আকাশ কী চমৎকার সুনীল। আজ আর বৃষ্টির ভয় নেই, কী বলেন?'

মহিলাটি কিছুই বললেন না।

কিন্তু তার মুখ হয়ে গেল নীল নদের মতোই নীল। গদির উপরে হেলে পড়ে তিনি সভয়ে দুই চোখ মুদে ফেলে একেবারে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। বুঝলুম সুরে বা বেসুরে কোনও রকমেই এঁর সঙ্গে কথা চলবে না।

তখন কী আর করি, পকেট থেকে 'থার্মোফ্লাস্ক' বার করে নিয়ে চা পান করতে নিযুক্ত হলুম।

হঠাৎ একটা মোড় ফিরতে গিয়ে ট্রেনখানি বেজায় দুলে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে ফ্লাস্কটা নীচে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল সশব্দে।

মহিলাটি বিকট চিৎকার করে রবারের মতন উপরদিকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং দুই হাতে 'অ্যালার্ম চেন' ধরে দোদুল্যমান হলেন।

প্রথমটা আমি অতিশয় অবাক হয়ে গেলুম, কারণ বসে বসে কোনও মানুষ যে এমন উঁচু লাফ মারতে পারে আগে আমার সে ধারণাই ছিল না।

কিন্তু তারপরই যখন দেখলুম যে চলতি ট্রেন থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং চারিদিকে জাগল অনেক লোকের দ্রুত পায়ের শব্দ, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে করলুম লম্ফ ত্যাগ।

এক পলকেই দেখে নিলুম গাড়ি থেমেছে একটা ময়দানের মাঝখানে, এবং মাইল-খানেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা রীতিমতো বড়ো জঙ্গল। আমি সেই জঙ্গল লক্ষ্য করে দৌড় মারলুম।

দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমার সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারত না। স্থির করলুম সেই শক্তির দৌলতেই আজ আমাকে দেহের হাড় ও পিঠের চামড়া রক্ষা করতে হবে।

দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখতে পেলুম, দলে দলে লোক আমাকে ধরবার জন্যে নানা দিক থেকে ছুটে আসছে।

তাদের কেউ রেলের কর্মচারী, কেউ গাঁয়ের লোক, কেউ বা চাষী কি রাখাল। অনেকেরই হাতে লাঠি দেখতেও ভুললুম না।

গুনতিতে তারা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট জনের কম হবে না। এত তাড়াতাড়ি কী করে যে এত লোকের টনক নড়ল, সবিস্ময়ে সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজের পায়ের গতি দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ বাড়িয়ে দিলুম।

জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েও বুঝলুম, এই নাছোড়বান্দা জনতা এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করবার আশা ছাড়েনি।

একটা বেজায় ঝুপসি বটগাছের উপরে গিয়ে আত্মগোপন করলুম খুব সাবধানে। তারপর রাত যখন দশটা বাজল তখন আবার আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।

অটল, এই হচ্ছে আমার ইতিহাস।

অটল বললে, 'কিন্তু তোমার তোতলামি সারল কী করে সে কথা তো বললে না!'

নকুল বললে, 'ঠিক কোন মুহূর্তে আমার এই কণ্ঠদেশের ভিতর থেকে তোতলামির শিকড় নষ্ট হয়ে গেল, তা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু গভীর রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে সেদিন যখন লোকের কাছে আমার কথা জাহির করলুম— তখন আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলুম, আর আমি তোতলা নই। মহা বিপদের এক ধাক্কাতেই তোতলামি আমার গলদেশ ছেড়ে পলায়ন করেছে।

বিশ্বাস করো আর না করো এটা সত্যি কথা।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

কার্তিকপুজোর ভূত

নতুন মেসবাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এখনও ব্যবসাদারির গন্ধ বিকট ভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখনও মাছের ঝোলে আঁশ বা কাঁটার বদলে সত্যিকার মৎস্য পাওয়া যায়, এখনও ডাল বলতে বোঝায় না কেবল ঘোলাটে জল এবং এখনও আলুর দম বা কালিয়ায় তৈলের ব্যবস্থা হয়নি ঘৃতাভাবে।

তেতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তিন বন্ধুতে দিব্য আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করছিল। তিন বন্ধু অর্থাৎ অটল, পটল ও নকুলের কথা বলছি। কিন্তু একটু গোলমাল বাধল। চাঁদের আলো এবং ফুলের গন্ধের মতন মানুষের সুখ-শান্তিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভগবানের সৃষ্টি এইসব অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নিয়ে অটল, পটল ও নকুল একসঙ্গে বিলক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, কিন্তু সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি।—ব্যাপারটা এই।

সেদিন সকালবেলায় মেসের কর্তার ঘরে বসে অটল, পটল ও নকুল চা-পান ও হালুয়া ভক্ষণ করছে, এমন সময়ে একটি নতুন লোকের আবির্ভাব।

লোকটির মাথায় বাবরি-কাটা চকচকে চুল, গোঁফটির দুই প্রান্ত সুচারুরূপে পাকানো, গায়ের পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবির তলা থেকে রাঙা গেঞ্জির রং ফুটে বেরুচ্ছে, পায়েও রঙিন মোজা ও বাহারি জুতো। কিন্তু বেচারার শৌখিনতা প্রকাশের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একটিমাত্র কারণে। তার ডান চোখটি কানা।

কিন্তু তার সেই একটিমাত্র চক্ষু যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি চটুল ও চটপটে। ঘরে ঢুকেই বোধহয় আধ-সেকেন্ডের মধ্যেই সেখানে বিরাজমান চার মূর্তির আপাদমস্তক সে ভালো করে দেখে নিলে।

মেসের কর্তা শুধোলে, 'মশাই কী চান?'

—'আমার নাম ননিনাথ নাগ। এই মেসে বাসা বাঁধতে চাই। এখানে আগেও একবার বাসা বেঁধেছিলুম।'

—'তা কী করে হবে? আমার এ মেসের জন্ম হয়েছে মোটে এক মাস।'

—'তা হতে পারে। কিন্তু এখানে আগেও একটি মেস ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে তিন বৎসর।'

—'ও, বটে, বটে? এ খবরটা আমি জানতুম না।'

—'মশাই তাহলে নতুন মালিক? বেশ, বেশ! বলি, এখানে একখানা ঘর-টর খালি পাওয়া যাবে?'

—'দোতলার সব ঘর ভরতি। তেতলায় একখানা ঘর খালি আছে—'

ননি একেবারে আঁতকে উঠে একটিমাত্র চক্ষুকে দুইগুণ বাড়িয়ে তুলে বললে, 'ওরে বাপ রে, তেতলায়? অসম্ভব!'

—'অসম্ভব? কী অসম্ভব?'

—'তেতলায় থাকা।'

—'কেন?'

—'আগে এখানকার তেতলায় কেউ থাকত না। অর্থাৎ থাকতে চাইত না।'

—'কেন?'

—'আগে তেতলায় ওঠবার সিঁড়ির দরজায় লাগানো থাকত তালা-চাবি।'

—'কেন মশাই, কেন?'

—'আগে সন্ধের পর কেউ এখানে তেতলার নাম পর্যন্ত মুখে আনত না।'

—'আরে মশাই,—কেন, কেন কেন? নিজের মনে খালি বক-বকই করে যাচ্ছেন, আসল কথা বলবার নাম নেই।'

ননি মালিকের মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে একটিমাত্র চক্ষু মুদে বললে, 'নিতান্তই শুনবেন তাহলে?'

—'নিশ্চয় শুনব। আলবত শুনব। না শুনে আপনাকে ছাড়ব না। এমন খাসা তেতলার চারিদিক-খোলা ঘর, কেন এখানে কেউ থাকত না?'

ননি কণ্ঠস্বর নামিয়ে, অদ্বিতীয় চক্ষুটিকে প্রাণপণে বিস্ফারিত করে বললে, 'আজ্ঞে, তেতলায় যে একজন আছেন।'

অটল চায়ের পেয়ালা নামিয়ে এতক্ষণ পরে বললে, 'একজন আছেন মানে?'

পটল বললে, 'কে বলে একজন? আমরা হচ্ছি তিনজন।'

নকুল বললে, 'হ্যাঁ, তিনখানা ঘরে আছি আমরা তিনজন।'

ননি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'ভালো কাজ করেননি।'

মালিক খাপ্পা হয়ে বললে, 'এসব কথার মানে? আপনি কি আমার মেসের লোক ভাঙাতে এসেছেন?'

—'তাতে আমার লাভ?'

—'তবে এত বাজে বকছেন কেন?'

—'বেশ মশাই, আমি আর কিছু বলতে চাই না। একতলার কোনও ঘর যদি খালি থাকে তো বলুন। না থাকে, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ধুলো-পায়েই প্রস্থান করব।'

—'একতলার তিনখানা ঘর খালি আছে, আপনি যেটা খুশি নিতে পারেন।'

অটল বললে, 'কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন। আমাদের কৌতূহল আবার যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়, ততক্ষণ আপনাকে এইখানেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে।'

পটল বললে, 'তেতলা আপাতত আমাদের অধিকারে। সুতরাং আসল কথা জানবার অধিকার আমাদের আছে।'

নকুল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তেতলায় একজন আছেন মানে কী?'

ননি একখানা 'মোড়া' টেনে নিয়ে বসে পড়ে নাচার ভাবে বললে, 'তবে সব কথাই শুনুন মশাই। এই মেসবাড়ির তেতলায় বাস করেন গদাধর গাঙ্গুলি।'

মালিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'আপনি কি পাগল?'

অটলও বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'গদাধর গাঙ্গুলি! তিনি থাকেন তেতলায়, অথচ আমরা কেউ জানি না। আমাদের তিন জোড়া চোখ কি অন্ধ?'

ননি বললে, 'লক্ষ জোড়া চর্মচক্ষু থাকলে গদাধর গাঙ্গুলিকে দেখা যায় না। তিনি অশরীরী।'

পটল ও নকুল চমকে উঠে বললে, 'কী বললেন?'

—'তিনি অশরীরী। আহা, একদা তিনিও শরীরী ছিলেন। তিন বছর আগে আমি যখন এই মেসে ছিলুম, তার কিছু আগেই তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।'

অটল, পটল ও নকুলের দেহ রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মালিক হতভম্বের মতন কেবল বললে, 'মানে?'

ননি বললে, 'মানে হচ্ছে এই। আমি এই মেসে আসবার কিছুকাল আগে, তেতলার একটি ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে গদাধর গাঙ্গুলি নামে একটি ভদ্রলোক আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন।'

মালিক বললে, 'এতক্ষণ পরে তবু কিছু হদিস পাওয়া গেল। তারপর?'

—'তারপর কিন্তু দেহত্যাগ করেও গদাধরবাবু এই মেসের তেতলার ঘরের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। অনেকেই তাঁকে তেতলার ছাদে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখেছে—এমনকি তাঁর শখের গান গাইতে শুনেছে।'

—'শখের গান?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমিও দোতলা থেকে তাঁর শখের গানটি শুনেছি।'

—'সেই শখের গানটি কী?'

ননি সুরে বললে—

'বাজে তালি, বাজে ধামা।
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা-রে-গা-মা।

ধেড়ে-কেটে, তেড়ে-কেটে—লেগে যায় তাক।
মোর গীতে ভেঙে যায় দুনিয়ার জাঁক।
দীপকের তা-না-না-না,
শুনে যাও মামি-মামা।
গিটকিরি শুনে ডেকে ওড়ে কাক-চিল,
উৎসাহে নিধু মারে যাকে-তাকে কিল।
ছোটে গাধা, ছোটে ধোপা,
ছোটে খোকা দিয়ে হামা।'

মালিক অভিভূতের মতন বললে, 'আহা, কী গান। শুনলে অশ্রুবর্ষণ করা অনিবার্য।'

অটল করুণভাবে বললে, 'নিশ্চয়। আমারও পাষণ্ড চক্ষু সজল হবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি ওই তেতলাতেই থাকি।'

পটল সায় দিয়ে বললে, 'আমারও ওই অবস্থা—যদিও এখনও গদাধরবাবুর নিজের মুখের গান শোনবার সৌভাগ্য হয়নি।'

নকুল ম্রিয়মান ভাবে বললে, 'বোধহয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা রাত দশটা বাজবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।'

ননি বললে, 'ঠিক আন্দাজ করেছেন। যাঁরা পৃথিবীর দেহ ত্যাগ করেও পৃথিবীতে বাস করেন, রাত বারোটা বাজবার আগে তাঁদের দেখা পাওয়া অসম্ভব।'

অটল বললে, 'তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কিছুমাত্র ব্যাকুল নই।'

ননি বললে, 'ব্যাকুল না হতে পারেন, কিন্তু আমি শুনেছি, গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে এক দিন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে জোর করে আলাপ করবার চেষ্টা করেন। সেদিন নাকি ইচ্ছা করলেই সবাই তাঁকে দেখতে পায়।'

মালিক বললে, 'মানে?'

—'গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে এক রাত্রে তাঁর বাৎসরিক কর্তব্যপালন করতে আসে।'

—'মানে?'

—'যে তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রতি বৎসরে ঠিক সেই তারিখেই গদাধরবাবু আবার চর্মচক্ষুগোচর দেহ ধারণ করেন। আবার আফিম খান। আবার আর্তনাদ করেন। এবং তারপর আবার মরেও মারা পড়েন।'

মালিক বললেন, 'রাত বারোটার পরে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রাত বারোটার পরে কলকাতার কোনও আফিমের দোকান খোলা থাকে না।'

—'মশাই, এসব হচ্ছে পরলোকের কথা। পরলোকে কোন দোকান কখন বন্ধ হয়, আমি তা কেমন করে বলব? ইহলোকের সমস্ত আমার নখদর্পণে—কোন পাড়ায় ক-টা গাঁজা-আফিমের দোকান আছে তাও বলে দিতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরলোক সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।'

মালিক ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'এইসব গাঁজাখুরি গল্প বলে আপনি কি আমার মেসবাড়ির দরজা বন্ধ করতে এসেছেন?'

ননিও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'গাঁজা? আমি ভদ্রলোক। গাঁজার দোকানের ঠিকানা জানি বটে, কিন্তু গাঁজা কাকে বলে জানি না। আমি এসেছি মেসের একখানি ঘর নিতে। একতলায় একখানি ঘর পেলেই আমি খুশি হব।'

মালিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন। কিন্তু আপনাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি আগাম টাকা চাই।'

ননি বললে, 'তাই নিন না। এ বাড়ির তেতলার ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই যেতে আমি প্রস্তুত। বিশেষ আজকের রাত্রে।'

মালিক বললেন, 'আজকের রাত্রে? মানে?'

ননি বললে, 'গদাধরবাবু মরদেহ ত্যাগ করেন নাকি কার্তিকপুজোর রাত্রে। তিনি বাৎসরিক ব্রত পালন—অর্থাৎ আবার আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করতে আসেন ঠিক সেই রাত্রেই। এটা তাঁর কী খেয়াল জানি না, কিন্তু শুনেছি, কার্তিকপুজোর রাত্রে তিনি আবার একবার দেহত্যাগ করবার অভিনয় না করে থাকতে পারেন না। অনেকটা সাপের খোলস ত্যাগের মতনই আর কী! চলুন মশাই, এসব বাজে কথা থাক। একতলায় আমাকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।'

ননিকে নিয়ে মালিক প্রস্থান করলে।

অটল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে হঠাৎ থেমে বললে, 'আজই কার্তিক-পুজো।'

পটল দুঃস্বপ্নাভিভূতের মতন বললে, 'কিন্তু গদাধরবাবু যে কোন ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আফিম খেয়ে তাঁর বাৎসরিক ব্রত পালন করেন সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হল না।'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে নকুল বললে, 'জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। যতটুকু শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট। আজ যদি সৌভাগ্যক্রমে গদাধরবাবুর সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে কালকেই এ বাসাকে নমস্কার করে সরে পড়ব।'

অটল ও পটল একসঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতন বললে, 'হ্যাঁ।'

সে-রাত্রে অটল, পটল ও নকুল এক-এক খানা ঘরে একলা থাকা যুক্তিসঙ্গত বা নিরাপদ বলে মনে করলে না। পটল ও নকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ করে এসে অটলের বিছানার ডান বা বাম পাশে নিজেদের বিছানা পেতে নিলে।

গদাধরবাবুকে বাধা দেবার জন্যে অটল ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করে দিতে লাগল।

পটল বললে, 'অটল, ননির কাহিনি বিশ্বাস করলে বলতে হয়, গদাধরবাবু হচ্ছেন সূক্ষ্মদেহধারী। সূক্ষ্মদেহের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইট-কাঠ-পাথরও ভেদ করে আনাগোনা করা যায়।'

নকুল বললে, 'পটল, স্তব্ধ হও। সাবধানের মার নেই।'

নিজের বিছানার উপরে এসে বসে অটল বললে, 'ঘড়িতে দেখছি রাত দশটা বাজে। ঘুমোবার সময় হল। কিন্তু আজ আমরা কী করব? ঘুমব? না গদাধরের আগমন-প্রতীক্ষা করব?'

নকুল হাই তুলে বললে, 'রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। মারাত্মক বললেও চলে।'

পটল লেপের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'আমারও ওই মত। গদাধরবাবুর বাৎসরিক অভিনয় দেখবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ঘুমিয়ে তাঁকে ফাঁকি দিতে চাই।'

অটল বললে, 'আমার বিশ্বাস, গদাধরবাবুর কথা হচ্ছে রীতিমতো উপকথা। উপদেবতার কথা মাত্রই উপকথা। সুতরাং অকারণে জেগে থেকে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আলো নেবাও—ঘুমিয়ে পড়ো।'

...মিনিট-পাঁচেক পরেই তিনটি তন্দ্রা-পুলকিত নাসা-যন্ত্রের প্রচণ্ড ঘড়র-ঘড়র-মন্ত্রে একান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেওয়ালবাসী টিকটিকিরা পর্যন্ত 'ভেন্টিলেটারে'র ভিতর দিয়ে বাইরে পলায়ন করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারা এতদিন এক অটলের নাসিকা-ধ্বনিকে কোনওক্রমে সহ্য করে ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অটল-পটল-নকুলের তর্জনগর্জনময় নাসা-ভাষা! এ হচ্ছে দস্তুরমতন মেছোহাটার কোলাহল। যে-কোনও জীবের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব।

কার্তিক মাসের শেষ তারিখের ভিজে হিমেল হাওয়া। কনকন কনকন! অটলের ঘুম গেল ছুটে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বলে উঠল, 'ওরে বাপ রে বাপ! কী ঠান্ডা!'

সবচেয়ে-বেশি শীত-কাতুরে নকুল এর আগেই জেগে উঠেছিল। সে লেপের মাঝখানে ঢুকে গিয়ে ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি 'এভারেস্টে'র সর্বোচ্চ শিখরের উপরে আরোহণ করে আছাড় খেয়েছি।'

পটল বাক্যব্যয় করলে না। এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুল।

অটল বললে,—বিস্মিত, হতভম্ব স্বরেই বললে, 'কিন্তু হাওয়া আসে কোত্থেকে? আমি নিজের হাতেই সব জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।'

নকুল একটিমাত্র চক্ষু উন্মোচন করে বললে, 'শার্সিহীন পুরনো জানলা, আলগা ছিটকিনি—হয়তো জোর-হাওয়া লাগলেই খুলে যায়।'

—'হতে পারে। কিন্তু এর আগে ওই উত্তুরে জানলাটা এমন অসময়ে আর কখনও খুলে যায়নি'—এমনি গজ গজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে অটল সশব্দে আবার জানলাটা বন্ধ করে দিল।...

তারপর পুনর্বার ত্রিনাসিকা মুখর হয়ে উঠল... এবং খানিক পরে আবার ভালো করে ঘুমোতে না ঘুমোতেই ভেঙে গেল তাদের ঘুম। সেই ঠান্ডা হাড়-কাঁপানো বাতাস। উত্তরের জানলাটা আবার খুলে গিয়েছে।

অটল চিন্তিত ভাবে বললে, 'ব্যাপারটা ভালো বলে বোধ হচ্ছে না।'

পটল বললে, 'রীতিমতো সন্দেহজনক। জানলার এমন ব্যবহারের কল্পনা করা যায় না! ...নকুল, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো?'

নকুল দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'লেপের বাইরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।'

অটল বললে, 'নকুল, তুমি দেখছি মস্ত কাপুরুষ। একটা জানলা বন্ধ করবার সাহসও তোমার নেই? রাবিস।' সে শয্যাত্যাগ করবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল।

নকুল শীতার্ত কণ্ঠে বললে, 'বারোটা!'

পটল ম্রিয়মান স্বরে বললে, 'প্রেত-নগরের সিংহদ্বার এইবারে খুলে গেল।'

অটল জানলা বন্ধ করবার জন্যে আর শয্যাত্যাগ করবার চেষ্টা করলে না। ঝাঁ ঝাঁ রাতে ডাকছে খালি ঝিঁঝি পোকারা। শহরের আর সব শব্দই যে ভয়ে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু নীরবতার বক্ষ ভেদ করে একটা সুর শোনা যাচ্ছে না?'

সুরটা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে যেন বাইরে ছাদের কোণ থেকে গুন গুন করে গাইছে—

'বাজে তালি, বাজে ধামা!
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাহি সা-রে-গা-মা!'

অটল আড়ষ্ট ভাবে বললে, 'ইস, এ-যে গদাধরবাবুর গান!'

পটল বললে, 'নকুল, ভাই আমার। চটপট জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো।'

নকুল বললে, 'পাগল! গদাধরবাবু এসে আমাকে টানাটানি করলেও আমি আর লেপের ভেতর থেকে বেরুব না।'

গান থামল। ছাদের উপরে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ।

অটল ক্ষীণ স্বরে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, গদাধরবাবু এই ঘরে এসেই আফিম খেতে চান।'

পটল আর নকুল একেবারে বোবা হয়ে গেল,—বোধহয় তারা ভাবলে, বোবার শত্রু নেই।

পায়ের শব্দ থেমে গেল। খানিকক্ষণ সব নিঃসাড়। তারপরই একটা নতুন-রকম ভয়াবহ শব্দ—ঠক ঠক, ঠক! শব্দ হচ্ছে ঘরের ভিতরেই—পূর্ব দিকে! এ যেন মাংসহীন অস্থিসার পায়ের শব্দ।

অটলের মাথার চুলগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে এবং দেহ হয়েছে অসম্ভব-রকম রোমাঞ্চিত। তবু সে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি না জ্বেলে থাকতে পারলে না।

ঘরের কোথাও কেউ নেই। পটল আর নকুল দুজনেই লেপের তলায় অদৃশ্য।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। তারপর আবার ঘরের ভিতরে শব্দ হল—ঠক, ঠক ঠক! ঠক ঠকাঠক, ঠকাঠক, ঠকাঠক।

শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে অটল ভাবতে লাগল, অতঃপর কী করা উচিত?....হঠাৎ তার মনে পড়ল প্রেততত্ত্ববিদদের কথা। প্রেতেরা নাকি প্রায়ই শব্দের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। গদাধরবাবুও কি শব্দ করে কোনও কথা বলতে চাইছেন?

অত্যন্ত কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে অটল বললে, 'এ ঘরে যদি কেউ এসে থাকেন, তাহলে দয়া করে শুনুন। আমি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিন। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার শব্দ হলে বুঝব—'হ্যাঁ', আর দু-বার শব্দ হলে বুঝব—'না'।'

ঠক, ঠক, ঠক, ঠক, ঠক, ঠক।

—'মশাই, অতবেশি শব্দ করে ভয় দেখালে মারা পড়ব। শুনুন। আপনি গদাধরবাবু?'

একবার শব্দ হল—ঠক। অর্থাৎ—'হ্যাঁ'।

—'আপনি কি বেঁচে আছেন?'

দু-বার শব্দ হল—ঠক, ঠক। অর্থাৎ—'না'।

দুই হাতে চেপে নিজের হৃৎকম্প থামবার চেষ্টা করে অটল বললে, 'আপনি কি এখানে আফিম খেতে এসেছেন?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

—'আপনি কি আজ আফিম না খেয়ে থাকতে পারবেন না?'

—ঠক, ঠক। 'না'।

—'আমরা এখানে থাকলে আপনি কি রাগ করবেন?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

—'আপনি নিশ্চয় আমাদের আক্রমণ করতে চান না?'

—ঠক। 'হ্যাঁ'।

পরমুহূর্তেই অটলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতা-পা-ওয়ালা মস্ত একটা দেহ। অটল বিছানা থেকে ছিটকে মেঝেয় গিয়ে পড়ে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। এবং তার পর-মুহূর্তেই পটল বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাপ রে, গদাধর আমার ঘাড়ে চেপেছে রে!'

তারপরেই দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং সেই অবস্থাতেই অটল বেশ বুঝতে পারলে যে, পটল ও নকুল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দুম-দাম শব্দে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সে-ও তৎক্ষণাৎ গদাধরবাবুকে ফাঁকি দিয়ে শুয়ে-শুয়েই সরীসৃপের মতন সড়াৎ করে দরজার কাছে সরে গেল, তারপর উঠেই বাইরের ছাদের দিকে মারলে এক লম্বা লাফ।

অটল, পটল আর নকুল হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দার উপর নেমে দেখলে, এত রাতে সাত-পাড়া কাঁপানো গোলমাল শুনে মেসের সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেরই ব্যস্ত কণ্ঠে একই জিজ্ঞাসা—ব্যাপার কী, ব্যাপার কী?

বারান্দার উপরে তিন জোড়া পা ছড়িয়ে বসে পড়ে তিন মূর্তি হাঁপাতে লাগল তিনটে হাপরের মতন। মেসের মালিক শুধোলেন, 'ও অটলবাবু, কী হয়েছে বলুন না!'

অটল বাধো বাধো গলায় বললে, 'গদাধরবাবু আমার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিলেন।'

পটল বললে, 'না অটল। ভয়ের চোটে তোমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিলুম আমিই। আর গদাধরবাবু লাফ মেরেছিলেন আমার পিঠের উপরেই। আমার প্রতি তাঁর এই অন্যায় পক্ষপাতিত্বর মানে হয় না।'

নকুল বললে, 'না পটল। পালাতে গিয়ে তোমার ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম আমিই। অন্ধকারে তুমি বুঝতে পারোনি।'

মালিক অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হো হো করে হেসে বললে, 'এরই নাম রজ্জুতে সর্পভ্রম! গদাধরবাবু হচ্ছেন গাঁজাখুরি গল্পের নায়ক। যান মশাই, যে-যার ঘরে যান। মিথ্যেই আমাদের ঘুম ভাঙালেন।'

অটল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, 'মাপ করতে হল মাশাই! কে ঘরে যাবে? সেখানে গদাধরবাবু এতক্ষণে হয়তো আফিম গুলতে শুরু করেছেন।'

মালিক বিপুল বিস্ময়ে বললে, 'মানে?'

অটল বললে, 'হতে পারে দুরাত্মা পটল নির্বোধের মতন আমার ওপর ঝাঁপ খেয়েছিল, কিন্তু—'

পটল বললে, 'হতে পারে কাপুরুষ নকুল ভয়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপরে হোঁচট খেয়েছিল, কিন্তু—'

নকুল বললে, 'কিন্তু আমাদের এই ভ্রমের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তেতলায় গদাধরবাবু নেই। কারণ আমরা সবাই স্বকর্ণে তাঁর মার্কা-মারা গান, তাঁর পায়ের শব্দ আর ঠকঠক ভাষায় তাঁর কথা শুনেছি।'

মালিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তাই তো, শুনেছেন নাকি?'

অটল বললে, 'নিশ্চয়! শুনেছি বলেই তো ভয় পেয়েছি।'

মেসের আর কেউ ননির গল্প শোনেনি। সকলের কণ্ঠে একই প্রশ্ন জাগল—গদাধরবাবু কে?

মালিকের ইচ্ছা নয় যে, গদাধরবাবুর কাহিনি আর কারুর কর্ণগোচর হয়। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'গদাধরবাবু হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, তাঁকে নিয়ে আপনাদের কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অটলবাবু, পটলবাবু, নকুলবাবু! আপনারা আমার ঘরেই আসুন। পিসেমশাই এত রাতে আপনাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আফিমের মৌতাত মাথায় চড়লে পিসেমশাইয়ের আর কোনও জ্ঞান থাকে না,—আরে ছোঃ!'

সকালের আলো দেখে তাদের পলাতক সাহস আবার প্রত্যাগমন করলে। মেসের মালিককে নিয়ে অটল নিজের ঘরে এসে ঢুকল, পটল এবং নকুলও গেল নিজের নিজের ঘরে! বলা বাহুল্য, বাৎসরিক ব্রত পালন করে গদাধরও তখন অদৃশ্য হয়েছে।

অটল কৌতূহলী ভাবে ঘরের এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে, এমন সময়ে পটল ঝড়ের মতন ছুটে এসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে। আমার দরজার তালা ভাঙা, ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা। আমার দশখানা দশ টাকার নোট চুরি গিয়েছে।'

তারপরে—প্রায় তার পিছনে-পিছনেই ছুটে এসে নকুলও সমাচার দিলে, তার বাক্সের ভিতর থেকে উধাও হয়েছে একশো পনেরো টাকা আট আনা।

অটল চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার চাবির

তোড়া থাকত মাথার বালিশের নীচে। বালিশ তুলে দেখা গেল, চাবি নেই—কিন্তু একখানা চিঠি আছে।

চিঠিখানা এই:

'অটল-পটল-নকুলবাবু,—

কাল সকালে গদাধর-কাহিনি বলে আমি বেশ একটি ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছিলুম—নয়? তারপর সেই আবহ রাত্রে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল দুই-দুই বার খোলা জানলা দেখে,—কী বলেন?

কিন্তু একটু কম-ভিতু হলে আপনারা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতেন যে, বাহির থেকে অনায়াসেই খড়খড়ির পাখি তুলে হাত দিয়ে ছিটকিনি সরিয়ে জানলা খোলা যায়।

এ ঘরের 'ভেন্টিলেটারে'র ছ্যাঁদা বড়ো হওয়াতে আমার ভারী সুবিধা হয়েছে। ওই পূর্ব দিকের মাঝের জানলার উপরকার 'ভেন্টিলেটারে'র ফাঁক দিয়ে 'টোন-সুতোর ডগায় একখণ্ড নুড়ি বেঁধে বাহির থেকে আমি ঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম, আর সুতোর অন্য প্রান্ত ছিল আমার হাতে। এই হচ্ছে ঠক ঠক আওয়াজের গুপ্ত কারণ! বাহির থেকে কান পেতে আমিই সুতোয় টান মেরে অটলবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

গদাধরবাবুর গানটি এই অধীনেরই রচনা। ওটি কোনও মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিতে পারবেন?

আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের তেতলা থেকে তাড়ানো। কেন, তা বলা বাহুল্য।

আর বোধহয় মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না—বিদায়।

ইতি—

আপনাদের শ্রীননি

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

দেড়-ডজন জাহাজি-গোরা

কার্তিকপুজোর ভূতের ব্যাপারের পর কিছুকাল কেটে গেল বেশ নির্বিঘ্নে।

মেসবাড়ির অন্যান্য লোকগুলি ছিল অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারি। কেউ সরকারি আপিসে, কেউ সওদাগরি আপিসে, কেউ-বা রেল আপিসে ছোটোখাটো চাকরি করে। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দু-চারটে ভাত গুঁজে ছুটে আপিসে বেরিয়ে যায়, তারপর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসে বেশ খানিকক্ষণ ধুঁকতে থাকে; তখন তারা আর দুনিয়ার কোনও খবর নিয়েই বিশেষ মাথা ঘামাতে চায় না বা পারে না।

হঠাৎ একদিন এই ভেড়ার দলে সিংহের মতন এসে পড়ল একটি নতুন লোক। নাম তার নন্দলাল। মাথায় সে সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু এবং চওড়াতেও তার বপুখানি রীতিমতো

দেখবার মতন। সে কথা কয় জোরে জোরে, দুই হাত নাড়ে জোরে জোরে, মাটির উপর পা ফেলে জোরে জোরে। তাকে দেখলে প্রথমেই মনে জাগে কেমন-একটা আতঙ্ক! কালো রঙের উপরে তার মুখে ঝাঁটার মতন গোঁফ, আর দরোয়ানের মতন গালপাট্টা দেখলে মনের আতঙ্ক আরও বাড়ে বই কমে না। তার মাথার চুলগুলো বুরুশ-চিরুনির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে সর্বদাই হয়ে থাকত বিশৃঙ্খল এবং শজারুর পৃষ্ঠদেশের মতন কণ্টকিত।

হপ্তা-খানেকের মধ্যেই তার স্বভাবেরও যেটুকু নমুনা পাওয়া গেল তা বড়ো সুবিধাজনক নয়। বিপজ্জনকই বলা উচিত।

মেসের খাবারঘরে বসে অটল, পটল আর নকুল দক্ষিণ-হস্তের কর্তব্য সম্পাদন করছে, এমন সময় নন্দ সেই ঘরে ঢুকে বললে, 'ঠাকুর, আমাকে খাবার দাও।'

ঠাকুর বললে, 'আজ্ঞে, বসুন।'

নন্দ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভালো করে জাঁকিয়ে বসে বললে, 'ঠাকুর, আজ দেখলুম না তোমাদের মস্তবড়ো একটা রুইমাছ এসেছে?'

ঠাকুর বললে, 'হ্যাঁ বাবু, আজকের মাছটা খুব বড়ো।'

নন্দ বললে, 'মাছের মুড়ো দিয়ে কী রাঁধছ বাপু?'

ঠাকুর বললে, 'আজ্ঞে, মুড়োটা কালিয়ায় দিয়েছি। পটলবাবু বেশি দাম দিয়ে খেতে চান।'

নন্দ বললে, 'পটলবাবু আবার কে?'

পাচক পটলকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওই যে, পটলবাবু বসে আছেন।'

পটলের দিকে তাকিয়েই নন্দ হা হা হা হা করে, ঘর-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর অত্যন্ত অবহেলা-ভরে বললে, 'আরে রাম, রাম, ওই তো তালপাতার সেপাই, অতবড়ো মুড়ো ও-দেহে সহ্য হবে কেন? আমি বেশি দামও দিতে পারি, একটা সের-তিনেক মাছ হজমও করতে পারি, মুড়োটা আমায় দিয়ো।'

পাচক দ্বিধাভরে পটলের মুখের পানে তাকালে।

পটলের মুখ তখন রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধস্বরে সে বললে, 'ঠাকুর, ও মুড়ো আমার। এখনই আমার পাতে দিয়ে যাও।'

নন্দ চিৎকার করে বললে, 'কী মশাই, মুড়োটা কি আপনি গায়ের জোড়ে কেড়ে নিতে চান? তাহলে জেনে রাখুন, এর আগেও কেউ কেউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরের বড়াই করেছে। কিন্তু তার ফলে তাদের কোথায় যেতে হয়েছে জানেন? হাসপাতালে মশাই, হাসপাতালে।'

নকুল নন্দের দেহের দিকে তাকিয়ে পটলের কানে কানে বললে, 'চেপে যাও ভাই, চেপে যাও। ও মুড়ো চুলোয় যাক।'

পটল চেপেই গেল।

এমনি ব্যাপার হামেশাই হতে লাগল। রান্নাঘরের যা-কিছু ভালো খাবার সবই গিয়ে হাজির হয় নন্দের থালায়। মেসবাড়ির মালিকও নন্দকে ভয় করতে লাগলেন যমদূতের মতন। আপিসের কেরানি-বেচারা তো নন্দের দিকে ভয়ে মুখ তুলে তাকাতেই পারে না। সমস্ত মেসবাড়ির ভিতরে একমাত্র প্রভু ও কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়ে উঠল নন্দলালই।

একদিন সন্ধেবেলায় অটল বাজাচ্ছে হারমোনিয়ম, পটল নিয়েছে তবলার ভার এবং নকুল গাইছে থিয়েটারি আবু হোসেনের একটি গান। সেদিন অটল ও পটল ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে কিছু টাকা হস্তগত করেছিল; গান-বাজনার দ্বারা সেই আনন্দকেই তারা স্মরণীয় করে তুলতে চায়। তাদের দলে একমাত্র গায়ক ছিল নকুল, বাংলা থিয়েটারের সব গানই তার প্রায় মুখস্থ।

নকুল গানের মধ্যে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে দুই চোখ মুদে গাইছে—

'আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে,
বুঝেছি শিখেছি ঠেকে,
সোনার ছবি ভেঙে গেছে।'

এমন সময় ঘরের দরজার কাছে জাগল একটা হুঙ্কার। অটলের হারমোনিয়ম, পটলের তবলা থেমে গেল, নকুলও চমকে গান থামিয়ে চোখ চেয়ে দেখলে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দলালের বিপুল বপু!

নন্দলাল ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'এসব কী হচ্ছে শুনি?'

অটল বললে, 'কী হচ্ছে বুঝতে পারছেন না? গান-বাজনা হচ্ছে।'

নন্দ বললে, 'বাজনা যে বাজছে তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু নকুলবাবু করছিলেন কী?'

পটল বললে, 'নকুলবাবু গান গাইছিলেন।'

নন্দ তার ভাঁটার মতন চোখ আরও বিস্ফারিত করে বললে, 'গান! নিমতলার মড়াকান্নাকে আপনারা গান বলে চালাতে চান? ওসব এখানে চলবে না মশাই। যতদিন আমি এখানে আছি, ততদিন ওসব চলবে না। মনে রাখবেন, সাবধান করে দিয়ে গেলুম।'

নন্দের পায়ের শব্দ যখন তেতলা থেকে দোতলার সিঁড়ির উপরে নেমে মিলিয়ে গেল, অটল হারমোনিয়মটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'জীবন যে ভারবহ হয়ে উঠল হে।'

নকুল বললে, 'যেখানে আমার গানকে মড়াকান্না বলে সন্দেহ করা হয়, সেখানে আর আমি থাকতে চাই না।'

পটল বললে, 'পাগল নাকি, আমার যাব কেন? ওই ভুঁইফোড়টাকেই এখান থেকে বিদায় করতে হবে।'

অটল বললে, 'কেমন করে বিদেয় করবে? মেসের কর্তাও ওকে ভয় করেন। ওটা হচ্ছে গুন্ডা।'

পটল বললে, 'গুন্ডা-ফুন্ডা আমি মানব না। আমি রুইমাছের মুড়ো খেতে ভালোবাসি, ওর জন্যে আমার পাতে আর মুড়ো পড়ে না। এসো, ভেবে-চিন্তে ঠিক করা যাক কী ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লে নন্দের দর্প চূর্ণ হয়।'

দিন-তিনেক ধরে অটল, পটল ও নকুল রীতিমতো মাথা ঘামাতে লাগল।

অবশেষে প্রথম মাথা খুলে গেল নকুলের। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে, উপায় হয়েছে।'

অটল ও পটল সাগ্রহে বলে উঠল, 'কী উপায় ভাই, কী উপায়?'

নকুল বললে, 'আমার চেয়ে তোমাদের দুজনের গায়ে ঢের-বেশি জোর আছে। তোমরা দুজনে নন্দকে একদিন রাস্তায় ধরে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসবে।

অটল বললে, 'ধ্যেৎ। ভারী উপায়ই বাতলালেন!'

পটল বললে, 'তারপর ও যখন আমাদের নামে থানায় গিয়ে নালিশ করবে?'

নকুল বললে, 'নালিশ করবে কার নামে? তোমাদের চিনতে পারলে তো? তোমরা যে ছদ্মবেশ ধারণ করবে।'

অটল বললে, 'ছদ্মবেশ!'

নকুল বললে, 'হ্যাঁ। কলকাতায় এখন কত কাফ্রি সেপাই এসেছে দেখেছ তো? তোমাদের খাকি পোশাক আছে। আর আমি তোমাদের জন্যে এক-রকম বিলিতি কালো রং নিয়ে আসব। হাতে আর মুখে তোমরা সেই রং মাখবে। তারপর মাথার টুপি আর খাকি পোশাক পরে সন্ধ্যার পরে রাস্তায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর নন্দ যখন একলা পথ দিয়ে ফিরে আসবে, সেই সময় তোমরা দুজনে মিলে তাকে ধরে—বুঝেছ? এই 'ব্ল্যাক আউটে'র রাত্রে তোমাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়া অসম্ভব!'

অনেক আলোচনার পর সেই ব্যবস্থাই ঠিক হল।

তিন দিন পরে। নন্দ বলে গেল, 'ঠাকুর, আজ আমি থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। আমার জন্যে খাবার চাপা দিয়ে রাখবে।'

রাত বারোটার সময় নন্দ যখন পাগলা ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মেসের ভিতরে এসে ঢুকল, তখন সারা বাড়ির সকলেরই ঘুম গেল ভেঙে। মেসের মালিক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক ভাড়াটিয়া ও ঝি-চাকর পর্যন্ত হই হই করে ছুটে নীচে নেমে এসে দেখলে, উঠানের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে হাপরের মতন হাঁপাচ্ছে নন্দলাল। তার ডান চোখটা আগের মতন ফুলে উঠেছে, তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফর্দা-ফাঁই এবং তার এক পায়ে জুতো নেই।

মেসের মালিক সবিস্ময়ে বললে, 'একী ব্যাপার নন্দবাবু, একী ব্যাপার!'

নন্দ গর্জন করে বললে, 'War! War! রীতিমতো যুদ্ধ! আজ আমি যুদ্ধ করে এসেছি!'

মালিক আরও বেশি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'যুদ্ধ করে এসেছেন! বলেন কী মশাই? কার সঙ্গে?'

নন্দ বললে, 'কার সঙ্গে আবার? দেড়-ডজন জাহাজি গোরার সঙ্গে। ব্যাটারা মদ খেয়ে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল। হুঁ হুঁ, ব্যাটারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। আমি একলাই তাদের এমন হাল করে ছেড়েছি যে, আর তারা কখনও বাঙালিপাড়ায় মুখ বাড়াতে ভরসা করবে না।'

মালিক তারিফ করে বললে, 'বাহাদুর নন্দবাবু, বাহাদুর। কিন্তু তারা যে আপনার গোঁফের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, এইটেই হচ্ছে পরিতাপের বিষয়।'

নন্দ বললে, 'আধখানা গোঁফ তো তুচ্ছ ব্যাপার মশাই, বাঙালির মান রাখবার জন্যে আমি গোটা প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলুম।

....আরও বেশি রাতে কালো র‍্যাপারে দেহ ও মুখের প্রায় সবটাই ঢেকে অটল ও পটল কখন যে তেতলায় গিয়ে উঠল, কেউই তা টের পেলে না।

পরের দিন তেতলায় আর-এক বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল।

অটল বলছে, 'নকুল, আমি তোমায় হত্যা করব।'

পটল বলছে, 'তুমি এ কী সর্বনেশে কালো রং কিনে এনেছ? একবাক্স সাবান খরচ করে ফেললুম, তবু এ-রং একটুও ফিকে হবার নাম করছে না!'

নকুল বললে, 'ও-রং যে এত পাকা, আমি কেমন করে জানব ভাই? তবে আমার বিশ্বাস মাস-খানেক ধরে সাবান, সোডা আর সাজিমাটি ব্যবহার করলে রংটা পাকা হলেও ধীরে ধীরে উঠে যেতে পারে।'

অটল চাপা-গলায় গর্জন করে বললে, 'মাস-খানেক ধরে? এই মাস খানেক ধরে আমরা আর কারুকে মুখ দেখাব না?'

নকুল বললে, 'তবে শিরীষ কাগজ ঘসে দেখবে কি? একটু একটু ছালের সঙ্গে সব রংই উঠে যাবে—' বলেই সে ফস করে দূরে সরে গেল, কারণ পটল তাকে লক্ষ্য করে বিষম এক ঘুসি ছুড়েছিল।

পটল মাথার হাত দিয়ে বললে, 'হায় হায়, এখন উপায়! নকুলই আমাদের ডোবালে।'

নকুল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভেবো না ভাই, রোসো। ঘরে টারপিন তেল আছে, ওই রঙের ওপরে খানিক ঘষে দ্যাখো দেখি।' এই বলেই সে ছুটে গিয়ে ছোটো এক টিন টারপিন তেল নিয়ে এল।

পটল তাড়াতাড়ি সাগ্রহে এক-আঁচলা তেল নিয়ে নিজের মুখময় মাখিয়ে ফেললে। কিন্তু সেই বিলিতি কালো রঙের মধ্যে কী দ্রব্যগুণ ছিল জানি না, টারপিন তেলের সঙ্গে তার মিলন হওয়া মাত্রই পটল বিকট চিৎকার করে তিন হাত উঁচু একটি 'হাই জাম্প' মারলে। তারপর পাগলের মতন নকুলের গা থেকে সাদা ধপধপে আলোয়ানখানা কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভীষণ ছটফট ও বিষম ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং সেই অবস্থাতেই মহা চিৎকার করে বললে, 'অটল, খবরদার! ও-তেল তুমি মুখে মেখো না! নকুল আমাদের খুন করতে চায়।'

অটল গম্ভীর স্বরে বললে, 'পাগল? আর আমি ও-তেল মাখি? নকুল যে তোমার ওপরেই প্রথম পরীক্ষা করেছে, এইটেই আমার সৌভাগ্য।'

ঠিক এমনি সময়েই দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল।

নকুল ফিরে দেখলে, দরজার সামনে বিস্ফারিত চক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে নন্দলাল!

মিনিটখানেক ধরে অটল ও পটলকে নীরব গাম্ভীর্যের সঙ্গে অবলোকন করে নন্দলাল বললে, 'চিৎকার শুনে দেখতে এলুম। আপনার দুই বন্ধু হঠাৎ একসঙ্গে আলিবাবার আবদালা সেজেছেন কেন?'

নকুলও অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'অটল আর পটল আবদালা সাজেনি। কাল একটু বেশি রাতে ওরা বাসায় ফিরে আসছে, এমন সময়ে দেড় ডজন জাহাজি-গোরা ওদের আক্রমণ করে—'

ইতিমধ্যে মেসের মালিকও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। নকুলের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, 'দেড় ডজন জাহাজি-গোরা? নিশ্চয় তারাই আমাদের নন্দবাবুর ওপরে অত্যাচার করতে এসেছিল! কিন্তু অটল আর পটলবাবুর মুখ অমন কাফ্রির মতন হল কেন?'

নকুল বললে, 'মাতাল গোরাদের খেয়াল মশাই, খেয়াল! অটল আর পটল তো নন্দবাবুর মতন মহাবীর নয়, মার খেয়ে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর জ্ঞান হলে পর দেখে যে, ওদের এই পোড়া-হাঁড়ির হাল হয়েছে।'

নন্দ খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে যেতে যেতে বলে, 'আমি এই-সব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাস করি না।'

......সেই হল অটল, পটল ও নকুলের সঙ্গে নন্দলালের শেষ চোখের দেখা। নন্দ সেইদিনই বাসা ছেড়ে উঠে গেল। অটল ও পটলের মৌখিক বর্ণান্তরের রহস্য সে যে বুঝে ফেলেছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

মধুরেণ সমাপয়েৎ

হঠাৎ কলকাতার রাত্রি হয়ে উঠল বিভীষিকা!

'ব্ল্যাক আউটের' অন্ধকার যে ভয়াবহ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ কেবল ভয়াবহ নয়, মারাত্মক।

তৃতীয় শ্রেণির মাসিক পত্রিকায় পদ্য প্রেরণ করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁরা যখন কলকাতার আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখে শিবনেত্র হয়ে কবিত্বের স্বপ্নচয়নের চেষ্টা করছিলেন, তখন শূন্যে হল জাপানি উড্ডীয়মান নৌকার উদয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী উপহার লাভ করলে কতিপয় মুখর বোমা। এক দিন নয়, পরে পরে তিন দিন।

নবাব মিরকাসিমের যুগে বাংলা দেখেছিল শেষযুদ্ধ। তারপর থেকে কিছু-কম দুই শতাব্দী ধরে বাঙালির সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কেবল পুথিপত্র বা সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে। চায়ের সঙ্গে যুদ্ধের তর্ক যেমন মুখরোচক, তেমনি নিরাপদ। অনভ্যাসের ফলে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল, একদা তারাও আবার যুদ্ধে মরতে পারে।

কলকাতার উপরে শেষ অগ্নিবৃষ্টি করেছিল নবাব সিরাজদৌল্লার সেকেলে কামান। তারপর সেদিন আচম্বিতে যখন আকাশচারী খ্যাঁদা জাপানিরা কলকাতার বুকে আবার নতুন অগ্নিবাদল সৃষ্টি করে গেল এবং কয়েকজন বাংলার মানুষ যখন বিনা নোটিশে হাজির হল গিয়ে পরলোকে, তখন সারা কলকাতা হয়ে গেল ভীত চকিত হতভম্ব। ভাবলে, এ আবার কী-রকম যুদ্ধ বাবা? আগেকার লড়ায়ে লোক মরত রণক্ষেত্রে গিয়ে। কিন্তু এ যুদ্ধে শয়নগৃহে ঢুকে স্ত্রীর আঁচল ধরে শয্যায় শুয়েও দস্তুরমতো খাবি খেতে হয়। এমন যুদ্ধের কথা তো রামায়ণ-মহাভারতেও লেখে না।

তা লেখে না। সুতরাং সুখশয্যাও নিরাপদ নয় এবং বাইরের রাস্তা নাকি ততোধিক বিপজ্জনক। যুদ্ধ এসেছে কলকাতার মাথার উপরে। অনভ্যস্ত বাঙালির পিলে গিয়েছে চমকে। শহরবাসীরা 'ব্ল্যাক আউট'কে তুচ্ছ করে রাতে পথে পথে করত বায়ু সেবন। কিন্তু তিন দিন জাপানি-বোমার চমকদার ধমক খেয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই রাজপথকে করলে প্রায় 'বয়কট'।

'গ্যাস পোস্টের' আলোগুলো জ্বলে না, 'জ্বলছি' বলে মিথ্যা ভান করে। দোকানদাররা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ তুলে দিয়ে সরে পড়ে। থিয়েটার, সিনেমা ও হোটেল বা রেস্তোরাঁরও সামনে নিবিড় অন্ধকার যেন দানা পাকিয়ে থাকে। বাদুড় ও প্যাঁচারা কলকাতার উপর দিয়ে ওড়বার সময় মনে করে,—এমন খাসা শহর দুনিয়ার আর কোথাও নেই! এবং গুন্ডা, চোর ও পকেটমারের দল মনে-প্রাণে জাপানের খ্যাঁদা-নাকগুলোর মঙ্গল-কামনা করে বেরিয়ে পড়ে পথে-বিপথে।

এমনি সময়ে—অর্থাৎ জাপানিরা শেষ যে-রাতে কলকাতায় বোমা ছুড়ে গেল ঠিক তার পরদিনেই, আমাদের তিনবন্ধু হঠাৎ এই বিচিত্র ঘটনার আবর্তে গিয়ে পড়তে বাধ্য হল। অতঃপর সেই ইতিহাসই বলব।

আহিরীটোলা অঞ্চল। ঘুটঘুটে কালো রাত—জুতোর কালির চেয়ে কালো। চারিদিক সার্কুলার রোডের গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ। শহরের সমস্ত লোক যেন মরে গিয়েছে। কিংবা এ যেন কোনও পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত নগরের মৃত পথ। গত রাত্রে ঠিক এই অঞ্চলেই একটি বোমা পথের উপরে এসে পড়ে পক্ব দাড়িম্বের মতন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই এদিককার গৃহস্থের কেউ আর দরজার বাইরে পা বাড়াতে রাজি নয়। পাড়ার বাহিরফটকা ডানপিটে ছেলেরাও বাইরের নাম মুখে আনছে না আজ।

কিন্তু এমন রাতেও পরস্পরের গলা-ধরাধরি করে, তিন জোড়া জুতোর শব্দে রাজপথকে চমকিত করে এগিয়ে আসছে অটল, পটল ও নকুল—জনৈক রসিক যাদের নাম দিয়েছে 'গৌড়-বাংলার থ্রি মাস্কটিয়ার্স'। ব্যাপার কী? তাদের কি প্রাণের ভয় নেই?

না!

আজকাল আহারের নিমন্ত্রণ পেলে শেয়ালের মতন কাপুরুষ হয়ে ওঠে সিংহের মতন সাহসী।

বাজার যা আক্রা! আগেকার সস্তার দিনে বাড়িতে দুই শত লোককে খেতে ডাকলে অন্তত শতকরা পঁচিশজনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত না। কিন্তু এখন? দুই শত জনকে আহ্বান করলে সাড়া দেয় চারশো জন! মাছ-মাংস, তরি-তরকারি, দুধ-ঘি-তেল সমস্তই অগ্নিমূল্য! যাদের আয় মাসিক একশো টাকার মধ্যে (এবং এই শ্রেণির লোকই বাংলা দেশে বেশি), তারা তো মাছ-মাংস, লুচি বা সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতির স্বাদ ভুলে যেতেই বসেছে! এমন অবস্থায় বিনামূল্যে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সদ্ব্যবহার করবার নিমন্ত্রণ পেলে সে সুযোগ ত্যাগ করে না কোনও নির্বোধই।

আহিরীটোলা অঞ্চলের কোনও উদার বন্ধু পোলাও কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব ও ফাউল

কারি প্রভৃতি খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছিলেন। সে-লোভ ত্যাগ করা অসম্ভব। তাই উদরের সম্মান রক্ষার জন্যে হাতে করে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আজ অটল, পটল আর নকুল।

অবশ্য কেউ যেন মনে না ভাবেন যে, আমরা অটল, পটল, নকুলকে উদর-পিশাচ বলে পরিচিত করতে চাইছি। মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়।

বন্ধুবর কেবল ভুঁড়ি-ভরা ভূরিভোজনেরই লোভ দেখাননি, সেইসঙ্গে এ লোভও দেখিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে আজ রীতিমতো জলসার আয়োজন। আসর অলংকৃত করবেন দুম-তানানানা খাঁ, সা-গা-রে-মা সাহেব ও গিটকিরি মিয়া প্রমুখ গাইয়েরা এবং ধেড়ে-কেটে-তাক সিং ও দি-রি-দা-রা-দা-রা আলি প্রমুখ বাজিয়েরা। যাকে বলে আকর্ষণের উপরে আকর্ষণ—নৈবেদ্যের উপরে চূড়াসন্দেশ!

আপনারা আগেই পরিচয় পেয়েছেন যে, আমাদের অটল, পটল, নকুল সংগীতকলার একান্ত ভক্ত। দু-চারটে বোমার ভয়ে এমন বিমল আনন্দকে ত্যাগ করবার ছেলে তারা নয়।

অটল বললে, 'দুম-তানানানা খাঁ যখন তান ধরে তাল ঠোকেন, তখন পেশাদার পালোয়ানরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়, এমন গাইয়ে আর হবে না!'

পটল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আমরা পালোয়ান নই। তাঁকে সহ্য করতে পারব তো?'

নকুল বললে, 'দি-রি-দা-রা-দা-রা আলি যখন প্রিং প্রিং করে সেতার বাজান তখন সন্দেহ হয়, ঠিক যেন তিনি পট পট করে রাগ-রাগিনীর পাকাচুল উৎপাটন করছেন।'

পটল অভিভূত হয়ে বললে, 'এর ওপরে আর কথা চলে না।'

অতএব তিন বন্ধু যথাসময়ে হাজির হল যথাস্থানে। গানের আসর ভাঙল রাত বারোটায়। আহারের আসর দেড়টায়। তারা পথে যখন বেরুল ঘড়িতে বাজল রাত দুটো।

হোক গে অন্ধকার—তৃপ্ত উদর, চিত্তে আনন্দ। নকুল খানিক আগে-শোনা একটি গান গাইতে গাইতে পথ চলছিল—

'কানহা রে মেরে নাহি রে চুন্‌হরিয়াঁ!'

হঠাৎ 'টর্চের' একটা তীব্র আলোকরেখা তাদের তিনজনেরই মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল এবং তারপরেই জাগল ফিরিঙ্গি কণ্ঠে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন!

সর্বাগ্রে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলে নকুল। সে ভীত স্বরে বললে, 'মারো দৌড়!'

তিন ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তিন তিরের মতন তিন মূর্তি ছুটে চলল এক দিকে।

সেখানে দাঁড়িয়েছিল এক সার্জেন্ট এবং একটা পাহারাওয়ালা।

সার্জেন্ট চিৎকার করলে, 'পাকড়ো, পাকড়ো। আসামি ভাগতা হায়!'

পাহারাওয়ালা ছুটল। সার্জেন্টও।

ব্যাপারটা এই। দিন-দশ আগেকার কথা। কলকাতার রাস্তার এক দেওয়ালের গায়ে লেখা ছিল—'Commit no nuisance!'

অটল বেকায়দায় পড়ে বাধ্য হয়ে সেই নিষেধ-বাক্য মানতে পারেনি। ঠিক সময়েই সার্জেন্টের আবির্ভাব। সে তাকে থানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। অটল বাধা দেয়, কারণ

থানায় যাওয়া তার পক্ষে ছিল আপত্তিকর। সার্জেন্ট তাকে একটা ঘুসি মারে। অটল মারে তাকে দুটো ঘুসি। সার্জেন্ট পপাত ধরণীতলে। তিন বন্ধুর অন্তর্ধান।

সার্জেন্ট এর মধ্যেই তাদের মুখ ভুলতে পারেনি। মণিহারা ফণীর মতন তার দুই চক্ষু ছিল সতর্ক। এমন বোমা-ভয়-ভরা আঁধার রাতেও কার গান গাইবার শখ হয়েছে, কৌতূহলী হয়ে তাই দেখবার জন্যে সে হাতের 'টর্চ' ব্যবহার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত তিন মূর্তিকে পুনরাবিষ্কার করে ফেলেছে:

হিংস্র জন্তুর চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে যম। এবং যমের চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে বাংলা দেশের পুলিশ। এই হচ্ছে তিন বন্ধুর মত। অতএব পুলিশের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে যাবার জন্যে তিন বন্ধু কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করলে না।

নকুল জানে, প্রথম জীবনে 'স্পোর্টে'র দৌড় প্রতিযোগিতায় বরাবরই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং একটা গোরুখোর সার্জেন্ট ও একটা ছাতুখোর পাহারাওয়ালা যে দৌড়ে তাকে হারাতে পারবে না, এ বিষয়ে ছিল নিশ্চিত।

পটল সম্বন্ধেও সে হতাশ নয়। কারণ পটল হচ্ছে বাঁখারির মতন রোগা লিকলিকে। তাই তার নাম হয়েছে মানুষ-হাড়গিলে।

ভয় তার কেবল অটলকে নিয়ে। অটলকে তারা ডাকত 'নরহস্তী' বলে এবং ওজনে সে দুই মন সাড়ে আটত্রিশ সের। একবার তেতলার সিঁড়ি ভাঙলেই সে হুস হুস করে হাঁপ ছাড়ত পাঁচ মিনিট ধরে এবং আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে শুনলেই ট্যাক্সি ডাকতে বলত।

কিন্তু নকুলের দুশ্চিন্তা অমূলক। ভয় পেলে মহা মোটা হিপোপটেমাসও তার খুদে খুদে পা চালিয়ে দৌড়ে যে-কোনও মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে। এবং ভয় পেয়ে পালাবার দরকার হলে যে-কোনও গুরুভার বাঙালিরও দেহ হয়ে যায় যে তুলোর মতন হালকা, আজ তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

ছুটতে ছুটতে নকুল বললে, 'অটল, পিছিয়ে পড়লে বাঁচবে না।'

ছুটতে ছুটতে পটল বললে, 'অটল, তোমাকে নিয়েই ভাবনা।'

অটল কিছু বললে না, কিন্তু এক দৌড়ে বন্দুকের বুলেটের মতন বেগে পটল ও নকুলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

পটল ও নকুল এখন পুলিশের কথা ভুলে প্রাণপণে অটলের নাগাল ধরবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু অসম্ভব, সে মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে চলেছে যেন খ্যাপা হাতির মতন। পটল ও নকুল চমৎকৃত!

অটল ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। সে খালি ছুটছে না, নিজের দৃষ্টিকেও করে তুলেছে বিড়ালের মতন অন্ধকারভেদী। নইলে এই 'ব্ল্যাক আউটে'র রাতে কলকাতার শতবাধাময় পথে দৌড় প্রতিযোগিতায় সফল-মনোরথ হবার সম্ভাবনা নেই।

পিছনে ধাবমান পুলিশের দ্রুতপদশব্দ শুনতে শুনতে তারা ঢুকে পড়ল একটা গলির ভিতরে—প্রথমে অটল, তারপর নকুল, তারপর পটল।

ছুটতে ছুটতে অটল দেখলে, একেবারে ঠিক তার সামনেই পথ জুড়ে শুয়ে আছে একটা

বিরাট সাদা ষাঁড়ের দীর্ঘ ছায়া। তখন তাকে আর পাশ কাটাবার সময় নেই, অতএব অটল বিনা দ্বিধায় অমন বিপুল বপু নিয়েও একটি চমৎকার 'লং জাম্প' মেরে ষাঁড়টাকে পার হয়ে গেল অনায়াসেই। তারপর লাফালে নকুল। তারপর পটল।

সচমকে ঘুম ভেঙে গেল ষাঁড়ের। বিপুল বিস্ময়ে মুখ তুলে সে দেখলে, তার দেহ ও মাথার উপর দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফ মেরে চলে গেল তিন-তিনটে মূর্তি! এমন কাণ্ড সে আর কখনও দেখেনি।

নিজের ষণ্ড-বুদ্ধিতে ব্যাপারটা সে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে তার সুদীর্ঘ কর্ণে প্রবেশ করল আবার কাদের নতুন পায়ের শব্দ! সে আন্দাজ করলে, এ দুরাত্মারাও হয়তো তার পবিত্র দেহের উপর দিয়ে লম্ফত্যাগ করবে। সে এমন অন্যায় আবদারকে আর প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মনুষ্য-জাতীয় জীববৃন্দকে 'হার্ডল রেসে' সাহায্য করবার জন্যে সে ষণ্ড-জীবন ধারণ করেনি। অতএব ভীষণ এক গর্জন করে ধড়মড়িয়ে দণ্ডায়মান হল বৃষবর। এবং পরমুহূর্তেই ফিরে শিংওয়ালা মাথা নেড়ে, পতাকার মতন লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলে নতুন পদশব্দের উদ্দেশে হল সতেজ ও সবেগে ধাবমান। মুখে তার ঘন ঘন ঘোঁৎ ঘোঁৎ হুঙ্কার।

সেই বিভীষণ মূর্তি দেখেই পাহারাওয়ালা ও ফিরিঙ্গিপুঙ্গবের চক্ষুস্থির। তারাও ফিরে অদৃশ্য হতে দেরি করলে না।

পিছনের পাপ যে বিদায় হয়েছে, তিন বন্ধু তখনও তা টের পায়নি। তারা তখনও ছুটছে উল্কাবেগে।

হঠাৎ সামনে জাগল প্রায় ছয়-সাত হাত উঁচু প্রাচীর। কিন্তু কী ছার সেই বাধা, পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে তারা চিনের প্রাচীরও পার হতে প্রস্তুত।

অটল আজ যেন ইচ্ছা করলে পাখির মতন শূন্যে উড়তে পারে। লাফ মেরে সে উঠল প্রাচীরের টঙে এবং আর একলাফে অদৃশ্য হল প্রাচীরের ওপারে। তারপর একে একে পটল নকুল করলে তার অনুসরণ।

সেই বোমাভীত, অস্বাভাবিক স্তব্ধ রাতে যখন একটা সূচ পড়লেও দূর থেকে শোনা যায়, তখন নকুল, পটলও বিশেষ করে অটলের মতন সুবৃহৎ দেহের ধুপ ধুপ ধুপ করে লম্ফত্যাগের শব্দ অন্য লোকের শ্রুতিগোচর হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

প্রাচীরের উপর থেকে তিন বন্ধু লাফ মেরে অবতীর্ণ হল একটা অজানা বাড়ির অন্ধকার উঠানের উপরে।

কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়বার চেষ্টা করছে, হঠাৎ বিকট স্বরে চিৎকার হল, 'চোর! চোর! ডাকাত!' সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের গোলমাল ও ছুটোছুটির শব্দ। সর্বনাশ, এ যে তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে!

তিন বন্ধু আঁতকে আবার উঠল, আবার ছুটল। সামনেই একটা দরজা। ঠেলা মারতেই খুলে গেল। তারা একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ওরে বাপ রে বাপ, সেখানে আবার একটিমাত্র মেয়ে-গলায় ঘর-ফাটানো কী বিকট চিৎকার!

—'খুন করলে, খুন করলে—ডাকাতে খুন খুন করলে গো।' অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎকারের পর চিৎকার।

তিন বন্ধু সিকি-সেকেন্ড থমকে দাঁড়াবারও অবসর পেলে না, টাল খেতে খেতে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

ওদিকে চারিদিক থেকে ছুটে এল বাড়ির পুরুষরা চাকর-বাকর দারোয়ান! তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করে এনেছে—বঁটি, কাটারি, লাঠি!

বাড়ির কর্তা হন্তদন্তের মতন ঘটনাস্থলে এসে বললেন, 'কই রে প্রমদা, কোথায় ডাকাত?'

একটি আধাবয়সি মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে এগিয়ে এসে বললে, 'ওই যে দাদা, ওই যে আবার বেরিয়ে গেল গো!'

—'ক-জন?'

—'এক কাঁড়ি লোক গো, এক কাঁড়ি লোক! কী সব রাক্ষুসে চেহারা, এয়া গালপাট্টা, এয়া গোঁফ—আর রং যেন কালিমাখানো হাঁড়ি।

একটি যুবক বিরক্ত স্বরে বললে, 'কী যে বলো পিসিমা, তোমার কথার কোনও মানে হয় না।'

প্রমদা কপালে দুই চোখ তুলে বললে, 'ছেলের কথা শোনো একবার! দেখলুম এক কাঁড়ি আস্ত ডাকাত, তবু বলে মানে হয় না!'

যুবক বললে, 'সত্যি কথাই বলেছি পিসিমা! এই ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার, এর মধ্যেও তুমি দেখতে পেলে, ডাকাতদের গায়ের রং কালো হাঁড়ির মতন, আর তাদের মুখে এয়া গোঁফ, এয়া গালপাট্টা!'

প্রমদা বললে, 'নিমে, তুই তো সেদিনকার ছেলে, তুই কী জানবি বল? আগুনের আঁচ কি চোখে দেখে বুঝতে হয়, গায়ে লাগলেই টের পাওয়া যায় যে! ডাকাতদের চেহারা অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায় রে, অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায়!'

কর্তা অধীর স্বরে বললেন, 'চুলোয় যাক যত বাজে কথা। বলি, ডাকাতগুলো গেল কোন দিকে?'

প্রমদা বললে, 'ওই দিকে দাদা, ওই দিকে।'

কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনওদিকেই ডাকাতদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কর্তা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'যাক গে, আপদ গেছে। বেটারা পালিয়েছে বলে আমি দুঃখিত নই।'

কর্তা আবার নিজের শয়নগৃহে এসে ঢুকলেন। তিনি বিপত্নীক। একলাই শয়ন করেন।

আলো নিবিয়ে তিনি খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন। তারপর শুয়ে করতে লাগলেন নিদ্রাদেবীর আরাধনা। কিন্তু মন যখন উত্তেজিত, ঘুম সহজে আসে না।

—'হ্যাচ্চো!'

কর্তা সবিস্ময়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তাঁর ঘরে হেঁচে ফেললে কে?

আবার—'হ্যাচ্চো!'

হাঁচির জন্ম খাটের তলায়, এটা বোঝা গেল। কিন্তু খাটের তলায় হাঁচি কেন বাবা? কর্তা তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে আলোর সুইচ টিপতে গেলেন।

এবার আর হাঁচি নয়, খাটের তলা থেকে নির্গত হল মনুষ্যের কণ্ঠস্বর।

কে বললে, 'খবরদার!'

কর্তা ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, 'খবরদার বলছ কে বাবা?'

—'আমি!'

—'তুমি কে বাবা?'

—'মনুষ্য।'

—'অর্থাৎ ডাকাত?'

—'আমরা ডাকাত নই।'

—'ও, তাহলে তোমরা যিশু খ্রিস্ট?'

—'আমরা যিশু খ্রিস্ট নই।'

—'উত্তম! তোমাদের পরিচয় জানতে চাই না। কিন্তু দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?'

—'পথ ভুলে।'

—'ভুলটা বিস্ময়কর।'

—'কিন্তু অসম্ভব নয়।'

—'পথ ভুলে আমার খাটের তলায়? না বাপু, এ কথা জজে মানবে না।'

—'খাটের তলা হচ্ছে অতি নিরাপদ ঠাঁই। খাসা আছি মশাই!'

—'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে কী করতে বলো?'

—'চ্যাঁচাবেন না। আলো জ্বালবেন না। আবার বিছানায় গিয়ে উঠে বসুন।'

—'কথা যদি না শুনি?'

—'আমার কাছে ভোজালি আছে।'

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার কাছে রিভলভার আছে।'

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, 'আমার কাছে বন্দুক আছে!'

—'দেখছি দলে তোমরা ভারী। কিন্তু আর কিছু সঙ্গে করে আনোনি? কামান-টামান?'

—'বিছানায় উঠলেন না? আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আচ্ছা!'

খাটের তলায় একাধিক ব্যক্তির হামাগুড়ি দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

ডাকাতরা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কর্তা সুড় সুড় করে আবার খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন বিনাবাক্যব্যয়ে।

—'এইবারে আমরা কী করব জানেন?'

—'আমার গলায় ছুরি দেবে?'

—'না। আপনার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলব।'

—'এত দয়া কেন?'

—'আমরা চাই না যে আপনি চ্যাঁচান বা আমাদের তাড়া করেন।'

—'আমি কিছুই করব না, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করো।'

—'আপনার কথায় বিশ্বাস নেই।'

—'জয় গুরু!'

—'কী বললেন?'

—'জয় গুরু। বিপদে বা সমস্যায় পড়লেই 'জয় গুরু' বলা আমার স্বভাব।'

—'আশ্চর্য! আমার মেসোমশাইয়েরও ঠিক ওই স্বভাব।'

—'কার?'

—'আমার মেসোমশাইয়ের। আপনার গলার আওয়াজও তাঁর মতন।'

—'আমার ভায়রা-ভাইয়ের ছেলের গলাও তোমার মতন। কিন্তু সে তোমার মতন ডাকাত নয়।'

—'আপনিও আমার মেসোমশাই নন। কারণ তাঁর বাসা বউবাজারে।'

—'কী বললে?'

—'এটা বউবাজার হলে আপনাকেই আমার মেসো বলে সন্দেহ হত।'

—'তোমার মেসোর নাম কী?'

—'চন্দ্রনাথ সেন।'

—'আমারও নাম ওই। আমিও বউবাজারে থাকতুম, আজ দশ দিন হল, এই নতুন বাসায় উঠে এসেছি।'

অটল ফস করে আলো জ্বাললে।

কর্তা বললেন, 'অটলা!'

অটল বললে, 'মেসোমশাই!'

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। কর্তা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'অটল, এ ব্যবসা কতদিন ধরেছ?'

অটল কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি ডাকাত নই মেসোমশাই, আগে আমার কথা শুনুন।'

অটল একে একে সব কথা খুলে বললে।

কর্তার অট্টহাস্যে খালি বাড়ি নয়, রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন কাঁপতে লাগল—

'হো হো হো হো, হা হা হা হা। ওরে অটলা, আজ আমি হেসে-হেসেই খাবি খাব রে! হি হি হি হি। ওরে প্রমদা, তোর গালপাট্টাঅলা কেলে-হাঁড়ির মতন ডাকাতের মুখগুলো একবার দেখে যা রে। হো হো হো হো, হা হা হা হা হা হা হা হা............

বজ্র আর ভূমিকম্প

॥ প্রথম ॥

নীল চিঠির পুনরাবির্ভাব

প্রশান্ত চৌধুরির দুশ্চিন্তার সীমা নেই। মাস-ছয়েক গোলমাল ছিল না। বারে বারে পদে পদে তাকে অপদস্থ করে দীনুডাকাত হঠাৎ কোথায় ডুব মেরেছিল। কলকাতায় এবং ভারতবর্ষের দিকে দিকে পুলিশের দল যথেষ্ট সচেতন হয়েও দীনুকে আর পুনরাবিষ্কার করতে পারেনি। শেষটা সকলে এই ভেবে আপন আপন মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলে যে, দীনু হয় পীড়ায় বা অপঘাতে মারা পড়েছে, নয়তো ভারতীয় আইনকে কলা দেখাবার জন্যে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে নিরাপদে করছে অজ্ঞাতবাস।

দীনুর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় শেষপর্যন্ত জয়ী হতে না পেরে প্রশান্ত যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হল যথেষ্ট, সে কথা বলা বাহুল্য। খবরের কাগজের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপরওয়ালাদের ধমক, নিদারুণ আত্মগ্লানি, এই-সবই কেবল তাকে নীরবে হজম করতে হল। গোয়েন্দাগিরিতে দেশজোড়া নাম কিনেও এবং বারংবার দীনুকে হাতের কাছে পেয়েও কোনওদিন সে তার ছায়া স্পর্শ করতেও পারেনি। দীনু ছিল যেন পুতলো-বাজীর খেলোয়াড় আর সে ছিল তার হাতের পুতুল—লুকিয়ে দড়ি টেনে সে তাকে স্বেচ্ছামতো উঠিয়েছে বসিয়েছে ছুটিয়েছে ঘুরিয়েছে ফিরিয়েছে নাচিয়েছে! এ অপমানের জ্বালা কি ভোলবার?

প্রতিশোধ নেওয়া হল বটে, কিন্তু একটা কথা ভেবে প্রশান্ত একাধিক অশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। দীনু দেশছাড়া হলে তার ঘাড় থেকে যেন একটা ভূত নামে। আর সে যদি মারা পড়ে থাকে, তাহলে তার ফাঁড়া তো কেটেই গিয়েছে! দীনুকে সে খালি ঘৃণা করে না, রীতিমতো ভয়ও করে!

কিন্তু হঠাৎ এল আবার কাল রাত্রি, আকাশে হল বিপজ্জনক মেঘের উদয়, জাগ্রত হল বজ্রের হুঙ্কার।

পরে পরে ঘটল তিনটে ঘটনা।

প্রথম ঘটনা ঘটে দেওঘরে। কোটিপতি মানিকলাল ঝুনঝুনওয়ালা গিয়েছিলেন সেখানে বায়ু-পরিবর্তনে। এক রাত্রে বৃহৎ একদল ডাকাত এসে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়।

ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে চারজন দারোয়ান আহত ও দুইজন নিহত হয়। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি নিয়ে ডাকাতরা সরে পড়ে।

ছোটো বড়ো মাঝারি ডাকাতির খবর তো প্রায়ই পাওয়া যায়। সেটা কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু এ ডাকাতির একটু বিশেষত্ব আছে—অন্তত পুলিশের কাছে।

ডাকাতরা চলে যাবার পর মানিকলাল ঘটনাস্থলে একখানি নীলরঙের খাম কুড়িয়ে পান। তার ভিতরে একখানি নীল রঙের কাগজ। সেই কাগজে বড়ো বড়ো হরপে লেখা—

'দীনু'

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে বাংলার একটি বড়ো গ্রামে। ডাকাতি হয় নতুনপুরের জমিদার-

বাড়িতে। সেখানেও ডাকাতদের আক্রমণে একজন লোক নিহত ও ছয়জন লোক অল্পবিস্তর আহত হয়। সেখানেও ডাকাতরা হাজার ত্রিশ টাকার সম্পত্তি নিয়ে পালায়। এবং সেখানেও পাওয়া যায় নীলরঙের খামে একখানা নীলরঙের কাগজ—

তাতে শুধু লেখা—

'দীনু'

তৃতীয় ঘটনাস্থল হচ্ছে—হাওড়া। চন্দ্রনাথ সামন্ত একজন বড়ো ব্যবসাদার,—প্রচুর টাকার মালিক। ডাকাতদের কবলে চন্দ্রনাথের কয়েকজন লোক জখম হয় এবং মারা পড়েন চন্দ্রনাথ নিজেই। ডাকাতরা নগদ পঁচিশ হাজার টাকা হস্তগত করে অদৃশ্য হয়। সেখানেও পাওয়া যায় নীল খামের ভিতরে একখানি নীল কাগজ এবং তাতে লেখা কেবল—

'দীনু'

ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে জোর-তলব আসতে দেরি হল না।

সাহেবের মুখ গম্ভীর। চোখে বিরক্তি।

প্রশান্তও নিজে থেকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে না।

খানিকক্ষণ পরে সাহেব বললেন, 'কেন ডেকেছি বুঝতে পারছ কি?'

প্রশান্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আজ্ঞে, কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি।'

—'প্রশান্ত, আমরা এতদিন নির্বোধের স্বর্গে বাস করছিলুম। দীনু মারাও পড়েনি, দেশ ছেড়েও পালায়নি।'

—'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। সেই 'দীনু-নামের মার্কা-মারা নীল কাগজ!'

—'হুঁ। প্রথমে সাঁওতাল পরগনায়, তারপর বাংলার পল্লিগ্রামে, তারপর হাওড়ায়। দীনু আবার ধাপে ধাপে কলকাতার উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়েছে।'

—'স্যার, দীনু লোকটা বড়োই নাম-পাগলা। এইজন্যেই শেষটা তাকে ধরা পড়তে হবে।'

—'কী-রকম?'

—'দেশে ডাকাতি তো লেগেই আছে। দীনু যদি নীল কাগজে এভাবে নিজের নাম জাহির না করত, তাহলে এসব ডাকাতি যে দীনুরই কীর্তি একথা আমরা জানতেও পারতুম না—সে আমাদের কাজ যথেষ্ট সহজ করে দিচ্ছে, আমাদের আর অন্ধকার হাতড়ে মরতে হবে না।'

সাহেব তিক্ত হাসি হেসে বললেন, 'দীনু তোমাদের তোয়াক্কা রাখে না, সে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করে সকলকে স্রেফ বোঝাতে চায়, তোমরা হচ্ছ প্রথম শ্রেণির গর্দভ, হাতের কাছে পেলেও তাকে তোমরা ধরতে পারবে না! তোমাদের মতন অপদার্থের জন্যে পুলিশের মান বুঝি আর থাকে না।'

প্রশান্ত দুঃখিতভাবে নিরুত্তর হয়ে রইল।

সাহেব বললেন, 'চুপ করে থাকলে চলবে না প্রশান্ত। এ বিষয় নিয়ে তুমি কিছু চিন্তা করেছ কি না বলো।'

প্রশান্ত বললে, 'স্যার, কিছু কিছু ভেবে দেখেছি বটে, কিন্তু সেসব কথা বলে লাভ নেই।'

—'কেন?'

—'দীনুর মামলা আপনি আর কারুর হাতে দিলেই সুখী হব।'

সাহেব ক্রুদ্ধ-স্বরে বললেন, 'এটা কি তোমার আদেশ?'

—'না স্যার, বিনীত অনুরোধ।'

—'এমন অনুরোধের কারণ?'

—'আমার উপরে আপনি বিশ্বাস হারিয়েছেন।'

—'প্রশান্ত, তোমার এ-রকম অভিমান করা অন্যায়। আমারও অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো দেখি। আমি তো সর্বপ্রধান কর্তা নই—দীনুর জন্যে উপরওয়ালাদের কাছ থেকে আমাকেও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে না। মনের দুঃখে যা বলেছি, ভুলে যাও। তোমার যোগ্যতার উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। কেবল মুশকিল কী জানো? দীনুর কাছে গেলেই তুমি যেন মস্তিষ্কের সব শক্তি হারিয়ে ফ্যালো। এর কারণ কী জানি না, কিন্তু এটা সত্যকথা।'

প্রশান্ত ঘাড় হেঁট করে নীরবে বসে রইল। তার প্রতিবাদ করবার মুখ নেই।

॥ দ্বিতীয় ॥

মাধবীকুঞ্জে হিপোপটেমাস

রোজ সকালে বৈঠকখানায় বসে চা-পানের পর বিখ্যাত লেখক অরুণকুমার রচনাকার্যে নিযুক্ত হত।

কিন্তু আজ আর অরুণের লিখতে মন বসছে না। মেজাজ খারাপ।

শ্রীধর এল টেবিলের উপর থেকে চায়ের কাপ-ডিশ সরাতে। শ্রীধর হচ্ছে একাধারে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও পরামর্শদাতা বন্ধু।

—'শ্রীধর!'

—'আজ্ঞে!'

—'শ্রীধর, আগে তুমি ডাকাত ছিলে?'

—'ছিলুম ছোড়দা......সে কী সুখের দিনই গিয়েছে!' শ্রীধর একটা দুঃখের নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

—'সুখের দিন?'

—'হ্যাঁ বাবু, সুখের দিন বই কি। নিজের জীবনের ওপরে মায়া নেই, পরের জীবনেরও ওপরে দরদ নেই—বোশেখির ঝড়ের মতন, বনের বাঘার মতন মনের আনন্দে দরাজ বুকে দিকে দিকে ছুটে বেড়াতুম অবাধে—কেউ বাধা দিতে এলে তার মুখ বন্ধ হয়ে যেত চিরদিনের মতন, কেউ—'

অরুণ বাধা দিয়ে বললে, 'থামো শ্রীধর, থামো, তোমার ডাকাত-জীবনের কথা শুনে-শুনে কান আমার পচে গিয়েছে। আচ্ছা, মানুষ মারতে তোমার একটুও কষ্ট হত না?'

—'কিছু না বাবু, কিছু না! মানুষের জীবন কী? পিদিমের আলোর মতন। পিদিমের আলো জ্বলছে, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলুম—ব্যাস, ফুরিয়ে গেল।'

—'চমৎকার মত! আমার জীবনও তোমার কাছে নিরাপদ নয় দেখছি।'

শ্রীধর জিভ কেটে বললে, 'ছি ছোড়দা, ও কী কথা! লোকে রাস্তার উটকো কুকুরকে ঢিল ছুড়ে মারে, কিন্তু নিজের পোষা কুকুরকে কি সেইভাবে মারতে পারে?'

—'তাহলে আমাকে তুমি মনিবের মতন নয়, পোষা কুকুরের মতন দ্যাখো? শুনে সুখী হলুম।'

শ্রীধর আবার জিভ কেটে বললে, 'কী যে বলো বাপু, তোমাকে নিয়ে পারা দায়! তুমি যে আমার অন্নদাতা! একটা বাজে উপমা নিয়ে এত টানাটানি করলে আমি আর কোনও কথাই বলব না।'

—'না শ্রীধর, না। তুমি মুখবন্ধ কোরো না। তবে কি জানো, তোমার উপমা বিপজ্জনক। যাক ও কথা। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। আগে তুমি ডাকাত ছিলে?'

—'ছিলুম।'

—'তারপর তোমাকে ওপথ থেকে ফিরিয়ে আনে তোমার বড়দা, অর্থাৎ আমার বন্ধু বরুণ?'

—'হ্যাঁ বাবু।'

—'বরুণকে সবাই ডাকে, 'দীনবন্ধু' বা 'দীনুডাকাত' বলে। পুলিশের চোখে সে-ও ডাকাত বটে, কিন্তু দেশের লোক তাকে বন্ধুর মতন ভালোবাসে। কারণ, ডাকাতি করে সে অত্যাচারী, স্বার্থপর, নির্দয় ধনীদের ওপরে, আর ডাকাতির সব টাকা সে দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। তার ওপরে, সে কখনও খুনখারাপির ধার দিয়েও যায় না।'

—'এ কথা আমার কাছে বলছ কেন ছোড়দা, এসব কথা তো সবাই জানে।'

—'কিন্তু এ কথা কি জানো শ্রীধর, তোমাকে পাপ-পথ থেকে ফিরিয়ে এনে বরুণ নিজেই তোমার মতন সাধারণ ডাকাত হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

শ্রীধর প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বললে, 'অসম্ভব। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

—'আজ সকালেই খবরের কাগজে কী বেরিয়েছে শুনবে?'

—'যে খবর বিশ্বাস করব না, তা শুনে কী লাভ?'

—'তবু শোনো।'

অরুণ টেবিলের উপর থেকে একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করতে লাগল:

'কলিকাতার বিখ্যাত ও দানশীল ধনকুবের শ্রীযুক্ত পরমানন্দ চৌধুরির আলয়ে গতকল্য রাত্রে ভীষণ এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বিশেষ কোনও কারণে পরমানন্দবাবু কল্য ব্যাঙ্ক হইতে এক লক্ষ টাকা তুলিয়া আনিয়াছিলেন—এক শতখানি এক হাজার টাকার নোট। টাকা তাঁহার শয়নকক্ষেই ছিল। রাত্রে একদল লোক কী উপায়ে তাঁহার বাড়ির মধ্যে গোপনে প্রবেশ করে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। পরমানন্দবাবুর অনেক রাত্রি পর্যন্ত পাঠের অভ্যাস ছিল, সুতরাং তখনও তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বার বন্ধ করা হয় নাই।

'হঠাৎ পরমানন্দবাবুর কাতর আর্তনাদে বাড়ির আর-সকলের নিদ্রাভঙ্গ হয়। সবাই পরমানন্দবাবুর ঘরের দিকে ছুটিয়া যাইবার সময়ে আট-দশ জন লোকের পদশব্দ শুনিতে পায়—কারা যেন সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। কেউ কেউ তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, কিন্তু চার-পাঁচ বার রিভলভারের শব্দ শুনিয়া ভয়ে আবার পিছাইয়া আসে। দস্যুদল তখন অবাধে বাড়ির বাহিরে গিয়া 'ব্লাক আউটে'র অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া যায়।

'তারপর সকলে পরমানন্দবাবুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখে এক ভয়াবহ দৃশ্য! রক্তাক্ত শয্যার উপরে পড়িয়া রহিয়াছে পরমানন্দবাবু ও তাঁহার সহধর্মিণীর মৃতদেহ—দুইজনেরই সর্বাঙ্গে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন। তারপর দেখা যায়, টেবিলের দেরাজ খোলা এবং এক লক্ষ টাকার নোট অদৃশ্য। নোটের পরিবর্তে সেখানে রহিয়াছে একখানা নীলরঙের খাম। খামের ভিতরে একখানা নীলরঙের কাগজ—তাতে লেখা :

'দীনু'

'আজ আমরা এ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিব না, কারণ, এখনও এই শোচনীয় ও মর্মভেদী কাহিনির সমস্ত কথা জানিতে পারা যায় নাই।'

কাগজ পড়া শেষ হওয়া মাত্র শ্রীধর অধীর-স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা—একেবারে মিথ্যা কথা! বড়দা করবেন খুন? অসম্ভব!'

অরুণ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শ্রীধরের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'হাতে হাত দাও শ্রীধর, হাতে হাত দাও! তুমি আমার প্রাণের কথাই টেনে বলেছ! এতক্ষণ সন্দেহের কুয়াশায় আমার মনের আকাশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, তোমার দৃঢ়বিশ্বাসের প্রবল বাতাসে এখন সব কুয়াশা কেটে গিয়েছে। বরুণ করবে হত্যা! আবার যে-সে হত্যা নয়, স্ত্রীহত্যা! অসম্ভব! কিন্তু শ্রীধর, কেবল এই ব্যাপারে নয়, আরও তিন-তিনটে ডাকাতি আর খুনোখুনির ব্যাপারে নীল কাগজে লেখা 'দীনু'র নাম পাওয়া গিয়েছে। এই রহস্যের কারণ তো বুঝছি না!'

শ্রীধর কোনও জবাব দেবার আগেই সদর দরজার সামনে একখানা মোটর সশব্দে এসে থেমে পড়ল। তারপরই দেখা গেল প্রশান্ত চৌধুরির মূর্তি।

বৈঠকখানায় ঢুকতে ঢুকতে সহাস্যবদনে প্রশান্ত বললে, 'এই যে অরুণবাবু, নমস্কার—কেমন আছেন?'

—'নমস্কার। কেমন আছি জিজ্ঞাসা করছেন? এক মুহূর্ত আগেও ভালো ছিলুম।'

দুই ভুরু কপালের দিকে উত্তোলন করে প্রশান্ত বললে, 'তার মানে?'

—'তার মানে, আপনার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে আর ভালো বোধ করছি না। পুলিশের মুখে হাসি দেখলেই আমার বুক টিপ টিপ করে!'

প্রশান্ত একখানা চেয়ারের উপরে ধুপ করে বসে পড়ে বললে, 'তাহলে কি পুলিশের চোখে অশ্রু দেখলেই আপনার হৃদয় পরম শান্ত হয়?'

—'পুলিশের চোখে অশ্রু? সর্বনাশ,—সে যে চরম অশান্তি! ব্যাং-কে দেখে, সাপের কান্না? সেটা আরও অসহনীয়।'

—'এ আপনার অবিচার! এগুলেও আবাগের বেটা, পেছুলেও আবাগের বেটা? ভুলে যাবেন না, পুলিশে চাকরি করি বটে, কিন্তু আমরাও সামাজিক জীব।'

ঠিক এই সময়ে বৈঠকখানার সামনে এসে আর-এক মূর্তি অরুণকে সেলাম করলে। একমুখ দাড়ি-গোঁফ, একটা চোখ কানা, গায়ে আধ-ময়লা মের্জাই, পরনে লুঙ্গি।

অরুণ জিজ্ঞাসা করলে, 'কে তুমি?'

—'আজ্ঞে, বাণী পুস্তকালয়ের দপ্তরি।'

বাণী পুস্তকালয় থেকেই অরুণের সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অরুণ বললে, 'আমার কাছে কী দরকার?'

—'আজ্ঞে, বড়বাবু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আপনার নতুন কেতাবের মলাটের জন্যে কতগুলো কাপড়ের নমুনা এনেছি, আপনাকে পছন্দ করে দিতে হবে।'

—'বেশ, একটু পরে দেখব—এখন বাইরে গিয়ে বোসো।'

—'আচ্ছা হুজুর। তবে আমার বসবার সময় নেই। নমুনার কাপড়গুলো এই টেবিলের ওপরেই রেখে গেলুম, আপনি পছন্দ করে রাখবেন, আমি ও-বেলায় এসে নিয়ে যাব। সেলাম।'

দপ্তরি প্রস্থান করলে।

প্রশান্ত বললে, 'আপনার নতুন কী বই বেরুচ্ছে?'

—'প্রশান্তবাবু, আপনি যে আমার এখানে সাহিত্যচর্চা করতে আসেননি, এটুকু অন্তত বুঝতে পারছি। আপনার শুভাগমনের কারণটা জানতে পারি কি?'

প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললে, 'দেখছি আমার সঙ্গে আপনি বাজে কথা কইতে মোটেই রাজি নন। বেশ, তবে কাজের কথাই হোক। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার বন্ধু বরুণবাবুর খবর কী?'

অরুণ বললে, 'হঠাৎ বরুণের খোঁজ কেন?'

এইবারে প্রশান্তর কণ্ঠে জাগল পুলিশের কঠোর স্বর। নীরস স্বরে সে বললে, 'প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করবেন না। আমার কথার জবাব দিন। বরুণবাবুর খবর কী?'

অরুণ বিরক্ত-কণ্ঠে বললে, 'বরুণের খবর জানতে চান তো তার বাড়িতে যান। এটা বরুণের বাড়ি নয়, আমিও তার অভিভাবক নই।'

—'একথা আমিও জানি। কিন্তু বরুণ যে আপনার বাড়িতে আনাগোনা না করে পারে না, এটাও কি জানতে আমার বাকি আছে?'*

অরুণ বললে, 'যদি বিশ্বাস করেন তাহলে বলতে পারি, আজ ছ-মাসের মধ্যে বরুণকে আমি দেখিনি, বা তার কোনও খবরই পাইনি।'

প্রশান্ত খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবলে। তারপর বললে, 'বরুণ এখন কোথায় আছে, বলতে পারেন?'

—'না। তবে কলকাতায় আছে বলে মনে হয় না।'

—'কেন?'

---

*হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে 'মায়ামৃগের মৃগয়া' দেখুন।

—'কলকাতায় থাকলে খবর পেতুম।'

—'অর্থাৎ আপনি বলতে চান, বরুণ কলকাতায় থাকলে অন্তত আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসত?'

অরুণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আমি কিছুই বলতে চাই না।'

—'আহা, রাগ করেন কেন?'

—'রাগ করাই উচিত।'

—'উচিত?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি বন্ধু-ভাবে কথা কইছি, তবু আপনি রাগ করবেন?'

—'আপনি বন্ধুর মতন কথা কইছেন না। কথায় কথায় কথার ফাঁদ পাতবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অন্ধকারে এত ঢিল ছোড়াছুড়ির দরকার কী মশাই? আমি কি বুঝতে পারছি না, আপনার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কী? ডাকাতির পর ডাকাতি হচ্ছে, দীনুর নাম-সই-করা নীল কাগজ পাওয়া যাচ্ছে—'

প্রশান্ত বাধা দিয়ে বললে, 'থামুন। আপনার বোধশক্তি দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।'

অরুণ তিক্তস্বরে বললে, 'বিস্মিত হবার মতন বুদ্ধি আপনার আছে শুনে সুখী হলুম। কিন্তু এই যে সব ডাকাতি হচ্ছে—'

—'এগুলোর সঙ্গে আপনার বন্ধু বরুণ ওরফে দীনবন্ধু জড়িত নেই। কেমন, এই বলতে চান তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'ধরুন, আমিও একথা বিশ্বাস করি।'

অরুণ বিস্মিত-কণ্ঠে বললে, 'কী আশ্চর্য, তবে আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?'

—'বরুণ এখন কোথায় তাই জানতে। সে যে এখন কলকাতার বাইরে আছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ পেলে আমাদের কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়। আর এ-রকম স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে কে? একমাত্র আপনি। তাই—'

—'মশাই—'

—'থামুন, বাধা দেবেন না। অস্বীকার করবেন না যে, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু বরুণের আর কেউ নেই।'

—'অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপনি কি আমাকেও দীনুডাকাতের দলের লোক বলে মনে করেন?'

—'মোটেই না, মোটেই না। আপনি কবি হতে পারেন, কারণ, 'কাকে' আর 'বকে' মেলাতে পারলেই—এমনকি আজকাল মেলাতে না পারলেও—বাংলা দেশের অনেকেই 'সুকবি' বলে নিজের বিজ্ঞাপন জাহির করে। আপনিও কবি হতে পারেন, কিন্তু ডাকাত হবার শক্তি আপনার নেই। রাতের চাঁদনি, মলয় হাওয়া আর ফুলের মধু সেবন করে যাদের দিন কেটে যায়, তারা কখনওই ডাকাত হতে পারে না। ডাকাত তো দূরের কথা, মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, তারা যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য কি না।'

—'এই অভিনন্দনের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কবিদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা যখন এতই উদার, তখন ডাকাতের সন্ধান নেবার জন্যে আপনি মাধবী-কুঞ্জে হুড়মুড় করে হিপোপটেমাসের মতন ঢুকে পড়ে এত গোলমাল করছেন কেন?'

—'অকারণেই যে গোলমাল করছি না, তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখুন ওই'—বলেই প্রশান্ত একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

অরুণ মুখ ফিরিয়ে সচকিত-চোখে দেখলে, যে-টেবিলের উপরে দপ্তরি মলাটের কাপড়ের নমুনা রেখে গিয়েছিল, তার তলায় পড়ে রয়েছে একখানা নীলরঙের খাম!

অরুণ সবিস্ময়ে ওঠবার উপক্রম করতেই—চিল যেভাবে খাবারের ঠোঙার উপরে ছোঁ মারে ঠিক সেই ভাবেই প্রশান্ত খামখানার উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর নিজের চেয়ারের উপরে এসে বসে খামের ভিতর থেকে বার করলে একখানা নীলরঙের কাগজ।

প্রশান্ত কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরে কী পড়তে লাগল। অরুণ লক্ষ করলে, তার মুখের উপরে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে অতি-দ্রুত।

পড়া শেষ করেই প্রশান্ত এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

অরুণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ব্যাপার কী? নীল খাম, নীল কাগজ! টেবিলের তলায় এল কেমন করে? তবে কি—

প্রশান্ত হুড়মুড় করে আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। দুই হাত নেড়ে চিৎকার করে বললে, 'আবার ঠকালে—আবার চোখে ধুলো দিলে! আমি একটি গাধা! আমি একটি উল্লুক।'

অরুণ সকৌতুকে বললে, 'নিজেকে এমন সব নিম্নশ্রেণির জীবের সঙ্গে তুলনা করছেন কেন? হল কী?'

—'হল কী? হল আমার মাথা আর মুণ্ডু!'

—'মাথা আর মুণ্ড তো আপনার কাঁধের ওপরে আগেও বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এতবেশি, চ্যাঁচাচ্ছেন কেন?'

—'চ্যাঁচাচ্ছি কি সাধে? আপনার বন্ধু দেখছি আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না!'

—'আমার বন্ধু?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আপনার বন্ধু বরুণ, অর্থাৎ আসল দীনুডাকাত দপ্তরির ছদ্মবেশে এইমাত্র ঘরে এসে আমাকে ফাঁকি দিয়ে আবার সরে পড়েছে।'

—'আসল দীনুডাকাত, দপ্তরির ছদ্মবেশে। কী বলছেন আপনি।'

—'ধন্য, ধন্য। দীনুডাকাতের সাহস ধন্য, কৌশল ধন্য, ছদ্মবেশ ধন্য।'

—'প্রশান্তবাবু, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?'

—'বোঝাবার কিছুই নেই। এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন' বলে প্রশান্ত সেই নীলরঙের কাগজখানা টেবিলের উপরে ফেলে দিলে।

অরুণ কাগজখানা নিয়ে পড়তে লাগল:

'বন্ধু হে, প্রশান্ত চৌধুরি?

আবার বোধ করি তোমার টনক নড়েছে?

কিন্তু বেশি ব্যস্ত হোয়ো না ভায়া, বেশি ব্যস্ত হোয়ো না। ব্যস্ততা হচ্ছে গোয়েন্দার মস্ত শত্রু। ব্যস্ত লোক শায়েস্তা হয় সস্তায়, সে পাহারাওয়ালাও হবার যোগ্য নয়।

সাত নকলে আসল খাস্তা হয়, নকলে নকলে বাজার গেছে ভেস্তে। নকল হিরা, নকল মুক্তো, নকল সোনা, নকল রুপো! তার উপরে আবার খবর পেলুম, বাজারে নাকি নকল দীনবন্ধুরও আবির্ভাব হয়েছে?

অবশ্য, শ্রেষ্ঠ জিনিসেরই নকল হয়। অতএব নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভেবে দূরে বসে নিরাপদ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে পারতুম অনায়াসেই। ছিলুম অজ্ঞাতবাসে এবং সেখানে আমার প্রতিবেশী ছিল কেবল অম্লান সুনীল আকাশ, দূরে বরফেমোড়া। আর কাছে শ্যামলতায়-ছাওয়া পাহাড়ের পর পাহাড়, বনস্পতির ছন্দ, পাখিদের পাওনা আর ঝরনার নাচ। সেখানে ছিল না শহরের হই হই, মোটরের ভেঁপু, লালপাগড়ির ছুটোছুটি আর অশান্ত চৌধুরির গর্দভ-গর্জন। বিশেষ করে শেষোক্ত ব্যাপারটা আমার কানে লাগত বড়োই বেসুরো আর বেতালা। হাতির লাথি সইতে রাজি, গাধার গঞ্জনা সহ্য করা অসম্ভব।

অশান্ত,—আমি তোমাকে প্রশান্ত বলে কখনও ডাকতে পারব না, কারণ তুমি প্রশান্ত নও। অশান্ত আমার উক্ত সুখের বাসাটির ঠিকানা জানবার জন্যে তোমার প্রাণ বোধহয় স্বর্গসিন্ধানলোভী সাধুর মতন ছটফট করছে? কিন্তু তোমায় আমি ঠিকানা দেব না—কিছুতেই না! তোমাদের উৎপাতে কলকাতা যখন আমার পক্ষে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, তখন কলকাতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করবার জন্যে ওই শান্তি-নিকেতনেই (বোলপুরের নয়) গিয়ে আমাকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তোমরা সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও আমাকে আবিষ্কার করতে পারবে না।

আমার এই পরম নিভৃত শান্তি-নিকেতন ছাড়লুম কেন জানো? নকল দীনুর অত্যাচারে। নকল দীনুর বোধহয় বিশ্বাস, পুলিশ হচ্ছে গাধা-গোরুর চেয়েও নির্বোধ জীব। তাই সে আমার নাম ধারণ করে তোমাদের বিপথে চালনা করতে চায়। তোমরা ব্যস্ত হয়ে থাকবে আমার অন্বেষণে, আর ওই ফাঁকে সে আড়ালে থেকে অনায়াসে ডাকাতির পর ডাকাতি করে বেড়াবে। ফন্দিটা মন্দ নয়। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি গাধা হতে পারো, কিন্তু গাধার চেয়ে হাঁদা জীব নও। অন্তত নকল দীনুর এই কাঁচা চালাকিটা ধরে ফেলবার মতন বুদ্ধি আছে তোমার ঘটে।

বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে গোপালের মতন সুবোধ বালকরাই দলে বেশি ভারী। (জানো তো, 'গোপাল বড়ো সুবোধ বালক, সে যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে'?) নকল দীনুর কীর্তিকলাপ দেখে তারা নিশ্চয়ই ধরে নেবে, আমি হয়ে উঠেছি এক স্বার্থপর, অধম, রক্তপিপাসী নরদানব—স্ত্রী-হত্যা করতেও আমার হাত কাঁপে না। অন্তত তুমি মানবে, আমার কার্যকলাপ আইনসঙ্গত না হলেও, আমি খুনিও নই আর নিজের লাভের লোভেও চুরি-ডাকাতি করি না। আমার ডাকাতির অভিনয় হচ্ছে মাত্র Charity Performance-এর মতোই সাধারণ ব্যাপার।

কোনও হতভাগা নকল দীনুকেই আমার নামে কলঙ্ক-কালি মাখাতে দেব না। সে যতবড়ো

শক্তিমানই হোক, আমি তাকে দমন করবই। তাকে খুঁজে বার করবার জন্যেই আমার কলকাতায় আগমন। এবং আমি তোমার মতন গাধা নই বোধহয়, কী বলো হে? সুতরাং নকল দীনুর গর্তের ঠিকানা জানবার জন্যে আমার খুববেশি দেরি হবে না বলেই আশা করি।

নকল দীনুর ঠিকানা পেলেই তোমাকে আমি খবর দেব। মধুর অভাবে লোকে গুড় খেয়েই খুশি হয়। আসল দীনুর বদলে নকল দীনুকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও তোমার যশ হবে দেশব্যাপী। তোমার পক্ষে সেটা অল্প লাভ নয়।

নীল কাগজে লেখা আমার আরও চিঠি তুমি আগেও পেয়েছ। কিন্তু সেসব চিঠিতে তুমি কোনওদিন কি আমাকে কেবল 'দীনু' বলে নাম-সই করতে দেখেছ? না। যখনই আমি কারুকে চিঠি পাঠাই, তার তলায় লিখি—

দীনবন্ধু

পত্র পাঠ করে অরুণ নীরবে প্রশান্তের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

প্রশান্ত বললে, 'দেখছেন অরুণবাবু, আমি এখানে এসে কিছুমাত্র ভুল করিনি? যেমন চাল-ডাল দরকার হলে লোকে যায় মুদির দোকানে, তেমনি দীনুডাকাতকে পেতে হলে সকলকে আসতে হবে আপনারই বাড়িতে। আমি যে জানি, দীনুডাকাত যদি কলকাতায় থাকে, তাহলে সে চুম্বকের টানে লোহার মতন এখানে না এসে থাকতে পারবে না!'

অরুণ বললে, 'আজকের ব্যাপারের পর আমি আর প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে বলতে পারেন কি, কবে আমার নামে ওয়ারেন্ট জারি হবে?'

প্রশান্ত বললে, 'যে-কোনও ভাবে ওয়ারেন্ট এনে যাকে-তাকে গ্রেপ্তার করা আমার স্বভাব নয়। দীনুডাকাত যে আপনার আহ্বানে এখানে আসে না, এটা আমার অজানা নেই। কোনও পাগলাকুকুর কারুর বাড়িতে ঢুকে কারুকে কামড়ালেই যে সেই বাড়ির মালিককে দায়ী করতে হবে, এতখানি নির্বুদ্ধিতা আমার নেই।'

অরুণ বললে, 'আপনার সুবুদ্ধিকে অগুনতি ধন্যবাদ।'

প্রশান্ত ঘরের বাইরের দিকে যেতে যেতে ফিরে অপ্রসন্ন-স্বরে বললে, 'আমার সুবুদ্ধিকে আপনি তো ধন্যবাদ দিচ্ছেন! কিন্তু এর চেয়ে আমি খুশি হই, আপনার বন্ধু বরুণের সঙ্গে দেখা হলে যদি আপনি দয়া করে বলেন যে, আমি গাধার চেয়ে হাঁদা জীব নই। অর্থাৎ আজকের নীল কাগজে লেখা চিঠি পাবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, এই নকল দীনু আর বরুণ ওরফে দীনুডাকাত একই লোক নয়!'

অরুণ মুখ টিপে হেসে বললে, 'দীনুডাকাতের সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে?'

প্রশান্ত দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পরে দুই হাত ভঙ্গিভরে নেড়ে নেড়ে বললে, 'আ-হা-হা, মরে যাই আর কী। কবিদের মেয়েলি ঢং দেখে গা যেন জ্বালা করে। দীনু-ডাকাতের সঙ্গে আপনার আর দেখা হবে না? মৌচাকে মৌমাছি আসবে না, এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে নাকি?'

অরুণ বললে, 'আজ ক্রমাগত আপনার উপমার অত্যুক্তি দেখে বিস্মিত হচ্ছি।'

প্রশান্ত আবার পদচালনা করে বললে, 'কারণ আমি কবির বাড়িতে এসেছি। সঙ্গদোষে আমিও হয়ে পড়েছি কবি!'

॥ তৃতীয় ॥

নকল দীনুর ঘোমটা মোচন

দুই নৌকোয় পা দিয়ে প্রশান্ত ঠেকেছে ভারী মুশকিলে।

'দীনু' নাম নিয়ে যে-ধড়িবাজ লোকটা ক্রমাগত ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, সে যে আসল দীনুডাকাত নয়, প্রশান্ত এটা বুঝতে পেরেছিল সত্য-সত্যই। দীনুডাকাতের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে এই নকল দীনুর কোনও ব্যাপারেরই মিল ছিল না। প্রশান্তের মতন পাকা পুলিশ কর্মচারীর চোখে এত সহজে ধূলিনিক্ষেপ করা সম্ভবপর নয়।

এই নকল দীনুকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার জন্যে ইতিমধ্যেই সে চারিদিকে চর পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চরেরা কোনও সন্তোষজনক সংবাদ আনবার আগেই নাট্যমঞ্চে হল আসল দীনুডাকাতের নাটকীয় আবির্ভাব। এর জন্যে প্রশান্ত প্রস্তুত ছিল না। একসঙ্গে এই আসল আর নকলের ভার বহন করা তো বড়ো চারটি-খানেক কথা নয়।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষটা সে স্থির করলে যে, আপাতত পারদের মতন পিছল দীনু-ডাকাতের আশা ত্যাগ করাই উচিত। নকল দীনুকে ফাঁসিকাঠের দোলনায় দোলাবার ব্যবস্থা করবার পর আসলকে নিয়ে 'চোর চোর খেলা'র অবসর পাওয়া যাবে যথেষ্ট।

কিন্তু দু-দিন পরেই বোঝা গেল, এই নকলটিও বড়ো সোজা জীব নয়। কলকাতায় সমস্ত বদমাইশ ও গুন্ডার আড্ডায় আড্ডায় খোঁজখবর নিয়েও নকল দীনুর টিকির ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত পাওয়া গেল না। পরে পরে দেওঘর, হাওড়া ও কলকাতা চমকপ্রদ ডাকাতি করতে পারে, এমন একটা বৃহৎ দল বিপুল পুলিশ বাহিনীর সতত সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনেও কী-করে যে বেমালুম আত্মগোপন করতে পারে, প্রশান্ত এটা কিছুতেই আনতে পারলে না ধারণায়।

দীনুডাকাত তাকে ভরসা দিয়েছে, নকল দীনুকে সে আবিষ্কার করবে। কিন্তু দীনু-ডাকাতের মতন পরমশত্রুর কাছে উপকৃত হবার ইচ্ছা তার একটুও নেই। যদিও সব দেশেরই পুলিশ বিভাগে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন চোরের সাহায্যে চোর ধরবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা অচল। দীনুডাকাত বার বার তাকে ফাঁকি দিয়েছে, তার জন্যে প্রশান্তের সুনামই কেবল ক্ষুণ্ণ হয়নি, দেশের ও দশের সামনে বার বার তাকে হতে হয়েছে দস্তুরমতন হাস্যাস্পদ। এখন তার জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, দীনুডাকাতকে গ্রেপ্তার করে সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া। দীনুডাকাতের কাছে সে কৃতজ্ঞ হবে? কখনও না, কখনও না!

দীনুডাকাতের আগেই নকল দীনুকে ধরে ফেলবার জন্যে প্রশান্ত উঠে পড়ে লেগে গেল। কিন্তু তার সমস্ত বুদ্ধি-চাতুর্যই হল নিষ্ফল। সে বুঝলে, আসলের মতন এই নকলটিও হচ্ছে 'অগাধ জলের মকরে'র মতন।

তারপরেই হল নৈহাটির এক ধনী ও ব্যবসায়ী মারোয়াড়ির বাড়িতে ভীষণ এক ডাকাতি। সেখানে মারা পড়ল চারজন লোক ও আহত হল সাতজন। এবং সেখানেও পাওয়া গেল 'দীনু' নাম-লেখা নীল চিঠি।

প্রশান্ত প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে হতাশভাবে বললে, 'নকলের অত্যাচার আর সাহস ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখছি। আমার মানসম্ভ্রম সবই গেল!' উপওয়ালাদের কাছ থেকে তাকে যেসব কথা শুনতে হল, কোনও কম্পোজিটারই তা 'কম্পোজ' করতে রাজি হবে না।

তিন দিন পরে প্রশান্তর নামে ডাকযোগে এল একখানা নীলরঙের খাম। আবার কী নতুন হাঙ্গাম ভেবে সে ভয়ে ভয়ে নীল খামের ভিতর থেকে একখানা নীল কাগজ বার করে পড়তে লাগল:

'অশান্তভায়া,

বোধহয় মহাদেও মিশিরের নাম শোনোনি? না শোনাই সম্ভব। কারণ সে কাজ করে যবনিকার অন্তরালে বসে।

মহাদেওয়ের দেশ হচ্ছে—মির্জাপুরে। কিন্তু সে কলকাতায় আছে ছেলেবেলা থেকে। কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে আর বাংলা বলে বাঙালির মতন।

তার আছে দুটো বড়ো বড়ো গোরুর গাড়ির আড্ডা, মস্ত বড়ো কোকেনের ব্যবসায়, দুটো জুয়াখানা আর চোর-পকেটমার-গুন্ডার বৃহৎ দল। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্পর্কে বা কাগজে-কলমে কোনও দলের সঙ্গেই তার যোগ নেই। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাকে মালিক বলে জানে না। আর বেনামে ব্যবসা চালায় বলে কোনওদিনই সে পুলিশের দয়াদৃষ্টিগোচর হয়নি।

আজ কিছুকাল হল মহাদেও ডাকাতি-ব্যবসায়ও ধরেছে। কিন্তু সে এ ব্যবসায়ও চালায় বেনামে—অর্থাৎ আমার নামে। কারণ সেই-ই হচ্ছে নকল দীনু।

যাদের নিয়ে সে ডাকাতের দল গড়েছে, তাদের কারুকেই সে কলকাতায় থাকতে দেয় না। বাংলা দেশের কয়েকটি জায়গায় তার ভিন্ন ভিন্ন আড্ডা আছে। দলের প্রত্যেক লোকই দিনেরবেলায় সাধুর মতন নানা কাজ বা চাকরি করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়। কেবল কোনও ডাকাতির সময়ে তারা এক জায়গায় সমবেত হয়, তারপর আবার ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

মহাদেওকে আমি দেখেছি। মাথায় সে প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু। রং প্রায় কালো। সারা মুখে বসন্তের দাগ। দৃষ্টি বিষম তীক্ষ্ণ—যার দিকে তাকায় যেন আলপিনের মতন খোঁচা মারে, কিন্তু চোখদুটো অসম্ভব-রকম ছোটো। খ্যাঁদা নাক। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হলদে-হলদে দাঁত দেখা যায়। সুতরাং তাকে সুপুরুষ বলা যায় না। আমার মতে, সে তোমারও চেয়ে কুৎসিত।

মহাদেও পোশাক পরে বাঙালিবাবুর মতন। তার শৌখিনতাও কম নয়। ওই চেহারায় আবার শখ করে রেখেছে বাবরি-কাটা চুল। বিড়ির বদলে 'স্টেট-এক্সপ্রেস' সিগারেট টানে। গলায় পরে বা হাতে জড়ায় ফুলের মালা। পিতলে-বাঁধানো পাকা বাঁশের লাঠির বদলে ব্যবহার করে সরু ফিনফিনে সোনা-বাঁধানো ছড়ি। সর্বদাই জামায় এসেন্স ছড়ায় ও হাতে-মুখে 'স্নো' মাখে। গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবি, কোঁচানো দিশি কাপড়। পায়ে লপেটা। তার বেশভূষা দেখলে মনে হয়, নিজেকে সে কার্তিকের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে।

সে ফুলবাবু সাজতে চায় বটে, কিন্তু তার দেহ ফুলের ঘায়ে কাতর হবার মতন নয়। তার বুকের বেড় বোধ করি চুয়াল্লিশ ইঞ্চির কম নয়। শুনেছি তার গায়ে হাতির মতন জোর আছে। পালোয়ানদের আসরেও এক সময়ে সে ছিল সুবিখ্যাত। মহাদেওয়ের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার গলার আওয়াজও অদ্ভুত। সে যখন চেঁচিয়ে কথা কয়, মনে হয় যেন কোনও স্টিমারের 'সাইরেন' সবাক হয়ে উঠেছে।

মহাদেওয়ের একখানি অবিকল ফোটোগ্রাফ তোমাকে উপহার দিলুম। এখন তাকে দেখলেই চিনতে পারবে তো?

তার আর একটি বিশেষত্ব আছে। সে যতবেশি রাগে ততবেশি হাসে, আর ততবেশি আস্তে কথা কয়।

একটিমাত্র ব্যবসায় সে প্রতিনিধির দ্বারা চালনা করে না। প্রত্যেক ডাকাতির সময়ে দলের সঙ্গে হাজির থাকে। তার নেতা হবার যোগ্যতা আছে। তার উপস্থিতিতে দলের প্রত্যেক লোক আরও মরিয়া, আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

মহাদেও ভয়ংকর নিষ্ঠুর ও রক্তলোভী। মানুষকে নতুন নতুন উপায়ে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবার সুযোগ ছাড়ে না।

আমার এক বিশ্বস্ত অনুচর ডায়মন্ডহারবারের জঙ্গলের ভিতরে মহাদেওয়ের একটি গুপ্ত আস্তানা আবিষ্কার করেছে। চিঠির সঙ্গে একখানি ম্যাপ এঁকে দিলুম। এই ম্যাপ দেখে যে-কোনও শিশুও আস্তানাটা চিনে নিতে পারবে। আমার বিশ্বাস, খুব সম্ভব তুমি শিশুর চেয়ে বুদ্ধিমান। তোমার কী বিশ্বাস?

আগামী কাল, রাত নয়টার পর ওই আস্তানায় মহাদেওয়ের এক পরামর্শসভা বসবে। যদি সাধ আর সাধ্য হয়, মহাদেওকে গ্রেপ্তার করে গৌরব অর্জন কোরো। এই প্রথম সুযোগ আমি তোমাকেই দিলুম। যদি অক্ষম হও, দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণ করব আমি নিজেই।

কিন্তু একটি অনুরোধ, তোমার জন্যে আমি এত পরিশ্রম করলুম, তোমাকেও আমার একটি কথা রাখতে হবে। আমার চর মহাদেওয়ের দলের সঙ্গেই আছে। ঘটনাচক্রে সে-ও যদি ধরা পড়ে, তাকে তোমরা মুক্তি দিয়ো। পুলিশকে সাহায্য করতে গিয়ে সে বেচারা শাস্তি ভোগ করবে কেন?

আপাতত আমার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। মহাদেওকে পথ থেকে না সরিয়ে আর আমি কোনও বেআইনি কাজ করে তোমার শান্তিভঙ্গ করব না। তারপর আবার আরম্ভ হবে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ইতি

আপাতত তোমার বন্ধু
দীনবন্ধু

পত্রখানা পাঠ করবার পর প্রশান্তর হল হরিষে বিষাদ।

এতদিন পরে নকল দীনুর একটা পাত্তা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু আবার তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল দীনুডাকাতের কাছে। এই বিপুল পুলিশ বাহিনীর সাহায্য পেয়েও সে যে-মহাদেওয়ের টিকি পর্যন্ত দেখতে পায়নি, দীনুডাকাত তাকেই এনে দিলে তার হাতের মুঠোর

কাছে। মহাদেওকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তার সুনাম বাড়বে বটে, কিন্তু এ সুনামের মধ্যে ফাঁকি থাকবে যে কতখানি, সে নিজে এটা তো কোনওদিনই ভুলতে পারবে না!

দীনুডাকাতের এই অমূল্য সাহায্যের জন্যে প্রশান্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারলে না, বরং দীনুর উপরে তার রাগ আর আক্রোশ আরও বেড়ে উঠল।

প্রশান্ত ডায়মন্ডহারবারের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

॥ চতুর্থ ॥
হানাবাড়ির জঙ্গলে

ডায়মন্ডহারবার। জঙ্গলের মধ্যে একখানা সেকেলে মস্ত বাড়ি। সংস্কারের অভাবে বাড়িখানার দুরবস্থা হয়েছে যৎপরোনাস্তি। বহু স্থলেই তার উপর থেকে চুন-বালির প্রলেপ বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার চারিদিককার ইট-বার-করা দেওয়াল ও ছাদ হয়েছে বুনো গাছপালার আশ্রয়-নীড়।

বাহির থেকে দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে, এই পোড়োবাড়ির মধ্যে শৃগাল-কুকুর-সর্প ছাড়া মনুষ্যজাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে। জঙ্গলের ভিতরে পথের চিহ্ন পর্যন্ত নেই এবং স্থানীয় লোকেরা দিনেরবেলাতেও এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে রাজি হয় না। সকলেরই বিশ্বাস, এ হচ্ছে হানাবাড়ি। যারা পথ ভুলে এখানে এসে পড়ে স্বচক্ষে মূর্তিমান ভূত-পেত্নী দর্শন করেছে, এমন-সব লোকেরও অভাব নেই। জিজ্ঞাসা করতে-না-করতেই তারা তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনি তোমার কাছে বর্ণনা করতে রাজি হবে সাগ্রহে! যাদের এরকম চাক্ষুষ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়নি, এমন একাধিক ব্যক্তি জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে অমানুষিক পুরুষ ও নারী-কণ্ঠে সানুনাসিক স্বরে হাস্য ও ক্রন্দন ধ্বনি পর্যন্ত শুনতে ভোলেনি। হানাবাড়ির জঙ্গলের নাম তুললে এ অঞ্চলের দুষ্ট ছেলেরাও শান্ত না হয়ে পারে না।

রাত সাড়ে-নয়টা। চাঁদ-তারা-মোছা আকাশের বুকে জমে আছে পুরু মেঘের কালিমা। মাঝে মাঝে জাগছে প্রখর বিদ্যুতের হিজিবিজি আলোর টান এবং বাজের গড় গড় গড় গড় আওয়াজ। অশ্রান্ত বৃষ্টির ঝঙ্কারে এবং গাছ-দোলানো ঝোড়ো হাওয়ার হুঙ্কারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। যেন ভৌতিক রাত্রি।

হানাবাড়ির জঙ্গল আজ যেন আরও অপার্থিব হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকালে অন্ধকারের বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তি যেন দেখিয়ে দেয়, একটা বিরাট কালো চাপ-বাঁধা অভিশাপ পৃথিবীর বুকে চেপে বসে করছে ছটফট ছটফট। বাঁশবনে ঝড়ের ঝাপটা ঢুকলেই মনে হয়, ভূত-প্রেতরা যেন পরস্পরের সঙ্গে করছে ঠকাঠক লাঠালাঠি।

এক-একবার সন্দেহ হয়, অন্ধকারের ভিতরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে আর পা টিপে টিপে চলা-ফেরা করছে। মন বলে, এখানে বসেছে কায়াহীন ছায়ামূর্তিদের ষড়যন্ত্রসভা।

আচম্বিতে জঙ্গলের বক্ষ ভেদ করে জাগল শেয়ালের তীব্র চিৎকার। একবার, দুই বার, তিন বার।

কে চুপিচুপি ভয়ে ভয়ে বললে, 'স্যার, শেষটা পাগলাশেয়ালের কামড় খেয়ে মরব নাকি?'

—'মূর্খ! পাগলাশেয়াল নয়, মানুষের চিৎকার! সংকেত-ধ্বনি!' এ প্রশান্তর কণ্ঠস্বর।

—'মানুষের চিৎকার! সংকেত-ধ্বনি!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমরা ধরা পড়ে গেছি। বনের ভিতরে মহাদেওয়ের চর আছে। সংকেত করে সে আমাদের কথা জানিয়ে দিলে।'

—'তাইলে?'

—'ওরা পালাবার আগেই আমাদের আক্রমণ করতে হবে।' প্রশান্ত পকেট থেকে বাঁশি বার করে খুব জোরে দিলে ফুঁ!

সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় বন্য অন্ধকার 'টর্চে'র পর 'টর্চে'র আলোক-বাণে হয়ে গেল ক্ষতবিক্ষত! চারিদিকে উঠল দলে দলে মানুষের দ্রুত পদশব্দ!

প্রশান্ত চিৎকার করে বললে, 'সবাই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ো! সব ঘর খুঁজে দ্যাখো!' সে নিজেও জন-পাঁচেক লোক নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে। প্রত্যেকের এক হাতে রিভলভার, আর এক হাতে টর্চ।

আগাছায় ভরা মস্ত উঠোন, চারদিকে সারবন্দি ঘর। এক-এক দল পুলিশের লোক এক-এক দিকে ছুটে গেল। কিন্তু কোনওদিকেই কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এল না!

প্রশান্ত একটা শূন্য ঘর পার হয়ে প্রকাণ্ড একখানা হলের ভিতর প্রবেশ করলে। মেঝের উপর মস্ত সতরঞ্জ পাতা। এক দিকে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চুপ করে একা বসে আছে বিরাট এক মূর্তি।

তার মুখের উপরে টর্চের আলো ফেলে প্রশান্ত তাকে ভালো করে দেখতে লাগল। দীনু-ডাকাতের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। প্রশান্তর মন ভারী খুশি হয়ে উঠল। এত সহজে যে দুর্ধর্ষ মহাদেওয়ের দেখা পাওয়া যাবে, এটা সে ভাবতেও পারেনি।

মহাদেও মুখ টিপে টিপে হাসছিল। প্রশান্তর মনে পড়ল দীনুর আর-একটা কথা। মহাদেও যতবেশি রাগে, ততবেশি হাসে।

প্রশান্ত বললে, 'কে তুমি? এই পোড়োবাড়িতে অন্ধকারে বসে কী করছ? আর হাসছই-বা কেন?

লোকটা তেমনি হাসিমুখেই খুব শান্ত ও মৃদুস্বরে বললে, 'তোমাদের দেখে। আমি একটিমাত্র মানুষ, আর তোমাদের ছ-জনের হাতে ছ-টা চকচকে রিভলভার। হাসব না?'

—'হাসি এখনই বার করছি। তোমার নাম কী?'

—'মহাদেও।'

—'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

—'কেন?'

—'তুমি ডাকাত।'

—'তোমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে?'

—'আছে।'

মহাদেও আচমকা ভয়ংকর উচ্চস্বরে গর্জন করে উঠল—মানুষের কণ্ঠে তেমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ বীভৎস চিৎকার কেউ কখনও শোনেনি—সকলেই চমকে বিহ্বলের মতন তার মুখের পানে চেয়ে রইল—অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে।

কিন্তু যাদের দরকার তাদের পক্ষে সেই এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতাই হল যথেষ্ট।

নিশব্দে পিছন দিকের দেওয়ালের দুটো দরজা খুলে গেল এবং চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই দশ-বারো জন যমদূতের মতন মূর্তি মহা বেগে ছুটে এসে পুলিশের লোকেদের উপরে চালাতে লাগল ধড়াদ্ধড় লাঠি। প্রশান্ত ও তার সঙ্গীরা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে একেবারে অজ্ঞান। আগন্তুকরা এত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেললে যে, কেউ বাধা দেবার বা টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার এতটুকু সময় পেলে না।

মহাদেও টপ করে দাঁড়িয়ে বললে, 'চটপট এ ঘরে আসবার দরজাগুলো বন্ধ করে দে!'

কথামতো কাজ হতে দেরি লাগল না।

মহাদেও হেসে বললে, 'দেখলি আলগু, এক হুমকিতেই কেল্লা ফতে? একটা হুমকি শুনেই যারা ভড়কে যায় তারা এসেছে আমার সঙ্গে লাগতে! আরে ধেৎ!'

আলগু বললে, 'শাবাশ বাবুজি!'

মহাদেও চিন্তিত-স্বরে বললে, 'কিন্তু একটা ভাবনার কথা হচ্ছে, পুলিশকে আড্ডার খবর দিলে কে? আমার দলে কোনও বেইমান আছে নাকি?'

হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজার উপরে পড়তে লাগল দুমদাম লাথি।

মহাদেও ব্যস্তভাবে বললে, 'ডবল মজবুত দরজা—নতুন করে বানিয়েছি, ভাঙতে দেরি লাগবে। আলগু, তার আগেই সুড়ঙ্গ দিয়ে আমাদের সরে পড়তে হবে!'

ভূপতিত অচেতন দেহগুলোর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে আলগু বললে, 'আর এই আদমিগুলো!'

মহাদেও বললে, 'কাতলামাছ আছে খালি একটা—বাকি সব চুনোপুঁটি। ওই লোকটা হচ্ছে গোয়েন্দা প্রশান্ত চৌধুরি—ওকে ছাড়া চলবে না। ওটাকে তুলে সঙ্গে নিয়ে চল।'

॥ পঞ্চম ॥

থলি-বন্দি

জ্ঞান হতেই প্রশান্ত বুঝলে, তার হাত আর পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। উঠে বসবার উপায় নেই। চোখ মেলেও দেখলে কেবল অন্ধকার। তারপরেই অনুভব করলে, তার দেহের চারিপাশে রয়েছে কীসের আবরণ। সেই বন্দি অবস্থাতেও যথাসম্ভব অঙ্গ-সঞ্চালন করে সে জানবার চেষ্টা করলে, কীসের এই আবরণ?

সঙ্গে সঙ্গে মহাদেওয়ের কণ্ঠস্বর জাগল, 'কী প্রশান্তবাবু, অত ছটফট করছ কেন?'

প্রশান্ত জবাব দিলে না।

মহাদেও বললে, 'ছটফট করে লাভ নেই বাপু। তোমাকে আমরা একটা থলির ভেতরে পুরে রেখে দিয়েছি।'

—'কেন?'

—'একটু পরেই জানতে পারবে।'

—'আমি এখনই জানতে চাই।'

—'তোমার হুকুম তামিল করবার লোক এখানে নেই।'

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। প্রশান্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, আমাকে নিয়ে এরা কী করতে চায়?

মহাদেও আবার মুখ খুললে। ধীরে ধীরে বললে, 'প্রশান্তবাবু, তুমি ছাড়া পেতে চাও?'

প্রশান্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'এ কথা জিজ্ঞাসা করাও বাহুল্য।'

—'মাইরি বলছি, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।'

—'তুমি ভারী দয়ালু দেখছি।'

—'কিন্তু এক শর্তে।'

—'শর্তটা শুনি।'

—'কী করে আমার খোঁজ পেলে, সেই কথাটা আমাকে বলতে হবে।'

—'তোমার মতন গুণী ব্যক্তির খোঁজ নেওয়াই হচ্ছে আমার পেশা।'

—'কিন্তু কে তোমাকে আমার নাম-ঠিকানা বাতলে দিলে?'

—'বলব না।'

—'বললে এখনই ছাড়ান পাবে।'

—'আর, না বললে?'

—'মারা পড়বে।'

—'এত সাহস তোমার হবে?'

মহাদেও কর্কশ-কণ্ঠে বললে, 'আমার সাহসের কতটুকু খবর তুমি রাখো হে বাপু? মহাদেও যমকে ডরায় না।'

—'তাই বুঝি নিজের নাম লুকিয়ে, দীনুর নামের আড়ালে ডাকাতি চালাতে? বলিহারি সাহস!'

মহাদেও পাগলের মতন হা হা করে হাসতে হাসতে থলের উপরে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করে বললে, 'চোপরাও গাধা! যতবড়ো মুখ নয় ততবড়ো কথা!'

প্রশান্ত বললে, 'আমার হাত-পা খোলা থাকলে চড় মারার ফল তোমাকে দেখাতুম।'

মহাদেও আবার হা হা করে হেসে বললে, 'তুই আবার কী করতিস রে! আমি যে তোকে বাঁ হাতে তুলে ধরে দশ হাত দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি। বাংলা বলছি বটে, কিন্তু আমি কুচো-চিংড়ি-খেকো বাঙালিবাবু নই,—বুঝেছিস?'

—'বাজে মুখ-শাবাশি রাখো মহাদেও, এখন আমাকে নিয়ে কী করতে চাও বলো।'

—'বললুম তো।'

—'কী বললে?'

—'তোমাকে ছেড়ে দেব।'

—'ওই শর্তে?

—'আলবত।'

—'রাজি নই।'

—'বাঁচতে চাও না?'

—'সব কথা স্বীকার করলেও আমি মুক্তি পাব বলে মনে হচ্ছে না।'

—'কেন?'

—'তোমার কথায় বিশ্বাস কী?'

—'আমি শপথ করছি।'

—'বাঘ শপথ করলেও রক্তলোভ ছাড়ে না।'

—'বটে! কিন্তু তোমার মুখ থেকে এখনই আমি সব কথা আদায় করে নিতে পারি তা জানো?'

—'চেষ্টা করে দ্যাখো।'

—'জ্যান্ত রেখে তোমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করাব। তোমার সর্বাঙ্গে বিঁধিয়ে দেব আগুনে-পোড়ানো শত শত সূচ। একে একে তোমার কান কেটে নেব, নাক কেটে নেব, ঠোঁট কেটে নেব, তারপর—'

—'থামো, থামো, তারপর আরও কী কী করবে সে-ফর্দ আমি জানতে চাই না। যে-টুকু বললে, তাই শুনেই শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত।'

—'কেমন, এইবার পিলে চমকে গেল তো?'

—'ধরো, তাই।'

—'তাহলে রাজি?'

—'না।'

—'মানে?'

—'মারো-ধরো, কষ্ট দাও, যা-খুশি করো। আমি বোবা হয়েই থাকব।'

—'তবে রে হারামজাদা!'

—'চুপ কর পাজি পশু! বাইরে থাকলে আমি তোর মুখে থুতু দিতুম। আমি তোর আর কোনও কথার জবাব দেব না।'

—'বেশ, তবে মজা দেখ!'

পদশব্দ শুনে প্রশান্ত বুঝলে, মহাদেও সেখান থেকে উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

প্রশান্ত ভাবতে লাগল। অতঃপর এরা কী করবে? তাকে হত্যা করবে, না যন্ত্রণা দেবে?

প্রথমটা প্রশান্তর সন্দেহ হয়েছিল, দীনুডাকাতেরই ষড়যন্ত্রে আজ সে ফাঁদে পড়েছে। সেই-ই বুঝি কৌশলে তাকে পথ থেকে সরাতে চায়।

এখন বোঝা যাচ্ছে, দীনুর সঙ্গে মহাদেওয়ের কোনওই সম্পর্ক নেই। থাকলে, মহাদেওয়ের এত বেশি আগ্রহ হত না—কে তার নাম-ঠিকানা দিয়েছে, জানবার জন্যে।

হ্যাঁ, এ সত্য অস্বীকার করবার জো নেই যে, দীনু—ডাকাত হলেও উচ্চশ্রেণির ডাকাত। বিলাতের রবিনহুডের মতন, সেকেলে-বাংলার বিশুডাকাতের মতন সে গরিবের মা-বাপ। তার উচ্চ আদর্শ আছে—যদিও সেই আদর্শের কাছে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে দীনু যে-পথে পা বাড়িয়েছে তা সুপথ নয়, কুপথ। কিন্তু সে সাধু ও দানী ধনীর উপরে হানা দেয় না। মানুষকে প্রাণে মারে না। ডাকাতির এক পয়সাও নিজে ছোঁয় না। হয়তো দীনুকে সাধু ডাকাত বলেও ডাকা চলে!

তার এই দুর্দশার জন্যে দীনুকে দোষও দেওয়া যায় না। দীনু তো তাকে ঠিক পথই বাতলে দিয়েছিল, আর সে-ও এসেছিল সদলবলে, দস্তুরমতো সশস্ত্র হয়ে। সে প্রস্তুত থাকলে কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারত না কিছুতেই। মহাদেও তাকে ঠিক ছেলেমানুষেরই মতন ভুলিয়ে প্যাঁচে ফেলেছে। তুচ্ছ একটা চিৎকার শুনে সে যদি চমকে আচ্ছন্নের মতন হয়ে না পড়ত, তাহলে কেউ কি তার গায়ে হাত দিতে পারত? তার সঙ্গে ঘরের ভিতর অস্ত্রধারী পুলিশ, ঘরের বাইরে ও বাড়ির আশেপাশে ছিল আরও দু-ডজন পুলিশ, মহাদেওয়ের দল লড়াই করেও আত্মরক্ষা করতে পারত না।

মনের দুঃখে নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি গাধা, আমি গোরু, আমি বাঁদর!'

সঙ্গে সঙ্গে মহাদেওয়ের গলা শোনা গেল। টিটকিরি দিয়ে সে বললে, 'আরে ছ্যা ছ্যা প্রশান্তবাবু! তুমি গাধা নও। কারণ, গাধাও ঠ্যাং ছুড়ে লাথি ঝাড়তে পারে, তুমি তা পারো না। তুমি গোরু নও। কারণ, গোরুও শিং নেড়ে গুঁতিয়ে দিতে পারে, তোমার শিং নেই। তুমি বাঁদর নও। কারণ, বাঁদররা চতুর আর তুমি হচ্ছ হাঁদা-গঙ্গারাম। অবশ্য একটা কোনও জানোয়ারের সঙ্গে তোমার তুলনা চলতে পারে, তবে সে জানোয়ারের নাম আমি জানি না।'

আবার মহাদেও এসেছে! প্রশান্ত লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।

মহাদেও বললে, 'তুমি নিজেকে হরেক-রকম পশু বলে ভাবছ কেন প্রশান্তবাবু? তবে কি আমার কথা রাখোনি বলে তোমার অনুতাপ হয়েছে?'

প্রশান্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'অনুতাপ! তোমার কথা রাখিনি বলে আমি আনন্দিত।'

—'ওহো হো, তাই নাকি? আলগু!'

—'হ্যাঁ বাবুজি!'

—'যা যা বলেছি মনে আছে তো?'

—'হ্যাঁ বাবুজি।'

—'তাহলে প্রশান্তবাবুকে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।'

প্রশান্ত বুঝলে, চার-পাঁচ জন লোক তাকে ধরাধরি করে শূন্যে তুললে, তারপর অগ্রসর হল।

এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কিছুই আন্দাজ করবার উপায় নেই। মুখবন্ধ পুরু থলি ভেদ করে নজর চলে না।

তবে এইটুকু অনুভব করা গেল যে, তারা আর বন্ধ ঘরের ভিতরে নেই। মাথার উপরে খোলা আকাশ,—কারণ বৃষ্টি পড়ছে, ঠান্ডা বাতাস বইছে।

জায়গাটা নিশ্চয়ই নির্জন। নইলে এদের এত সাহস হত না।... ... ...

কী একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে না? গম্ভীর ও একটানা! জলকল্লোল! কোনও বড়ো নদীর জলকল্লোল।

এ অঞ্চলে কোন বড়ো নদী থাকতে পারে? গঙ্গা? তারা কি ডায়মন্ডহারবারের প্রায়-সমুদ্রের মতন বৃহৎ গঙ্গার কাছ দিয়ে যাচ্ছে? কিন্তু কেন?

অবিলম্বেই জানা গেল। প্রশান্ত বেশ বুঝতে পারলে, লোকগুলো তাকে যেখানে নামিয়ে দিলে সেখানটা টলমল করছে, অর্থাৎ দুলছে! নৌকো? নিশ্চয়!

ঝপাঝপ দাঁড়ের আওয়াজ! নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। এরা তাকে নিয়ে কোথায় পালাতে চায়? কী এদের বুকের পাটা! শেষটা গোয়েন্দা-চুরি! বাবা, এ যে উপন্যাসের ব্যাপার হয়ে উঠল!

খানিকক্ষণ নৌকা চলবার পর মহাদেও কথা কইলে। 'নৌকো থামা।'

দাঁড়ের শব্দ আর শোনা গেল না।

মহাদেও বললে, 'প্রশান্তবাবু!'

প্রশান্ত জবাব দিলে না।

—'কী হে, নৌকোবিহার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

প্রশান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'এভাবে ঘুমোবার অভ্যাস আমার নেই।'

—'তবে মুখে রা নেই কেন?'

—'নরপশুর সঙ্গে কথা কইবার সাধ হয় কার?'

—'আমাকে গালাগাল?'

—'পশুকে পশু বললে গালাগাল হয় না।'

—'একটা লাথি খাবে নাকি?'

—'মারো।'

—'তোমাকে এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি। কেমন করে আমার খবর পেলে?'

প্রশান্ত প্রাণপণে চেঁচিয়ে বললে, 'বলব না, মরে গেলেও বলব না।'

—'বহুৎ-আচ্ছা। আলগু।'

—'বাবুজি!'

—'প্রশান্তর থলের তলায় ওই বড়ো বড়ো পাথর দু-খানা বেঁধে দে।'

প্রশান্ত সচমকে বললে, 'তার মানে?'

—'আজ তোমার পাতাল-প্রবেশ হবে।'

—'তুমি আমাকে ডুবিয়ে মারবে?'

—'ঠিক তাই।'

—'তারপর ধরা পড়লে তোমার অবস্থা কী হবে জানো?'

—'আমি ধরা পড়লে তো?'

—'সব পাপীই তাই মনে করে।'

—'বেশ তো, যা জানতে চাইছি বলে আমাকে নরহত্যার দায় থেকে উদ্ধার করো না প্রশান্তবাবু। তুমি তো সাধ করেই মরতে চাইছ, আমার দোষ কী?'

—'দ্যাখো মহাদেও, তোমার মতন বহু শয়তানকেই আমি চিনি। বেশ জানি, তুমি যা জানতে চাইছ তা বললেও আমি মুক্তি পাব না। অতএব, মরবার সময়ে বিশ্বাসঘাতক হবার ইচ্ছা আমার নেই। তোমার যা খুশি করতে পারো।'

—'আলগু, পাথর বাঁধা হয়েছে?'

—'হ্যাঁ বাবুজি।'

—'থলেটা জলে ফেলে দে। নমস্কার প্রশান্তবাবু!'

প্রশান্ত স্তম্ভিত ভাবে অনুভব করলে, থলেসুদ্ধ সে উঠল শূন্যে।......ঝপ করে শব্দ হল। কনকনে ঠান্ডা জল। তারপর কম ঠান্ডা। প্রশান্ত বুঝলে, সে গভীর জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। প্রাণপণ শক্তিতে হাত-পায়ের দড়ি ছেঁড়বার চেষ্টা করলে। পারলে না।

ছটফট করতে করতে অনুভব করলে, থলি আর নীচের দিকে নামছে না। তাহলে সে গঙ্গার তলদেশে এসে হাজির হয়েছে। এই তার শেষ শয্যা!

এইবারে দমবন্ধ হওয়ার কষ্ট। ক্রমে সে কষ্ট উঠল চরমে। চোখের সামনে ফুটতে লাগল রাশি রাশি আগুনের রেণু। ....ধীরে ধীরে তার বুদ্ধি আচ্ছন্নের মতন হয়ে এল, সমস্ত দেহ হয়ে পড়ল নিশ্চেষ্ট। তখন মৃত্যুকে মনে হল বন্ধুর মতন। তার কানের কাছে কে যেন চুপি চুপি বারবার বলতে লাগল—ভয় কী, ভাবনা কী; ভয় কী, ভাবনা কী—এখনই সব জুড়িয়ে যাবে.........। ঘুম, ঘুম, ঘুম—মৃত্যু যেন ঘুমের মতন!

হঠাৎ জ্যান্ত কী-একটা এসে থলের গায়ে ধাক্কা মারলে। তারপরেই থলে ধরে কে টানলে।

আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে চমকে উটল। কুমির, না, হাঙর? মনে মনে বললে, আর একটু অপেক্ষা কর বাপু, ঘুমোতে-না-ঘুমোতেই টানাটানি কেন? কামড় মারলে এখনও লাগবে যে!

থলি আবার উপর দিকে উঠছে। এ তো ভারী আশ্চর্য! প্রশান্তর মন আবার সজাগ হবার চেষ্টা করলে।

তারপরেই বুঝলে, সে আর থলির ভিতরে নেই! এক হাতে তার দেহ জড়িয়ে ধরে, আর-একহাতে কে তার বাঁধন-দড়ি—বোধহয় যেন—কেটেই দিচ্ছে!

প্রশান্ত ভাবলে, স্বপ্ন। মরবার আগে মানুষ এমনি সব বাজে স্বপ্ন দেখে নাকি?

কিন্তু না, এই যে সে জলের উপরে! এই যে তার মাথায় বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়া লাগছে! ওই যে কালো রাতের আঁধার আকাশে বিদ্যুতের ছিনিমিনি!

কানের কাছে কে বললে, 'কতটা জল খেয়েছ?'

প্রশান্ত বললে, 'রামঃ, মোটেই তেষ্টা পায়নি, খামোকা জল খেয়ে মরব কেন?'

—'হুঁ। কথা শুনে বোধ হচ্ছে, বিপদ তোমাকে কাবু করতে পারেনি। সাঁতার জানো?'

—'জানি। ভালো সাঁতারই জানি।'

হাতের বাঁধন খুলে গেল। প্রশান্ত সাঁতার কাটতে কাটতে তার উদ্ধারকর্তার মুখ দেখবার

চেষ্টা করলে। কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। বললে, 'কে আপনি, জানি না। কিন্তু—'

—'তোমার গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টায় আছ। আপাতত ও-চেষ্টা ছেড়ে দাও। ওই দ্যাখো—'

জলের উপরে চার-পাঁচটা আলোকরেখা। রেখাগুলো একবার এদিকে, একবার ওদিকে সরে সরে যাচ্ছে।

প্রশান্ত বললে, 'ও তো দেখছি টর্চের আলো।'

—'হ্যাঁ। মহাদেওয়ের সন্দেহ হয়েছে। তার লোকরা টর্চ জেলে চারিদিক খুঁজছে। ওদের নৌকোখানাও এগিয়ে আসছে। তুমি ডুবসাঁতার দাও। মাঝে মাঝে ভেসে উঠে শ্বাস নিয়ে ওইদিকে যাও। ডাঙা বেশি দূরে নেই।'

—'আর আপনি?'

—'ওই আমার নৌকো।'

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে কাছেই দেখতে পেলে একখানা নৌকোর ছায়া। সবিস্ময়ে বললে, 'আপনি আমার প্রাণরক্ষা করলেন, অথচ আপনার নৌকোয় আমাকে ঠাঁই দেবেন না।'

—'বাঘ আর গোরুর ঠাঁই একসঙ্গে হয় না।'

ধাঁ করে প্রশান্তের মনের ভিতর দিয়ে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাড়াতাড়ি সামনের মূর্তির দিকে অগ্রসর হতে হতে উদ্ভ্রান্ত-স্বরে সে বললে, 'কে আপনি? বলুন আপনি কে?'

সাঁতার কেটে সরে যেতে যেতে মূর্তি বললে, 'মহাদেওয়ের নৌকো আসছে।'

—'আসুক। কে আপনি?'

—'মূর্খ! একসঙ্গে ধরা পড়লে আমরা কেউ রক্ষা পাব না। শিগগির ডুবসাঁতার দাও।'

—'আগে বলুন আপনি কে?'

—'আমি দীনবন্ধু।'

—'হা ভগবান।'

—'ডুবসাঁতার দাও প্রশান্ত, ডুবসাঁতার দাও!'

প্রশান্ত আর কিছু ভাবতে পারলে না, জলের তলায় ডুব দিলে।

॥ ষষ্ঠ ॥

গঙ্গার বুকে

বরুণ সাঁতরে নিজের নৌকোর উপরে গিয়ে উঠল। তার পরনে ভিজে সার্ট ও প্যান্ট—গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার সময়ে কোটটা খুলে নৌকোর উপরেই রেখে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্যোগের রাতে জলে ভিজে এখন তার গায়ে জাগল প্রবল শীতের কম্প। তাড়াতাড়ি কোটটা টেনে নিয়ে পরতে পরতে ডাকলে, 'শ্রীধর।'

—'বড়দা!'

—'তোমার ছোড়দা আর বোধহয় তোমাকে দেখতে পাবে না! তোমাকে আমন্ত্রণ করে ভালো করিনি।'

—'কেন বড়দা?'

—'মহাদেওকে আজ হয়তো ফাঁকি দিতে পারব না। ওই দ্যাখো তার নৌকো আমাদের কত কাছে এসে পড়েছে। ওরা দলে ভারী, আমরা দুজনে ঠেকাতে পারব কি?'

—'আমি হাল ধরি, তুমি খুব জোরে দাঁড় টানো।'

—'আর সে চেষ্টা মিছে। একলা দাঁড় টেনে বেশিক্ষণ পাল্লা দেওয়া অসম্ভব।'

—'তুমি রিভলভার আনোনি?'

—'এনেছি। কিন্তু ওরাও কি আর বন্দুক আনেনি—ওরা যে ডাকাত! যুদ্ধ করেও আমরা বাঁচব না। মিছেই কেবল রক্তপাত হবে।'

—'পাষণ্ডদের রক্তপাত করলে পাপ হয় না।'

—'হয়তো হয় না শ্রীধর! কিন্তু রক্ত দেখলে আমার আত্মা কষ্ট পায়।'

—'একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না বড়দা। স্ত্রীলোকের মন নিয়ে তুমি চাও যুদ্ধজয় করতে?

—'স্ত্রীলোকের মন নয় ভাই, বীরপুরুষের মন। কুরুক্ষেত্রের রক্তধারা দেখে মহাবীর অর্জুনও একদিন অস্ত্রচালনা করতে রাজি হননি।'

—'ওরা যে এসে পড়ল বড়দা!'

—'উপায় কী? ঘটনাচক্রে এমন বিপদে পড়তে হবে, কে তা জানত?'

অন্ধকার ভেদ করে একখানা মস্ত নৌকা কাছে এসে পড়ল। অনেকগুলো টর্চের আলো এসে স্থির হল বরুণ ও শ্রীধরের মুখের উপরে। জন-চারেক লোক লাফ মেরে বরুণের নৌকার উপরে গিয়ে উঠল—তাদের প্রত্যেকের হাতে রিভলভার।

একখানা বীভৎস মুখ এগিয়ে এল বরুণের মুখের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—'কে তুই?'

বরুণ অল্প হেসে বললে, 'মানুষ ছাড়া আর কিছু বলে মনে হচ্ছে নাকি?'

মহাদেও বললে, 'এখানে কী করছিস?'

—'হাওয়া খাচ্ছি।'

—'এই নিশুত রাতে, এই ঝড়-জলে পাগল ছাড়া আর কেউ নৌকোয় হাওয়া খেতে বেরোয়?

—'তাহলে আমি পাগল।'

—'এ খানা দেখছি ইলিশমাছ ধরবার নৌকো। তোরা জেলে ন'স। এ নৌকো কোথায় পেলি?'

—'ভাড়া নিয়েছি।'

—'জেলেরা এ নৌকো ভাড়া দেয় না।'

—'তাহলে আমরা নৌকো-চোর।'

—'আলবত!'

—'হ্যাঁ বাবুজি!'

—'নৌকোর ভেতরটা ভালো করে খুঁজে দ্যাখো, আরও কেউ লুকিয়ে আছে কি না?'

আলগু তার অন্বেষণ-কার্য শেষ করে বললে, 'কিছু পেলুম না বাবুজি।'

শ্রীধরকে দেখিয়ে দিয়ে মহাদেও বললে, 'ও বেটা আবার কে? দৈত্যের মতন দেখতে?'

বরুণ বললে, 'আমার বন্ধু।'

—'রামনারায়ণ, লোকটার মাথার কাছে রিভলভার ধরে দাঁড়া। একটু নড়লেই গুলি করবি।'

ইতিমধ্যে আলগু বরুণের পকেট হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছে। রিভলভারটা টেনে বার করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবুজি!'

মহাদেও বরুণের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে চকিত কণ্ঠে বললে, 'রিভলভার! তোর পকেটে রিভলভার কেন?'

—'ও আমার শখ!'

—'তোর সব শখই অদ্ভুত দেখছি যে! চড়েছিস ইলিশমাছ ধরবার নৌকোয়, হাওয়া খেতে বেরিয়েছিস রাত-আঁধারে ঝড়-জলে, পকেটে রেখেছিস রিভলভার! আসল ব্যাপার কী বল দেখি?'

—'আমিও তোমাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে পারি। তোমরাও তো কম যাও না।'

মহাদেও খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললে, 'আর সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির দরকার নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে তোরা পুলিশের লোক।'

বরুণ হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'কী লক্ষণ দেখে এতবড়ো আবিষ্কারটা করলে দাদা?'

—'আলবত তোরা পুলিশের লোক! খবরদার, আমার সামনে তুই আর হাসবি না! তোর হাসি দেখে আমার মাথা গরম হয়ে উঠছে।'

—'বেশ, তোমার মাথা ঠান্ডা করবার জন্যে এই আমি গম্ভীর হলুম।'

—'দ্যাখো, সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে হাসি-মশকরা করিসনে বলে দিচ্ছি!'

—'তবেই তো মুশকিলে ফেললে দেখছি। তুমি হাসলেও চটবে, না-হাসলেও চটবে? তাহলে এ নৌকো থেকে সরে পড়ো দাদা, সরে পড়ো।"

—'চোপরাও রাসকেল। আমি কোনও কাদা-চিংড়ি-খেকো বাঙালিবাবুর দাদা নই! ফের আমাকে দাদা বলে ডাকলে মারব গালে এক চড়। বুঝলি শুয়োরের বাচ্ছা!'

পরমুহূর্তে বরুণের প্রচণ্ড এক পদাঘাতে মহাদেও ঠিক প্রকাণ্ড এক কাপড়ের বস্তার মতন ঠিকরে নৌকার বাহিরে গিয়ে পড়ল! ডাকাতের দল হতভম্ব।

বরুণ চিৎকার করে ডাকলে—'শ্রীধর!' তারপরেই দিলে জলে ঝাঁপ। রিভলভারধারী রামনারায়ণের বিস্মিত দৃষ্টি তখন অন্ধকার গঙ্গায় অদৃশ্য মহাদেওকে খুঁজতে চাইছে, সেই ফাঁকে শ্রীধরও জলে ঝাঁপ দিতে দেরি করলে না।

সামনেই আর-একখানা নতুন নৌকো ভেসে যাচ্ছিল। ততক্ষণে আত্মসংবরণ করে ডাকাতরা পাঁচ-ছয়টা রিভলভার ছুড়তে শুরু করলে। গুলিবৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে বরুণ ও শ্রীধর তাড়াতাড়ি সেই নৌকায় গিয়ে উঠল।

অন্ধকারে প্রশ্ন হল, 'কে?'

বরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'শিগগির নৌকো চালিয়ে এগিয়ে যাও! নইলে মহাদেও-ডাকাতের পাল্লায় পড়বে!'

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে একদল লোক বরুণ ও শ্রীধরের উপরে লাফিয়ে পড়ল। এই নতুন বিপদের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না, বাধা দেবার কোনও সুযোগই পেলে না। তারা বন্দি হল।

এ নৌকা থেকে চেঁচিয়ে কে ডাকলে, 'মহাদেওবাবু, মহাদেওবাবু!'

অন্য নৌকা থেকে আলগু ডাক ছেড়ে বললে, 'কে রে, বদরি নাকি?'

—'হ্যাঁ ভাই, আমি! তোদের এত দেরি দেখে আমাদের ভয় হয়েছিল। তাই খোঁজ নিতে এসেছি।'

—'তোদের নৌকোয় গোলমাল শুনলুম না?'

—'হ্যাঁ। দুটো বাংগালি ভাগছিল, তাদের আমরা পাকড়ে ফেলেছি?'

মহাদেওয়ের গর্জন-স্বর শোনা গেল—'বড়ো আচ্ছা কাজ করেছিস রে বদরি। দু-ব্যাটা দুষমণকেই ধরেছিস তো?'

—'হাঁ হুজুর!'

—'তোকে তিনশো টাকা বকশিশ দেব। নৌকো নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। খুব সাবধানে, ওরা আবার পালায় না যেন!'

নৌকা দু-খানা যখন কাছাকাছি হল, বরুণ তখন শুনতে পেলে ডাকাতদের নৌকা থেকে কে বলছে, 'বাবুজি, ও দুটো আপদকে আর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কেন? ওদের হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিন!'

মহাদেওয়ের গলায় শোনা গেল, 'না, না! ওদের কাছে থেকে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে—ব্যাটারা সহজ লোক নয়। ......আলগু, আর এদিকে থাকা চলবে না, আমাদের অন্য আড্ডায় চল!'

........বন্দি শ্রীধরের কানে কানে বন্দি বরুণ বললে, 'কপাল বড়োই খারাপ! ভেবেছিলুম এখানা হচ্ছে সাধারণ নৌকো!'

শ্রীধর বললে, 'আমার কিছু ভয় হচ্ছে না বড়দা! জানি, তুমি যখন আছ আমার কোনওই ভয় নেই! মহাদেও তোমার কী করবে?'

॥ সপ্তম ॥

কাচ-কাগজের কেরামতি

নৌকো যখন থামল, রাত শেষ হতে দেরি নেই। বৃষ্টি ধরেছে বটে, কিন্তু আকাশ তখনও মেঘে-থমথমে।

তারা কোথায় এসেছে বোঝবার জন্যে বরুণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল, কিন্তু

কালো অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলো আরও-কালো গাছপালার ছায়া ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না।

সকলে একখানা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড উঠান, তার চারিদিকে বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ানো রয়েছে অনেকগুলো 'প্যাকিং' বাক্স।

মহাদেও বললে, 'ও দু-বেটাকে তেতলার গুদামঘরে বন্ধ করে রেখে আয়। আজ ভারী মেহনত হয়েছে, খানিক ঘুমিয়ে না নিলে চলবে না। কাল আমার খিদিরপুরে হাজির থাকা চাই—পরশু এসে ওদের ব্যবস্থা করব।'

—'এঁদের কী খেতে দেব বাবুজি?'

—'কিছু না, খালি জল। জানোয়ারদের পোষ মানাতে হয় উপোসি রেখে। পেটের ভিতরে কিছু না ঢুকলেই পরশু ওদের পেটের কথা বাইরে বেরোয় কি না দেখে নেব।'

তেতলায় উঠে একখানা আলোকহীন ঘরের ভিতরে বরুণ ও শ্রীধরকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে আলগু বললে, 'খবরদার, কেউ চেল্লাচিল্লি করবি না! তাহলে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখব—বুঝলি?'

—'বুঝেছি।'

—'বাবুজির হুকুম শুনলি তো? খালি জলযোগ করেই পরশু পর্যন্ত কাটাতে হবে। এই নে, জলের কুঁজোটা রাখ!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ হল।

বরুণ বললে, 'শ্রীধর, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।'

শ্রীধর বললে, 'আমারও।'

—'তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া? কী বলো?'

—'হ্যাঁ বড়দা।'

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে ডবল নাসিকার 'ডুয়েট'-সংগীতে ঘর-জোড়া অন্ধকার যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আদুড় মেঝে, ভিজে পোশাক, অদূর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা, এবং দলবদ্ধ মশকদের হুল এসব কিছুই তাদের সেই দারুণ নিদ্রাকে বাধা দিতে পারলে না।.........

.........পরদিন সকালে শ্রীধর চোখ খুলে দেখলে, বরুণ একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' বলে উদ্দেশে নমস্কার করে শ্রীধর উঠে বসল।

বরুণ ফিরে বললে, 'শ্রীধর, দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করবেন বলে তুমি বিশ্বাস করো?'

শ্রীদুর্গার উদ্দেশে আরও তিনটে প্রণাম ঠুকে শ্রীধর বললে, 'বিশ্বাস করি বই কি বড়দা।'

—'তাহলে প্রথমেই আমাদের কী দুর্গতি দ্যাখো। সকালে এক পেয়ালা চা আর দু-খানা 'টোস্ট' পর্যন্ত পাবার আশা নেই।'

শ্রীধর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

—'দুপুরে দুটি অন্ন আর একটু আলু-ভাতে পর্যন্ত জুটবে না।'

শ্রীধর এবারে একটা নয়, দু-দুটো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

—'শ্রীধর, তোমার দীর্ঘশ্বাসের সংখ্যা বাড়ছে, আর এই অপ্রীতিকর আলোচনায় কাজ নেই।'

—'আমরা কোন দেশে আছি, বড়দা?'

—'বাংলা দেশেই নিশ্চয়। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েও এর বেশি কিছু বোঝা যায় না। এ বাড়িখানা প্রকাণ্ড এক বাগানের মাঝখানে আছে। চারিধারে এত বড়ো বড়ো গাছের ভিড় যে, তাদের ভিতর দিয়ে চোখ চলে না। দূর থেকেও লোকালয়ের কোনও সাড়া পাচ্ছি না।'

শ্রীধর বিরক্ত স্বরে বললে, 'ডাকাতব্যাটাদের কোনও লোকও যে ঘরে ঢুকছে না। তাহলে তাদের কাছ থেকে কিছু খবর নেবার চেষ্টা করতুম।'

—'আমার বিশ্বাস কালকের আগে ওরা কেউ আর এমুখো হবে না। পরন্ত আমাদের একেবারে ডাক পড়বে মহাদেওয়ের বিচারসভায় যাবার জন্যে।'

—'আমরা লম্বা দিলুম কি না, সে খোঁজও নিতে আসবে না?'

—'ও-বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত আছে। এটা একখানা তিনতলা বাড়ির উপরকার ঘর। আমরা চড়ুইপাখি নই যে জানলার ফাঁক দিয়ে গলে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাব। তিনতলা থেকে লাফ মারাও সম্ভব নয়, আর সে অসম্ভবের পথও বন্ধ করে আছে ওই লোহার গরাদগুলো।'

শ্রীধর ফিক করে হেসে ফেললে।

—'হাসছ বড়ো যে?'

—'বড়দা, আমি কি তোমার গায়ের জোর জানি না? ওই লোহার গরাদ তুমি কি হাতের চাপে টিনের মতন বেঁকিয়ে ফেলতে পারো না?'

—'তা হয়তো পারি। কিন্তু তারপর? তারপর কি লাফ মেরে আত্মহত্যা করব?'

—'হায় হায়, কোনওরকমে কি একগাছা লম্বা দড়ি জোগাড় করা যায় না?'

—'যদি আমরা ধুতি পরে আসতুম তাহলে দড়ির অভাব মেটানো যেত অনায়াসে। কিন্তু আমি পরেছি কোট-প্যান্ট আর তোমার পরনে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি।'

—'বাবা, কাপড়ের যা দাম, তাই তো লুঙ্গি পরি।'

—'যাক, বাজে কথায় সময় কাটিয়ে কাজ নেই। মহাদেও কাল বলছিল এটা গুদোম-ঘর। কিন্তু এটা কীসের গুদোম?

শ্রীধর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, 'হতভাগা মহাদেওয়ের গুদোমঘর নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।'

বরুণ হাসতে হাসতে বললে, 'তাই নাকি? তাহলে আমি নিজের মাথাকেই ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করি।'

সেটা হচ্ছে মস্ত হলঘরের মতন। মাঝখানটা খালি। কিন্তু চারিদিকেই প্রায় কড়িকাঠ-সমান উঁচু মাল-পত্তর।

বরুণ পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'এদিকটা দেখছি প্যাকিং-বাক্সে ভরতি। বাক্সগুলোর ভেতরে কী আছে? আরে, এ যে হরেক-রকম বিলিতি ওষুধের শিশি-বোতল। সবই দেখছি ওষুধে ভরা। 'হরলিকস'ও রয়েছে গাদা গাদা। ব্যাপারটা বুঝেছ শ্রীধর?'

—'কিছুই বুঝছি না বড়দা

—'মহাদেও এই যুদ্ধের সময়ে 'ব্ল্যাক মার্কেটে'র কারবারও চালায়। ভারী হুঁসিয়ার ব্যক্তি। ওদিকে বড়ো বড়ো সিগারেটের বাক্স। কোনও বাক্সই বোধহয় খালি নয়। কতগুলো বাক্স আছে গুনে দ্যাখো তো শ্রীধর।'

শ্রীধর গুনে বললে, 'বাক্স আছে মোট হাজারটা।'

বরুণ বললে, 'প্রত্যেক বাক্সে আছে পঞ্চাশ প্যাকেট করে সিগারেট। তাহলে হাজার বাক্সে আছে পঞ্চাশ হাজার প্যাকেট। শ্রীধর, তুমি সিগারেট খাও?'

—'না বড়দা। আর খেলেও এখন আমি সিগারেট-ফিগারেট নিয়ে মাথা ঘামাতুম না।'

—'কেন শ্রীধর?'

—'মাথার ওপরে যখন খাঁড়া ঝোলে তখন কে সিগারেটের কথা ভাবে বলো?'

—'আমি ভাবি শ্রীধর, আমি ভাবি। আমিও সিগারেট খাই না, তবু সিগারেটের কথাই ভাবছি।'

—'ভেবে লাভ? সিগারেট দিয়ে তুমি কি স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে চাও?'

—'না শ্রীধর। কিন্তু আমি যে সিঁড়ি বানাতে চাই, তা দিয়ে সরাসরি স্বর্গে ওঠা যাবে না, তবে চটপট মর্তে নামা চলবে।'

—'বিপদে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বড়দা বাজে ভুল বকছ।'

শ্রীধরের কথা বরুণ আমলেও আনলে না। হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'শ্রীধর, মাভৈ!'

—'কী বলছ?'

—'কিছু ভয় নেই আর! কেল্লা মার দিয়া!'

—'আরে বাজে বোকো না বড়দা, তোমার পায়ে পড়ি!'

—'উপায় হয়েছে শ্রীধর, উপায় হয়েছে।'

—'কীসের উপায়?'

—'পালাবার!'

—'কেমন করে।'

—'আগে লোহার গরাদ ভাঙব।'

—'তারপর?'

—'তারপর দুজনে একে একে বাগানে গিয়ে নামব।'

—'হাওয়ার সিঁড়ি ধরে?'

—'না রে মুখ্যু, না! এই দেখ!'

বরুণ সিগারেটের একটা বাক্স নামালে। একটা প্যাকেট বার করলে। প্যাকেটের উপরকার পাতলা ও ঠিক কাচের মতই স্বচ্ছ কাগজের আবরণটা খুলে নিয়ে বললে, 'শ্রীধর, এটা কী?'

—'আমরা তো ওকে কাচ-কাগজ বলে ডাকি।'

—'বেশ, আমিও তোমার ভাষায় একে কাচ-কাগজ বলেই ডাকব। কিন্তু এর বিলিতি নাম হচ্ছে 'সেলোফেন'।'

শ্রীধর অবহেলা-ভরে বললে, 'তা হবে। কিন্তু কাগজ চিবিয়ে তো আর পেটের খিদে মিটবে না!'

বরুণ কোনও জবাব না দিয়ে সেই 'কাচ-কাগজ' খানা পাকিয়ে পাকিয়ে একেবারে সরু-লিকলিকে করে ফেললে। তারপর সেটা শ্রীধরের হাতে দিয়ে বললে, 'তুমি এটা ছিঁড়তে পারো?'

শ্রীধর রীতিমতো বলবান ব্যক্তি। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'কী যে বলো বড়দা!'

—'চেষ্টা করে দ্যাখো।'

দু-হাতে পাকানো-কাগজের দু-দিক ধরে শ্রীধর এক টান মারলে। ছিঁড়ল না। সে খুব জোরে টান মারলে। তবু ছিঁড়ল না। তার চোখে-মুখে ফুটল বিস্ময়ের আভাস। অপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, 'কী আশ্চর্য, এত শক্ত!'

—'আরও জোরে টানো শ্রীধর, আরও জোরে। তুমি না পালোয়ান ছিলে?'

আরও বার-তিনেক টানাটানি—প্রবল টানাটানির পর কাগজখানা পট করে ছিঁড়ে গেল।

—'শ্রীধর, এই 'সেলোফেন' অর্থাৎ কাচ-কাগজই আজ আমাদের বাঁচাবে!'

শ্রীধর অবিশ্বাসের স্বরে বললে, 'কী-রকম?'

বরুণ নীরবে কয়েকটা প্যাকেট থেকে কয়েকখানা 'কাচ-কাগজ' খুলে নিলে। তারপর একখানা কাগজ আবার পাকিয়ে পাকিয়ে খুব সরু করে ফেললে। তারপর আর একখানা। পরে পরে এমনি কয়েকখানা। তারপর সাধারণ দড়ির মতন গেরো দিয়ে কাগজগুলো পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে প্রায় সাত হাত লম্বা একটা কাগজের দড়ি তৈরি করে ফেলল।

বললে, 'শ্রীধর, তুমিও আমাকে সাহায্য করো। এসো, আমরা এই মাপের আরও ক-গাছা দড়ি তৈরি করি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আট গাছা সাত হাত লম্বা দড়ি তৈরি হল। তারপর আট গাছা দড়িকে একত্র করে এক গোছা দড়িতে পরিণত করে বরুণ বললে, 'শ্রীধর, তুমি দড়ির ওদিকটা ধরো। আচ্ছা, এইবার 'টাগ অফ-ওয়ার' শুরু করা যাক।'

কাগজ-দড়ির দুই প্রান্ত ধরে দুজনে খানিকক্ষণ টানাটানি করতে লাগল। দুইজনেই বলবান, কিন্তু তবু দড়ি ছিঁড়ল না।

বরুণ হাসতে হাসতে বললে, 'কী বুঝছ শ্রীধর?'

শ্রীধর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'কাচ-কাগজের এত গুণ, আগে কে জানত বড়দা?'

—'শ্রীধর, আমি যে পথের পথিক, সে পথ বড়ো বিপজ্জনক, এখানে পদে পদে ফাঁড়া কাটাতে হয়। এখানে সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ করে তোলবার ক্ষমতা না থাকলে কেউ বাঁচতে পারে না। যখনই সময় পাই তখনই আমি যে-কোনও দ্রব্যগুণ-পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকি। তাই পুলিশকে বহুবার ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছি।'

—'বড়দা, তোমার পায়ের ধুলো দাও।'

—'এখনও পায়ের ধুলো নেওয়ার সময় হয়নি শ্রীধর, এখনও অনেক কাজ বাকি।'

—'কী করতে হবে বলো।'

—'তিনতলা থেকে একতলার মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারো এমন লম্বা আট-দশ গাছা কাচ-কাগজের দড়ি তৈরি করতে হবে। আমাদের হাতে আছে পঞ্চাশ হাজার সিগারেটের প্যাকেট, সুতরাং মালের অভাব হবে না। সেই আট-দশ গাছা দড়িকে একসঙ্গে চেপে ধরে আজ রাত্রে আমরা বাগানে নামবার চেষ্টা করব।'

শ্রীধর খুশির চোটে অস্থির হয়ে নাচতে শুরু করে বললে, 'জয় মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী!'

বরুণ বললে, 'কাল সকালে মহাদেওয়ের শ্রীবদনখানি কী ভাবধারণ করবে, আমি এখনই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!'

॥ অষ্টম ॥

ছোট্টুলাল

পরদিন বৈকালে প্রশান্ত ঝোড়ো কাকের মতন ভগ্নদেহে ভগ্নপ্রাণে ফিরে এল কলকাতায়।

হানাবাড়ির জঙ্গলে সে একজন ডাকাতকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি, উলটে পুলিশের দুজন হত ও তিনজন আহত হয়েছে এবং তার নিজের প্রাণও যেতে যেতে কোনওরকমে বেঁচে গিয়েছে।

তার মন সবচেয়ে খারাপ হয়ে আছে আর এক কারণে।

যে-দীনুকে সে নিজের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু বলে মনে করত, যার কাছে পদে পদে হরেক-রকম নাকাল হয়েছে, যাকে গ্রেপ্তার করাই হচ্ছে তার জীবনের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সে প্রাণরক্ষা করতে পেরেছে একমাত্র তারই অনুগ্রহে। দীনু কেবল তাকে পরাজয়ের গ্লানিই দান করেনি, তার উপরে দিয়েছে জীবন ভিক্ষা। প্রশান্তের কাছে এর চেয়ে যাতনাদায়ক আর কিছুই নেই।

উপরওয়ালার কাছে চোরের মতন নত-মস্তকে 'রিপোর্ট' দাখিল করে এবং বহু অকথা-কুকথা সহ্য করতে বাধ্য হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাসার দিকে ফিরল অপরাধীর মতন। পথে আসতে আসতে বার বার তার মনে হতে লাগল, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত কি না?

বাসার সামনে এসে দেখে, পথের ধারের রোয়াকের উপরে বসে আছে একটা লোক। তাকে দেখেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকলে।

প্রশান্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, সুদর্শন মুখ, সুগঠিত দেহ, পোশাক বাঙালির, কিন্তু চেহারা বাঙালির নয়।

প্রশান্তর মনে হল, মুখখানা যেন চেনা চেনা। সে বললে, 'কে তুমি?'

—'আমি ছোট্টুলাল।'

—'তোমার কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

—'আজ্ঞে, দেখেছেন বই কি! কালই দেখেছেন।'

—'কাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

—'মহাদেও মিশিরের দলে।'

প্রশান্ত সবিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে এল।

—'ভয় নেই বাবুজি!'

প্রশান্ত অপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, 'আমি ভয় পাইনি। কী মতলব তোমার?'

—'আমার মতলব মন্দ নয়। আমি আপনার কাছে এসেছি জরুরি কাজে।'

প্রশান্ত হঠাৎ বাঘের মতন ছোট্টুলালের উপরে লাফিয়ে পড়ল। দুই বজ্রমুষ্টিতে তার দুই হাত চেপে ধরে বললে, 'আমার কাছে তোর জরুরি কাজ? তবে রে পাজি!'

ছোট্টুলাল কিছুমাত্র অভিভূত না হয়ে বললে, 'হাত ছাড়ুন বাবুজি! আমি মহাদেওয়ের লোক নই।'

—'অথচ মহাদেওয়ের দলে থাকিস?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তুই কি আমাকে কচি খোকা পেয়েছিস?'

—'আজ্ঞে না। কচি খোকার গোঁফ থাকে না। আপনার মস্ত গোঁফ আছে।'

—'আবার মশকরা হচ্ছে?'

—'আজ্ঞে না। সত্যি কথা বলছি।'

—'বল তুই, কেন এসেছিস?'

—'আমি দীনবন্ধুর লোক। তাঁরই হুকুমে মহাদেওয়ের দলে আছি। এইবারে হাত ছেড়ে দেবেন?'

প্রশান্তর তখন মনে পড়ল, দীনুডাকাতের পত্রে তার এক গুপ্তচরের কথা আছে।

ছোট্টুলাল বললে, 'আমি আপনার কাছে এসেছি মহাদেওকে ধরিয়ে দিতে।'

তার হাত ছেড়ে দিয়ে প্রশান্ত বললে, 'মহাদেও এখন কোথায়?'

—'সব বলব বলেই এসেছি। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কওয়া কি ভালো?'

ছোট্টুলালকে ইঙ্গিতে সঙ্গে আসতে বলে প্রশান্ত বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। ছোট্টুলাল সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশান্ত বললে, 'এইবারে তোমার কথা বলো?'

—'আমি মহাদেওয়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এক শর্তে।'

—'তোমার আবার শর্তে আছে!'

—'আছে বই কি বাবুজি! বিনা স্বার্থে আমি আপনার উপকার করতে আসিনি।'

—'শর্তটা শুনি?'

—'আমি মহাদেওকে ধরিয়ে দিতে এসেছি একজনকে বাঁচাবার জন্যে।'

—'বাঁচাবার জন্যে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যাপারটা বুঝলুম না।'

—'মহাদেও কাল নিশ্চয়ই তাঁকে খুন করবে।'

—'কে সে?'

—'যিনি কাল আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

—'কী বললে?'

—'দীনবন্ধুবাবুর কথা বলছি।'

প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিপুল বিস্ময়ে। তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

—'দীনবন্ধুবাবু আপনাকে বাঁচাতে গিয়েই ধরা পড়েছেন।'

—'দীনু হয়েছে মহাদেওয়ের বন্দি! দীনু—দীনু—যাকে আমি এত চেষ্টা করেও স্পর্শ করতে পারিনি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বন্দি হয়েছেন আপনার জন্যেই!'

—'সব কথা খুলে বলো।'

ছোট্টুলাল সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণনা করে বললে, 'আমি মহাদেওয়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, যদি মহাদেওকে গ্রেপ্তার করে আপনি দীনবন্ধুবাবুকে ছেড়ে দিতে রাজি হন।'

—'তাহলে দীনুই তোমাকে পাঠিয়েছে?'

—'না, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলবার ফাঁক পাইনি। কিন্তু তিনি আমার অন্নদাতা। তাঁকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় না দেখে আমি নিজেই লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

প্রশান্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শুষ্কস্বরে বললে, 'ছোট্টুলাল তুমি জানো না তোমার শর্ত-মতন কাজ করা আমার পক্ষে কতটা কঠিন! আমার কাছে দীনুর নামে 'ওয়ারেন্ট' আছে। আমি পুলিশ কর্মচারী, দীনুকে হাতে পেলে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য।'

—'কী বলছেন আপনি! কাল দীনবন্ধু না থাকলে আজ কি এখানে দাঁড়িয়ে আপনি এত-বড়ো অধর্মের কথা উচ্চারণ করতে পারতেন?'

প্রশান্ত বিষম সমস্যায় পড়ে গেল। মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার এক দিকে সরকারি চাকরির কর্তব্য, আর এ দিকে মনুষ্যত্বের কর্তব্য! এখন সে কোন দিকে সামলাবে? অবশেষে হতাশভাবে বসে পড়ে ভাবতে লাগল।

ছোট্টুলাল বললে 'তাহলে আমার শর্তে আপনি রাজি নন?'

—'কী করে রাজি হই ছোট্টুলাল!'

—'নমস্কার বাবু, আমি চললুম।'

—'দাঁড়াও।'

—'আর দাঁড়িয়ে কী লাভ?'

—'মহাদেও এখন কোথায়?'

—'বলব না।'

—'কেন?'

—'আমি পুলিশের লোক নই। মহাদেওয়ের ঠিকানা দিয়ে আমার বাবুকেও বিপদে ফেলতে পারব না।'

—'তুমি জেনো ছোট্টুলাল, তোমার বাবুকে গ্রেপ্তার করলে মহাদেওয়ের মতন তারও ফাঁসি হবার ভয় নেই। তোমার বাবু আজ পর্যন্ত খুন করেনি।'

—'তা আমি জানি।'

—'বড়োজোর তার দ্বীপান্তর হতে পারে।'

—'ভারী সুখবর দিলেন! বাবুকে আমি পাঠাব দ্বীপান্তরে! তার চেয়ে বাবুর মৃত্যু ভালো। আপনার সঙ্গে আর কথা কইতে চাই না, আমি চললুম।'

—'যদি তোমাকে যেতে না দিই? দীনুডাকাতের চর বলে যদি তোমাকে গ্রেপ্তার করি?'

—'পুলিশের যোগ্য কথাই বললেন! বাবুজি!'

প্রশান্ত অত্যন্ত কাতর মুখে দুই হাতের ভিতরে মুখ রেখে মনে মনে আবার কিছুক্ষণ ধরে কী চিন্তা করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'শোনো ছোট্টুলাল। মহাদেও হচ্ছে ভীষণ অপরাধী। সে স্বাধীন থাকলে আরও অনেক নরহত্যা হবে। বিশেষ, তার জন্যে আজ আমাকে অত্যন্ত অপমানিত হতে হয়েছে। তাকে ধরবার এ সুযোগ আমি ছাড়তে পারব না। তোমার শর্তে আমি রাজি। দীনুকে গ্রেপ্তার করব না।'

ছোট্টুলাল সন্দিগ্ধ ভাবে বললে, 'আপনার কথায় আর আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

—'কেন?'

—'হয়তো আপনার মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়!'

—'আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করছি। কিন্তু ছোট্টুলাল, আমার গোয়েন্দা-জীবনের শেষ কাজ হচ্ছে এই মহাদেওকে গ্রেপ্তার করা।'

—'শেষ কাজ? কী বলছেন বাবুজি?'

—'হ্যাঁ ছোট্টুলাল। মহাদেওকে গ্রেপ্তার করেই আমি চাকরিতে ইস্তফা দেব।'

—'কেন বাবুজি?'

—'দীনুকে গ্রেপ্তার না করে নিমকের মর্যাদা নষ্ট করেছি বলে। লোকের কাছে আমি নিমকহারাম হতে চাই না—নিজেকে শাস্তি দেব নিজেই।............এখন মহাদেওয়ের কথা বলো।'

পরদিন প্রভাতের সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল, সেই মস্তবড়ো বাগানওয়ালা বাড়িখানার চতুর্দিকে বসেছে পুলিশের পাহারা।

একদল সশস্ত্র পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে প্রশান্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। তার পাশে ছোট্টুলাল।

বাড়ির ভিতরটা সমাধির মতন স্তব্ধ। একতলা, দোতলা, তেতলা সব করছে খাঁ খাঁ। কোথাও কোনও ঘরে নেই জনপ্রাণী।

প্রশান্ত বললে, 'এ কী হল ছোট্টুলাল।'

ছোট্টুলাল শুকনো গলায় বললে, 'মহাদেও কেমন করে খবর পেয়ে দলবল নিয়ে সরে পড়েছে!'

—'তোমার বাবু?'

—'ওই ঘরে ছিলেন। কিন্তু ও ঘরের দরজাও তো খোলা দেখছি!'

প্রশান্ত ঘরের ভিতরে ঢুকল। কেউ নেই।

ছোট্টুলাল ছল-ছলে চোখে বললে, 'আমার বাবু বোধহয় বেঁচে নেই!'

প্রশান্ত বিস্মিত স্বরে বললে, 'ও-জানলাটার দুটো গরাদ অমন করে বাঁকিয়ে ফাঁক করলে কে?'

ছোট্টুলাল বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল।

—'ওহে ছোট্টু, ওটা তোমারই বাবুর কীর্তি নয়তো? দীনু হয়তো লম্বা দিয়েছে—আমার সাহায্যের অপেক্ষা রাখেনি।'

ছোট্টুলাল মাথা নেড়ে বললে, 'অসম্ভব। তিনতালা থেকে লাফ মেরে কেউ পালাতে পারে নাকি?'

—'আরে, লাফ মারবে কেন, গরাদের সঙ্গে দড়ির মতন এই যে কী একটা বাঁধা রয়েছে। এ আবার কী রে বাবা? কাগজের দড়ি?' নীরবে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে হতবুদ্ধির মতন প্রশান্ত বললে, 'এ যে দেখছি 'সেলোফেন' কাগজ পাকিয়ে তৈরি! একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে যে বাবা!' খানিকক্ষণ মুখ বিকৃত করে বিষম জোরে টানাটানির পর আবার বললে, 'এ দিয়ে মোষ বাঁধা যায় যে ছোট্টু! এমন কথা কে কবে শুনেছে?'

ছোট্টুলাল প্রথমটা হতভম্বের মতন ছিল, তারপর মহা উল্লাসে এক লাফ মেরে বলে উঠল, 'এতক্ষণে সব বুঝেছি! বাবু পালিয়েছেন দেখেই মহাদেওরা ধরা পড়বার ভয়ে চম্পট দিয়েছে!'

প্রশান্ত বললে, 'দীনু পালাতে পেরেছে বলে আজ আমি দুঃখিত নই। আমাকে আর নিমকের মর্যাদা নষ্ট করতে হল না। কিন্তু এমন অসাধারণ যার বুদ্ধি, সে কিনা করে চুরি-ডাকাতি! তোমার বাবুকে বোলো ছোট্টুলাল, সে যেন এবার চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দেশান্তরে চলে যায়। নইলে আমি নিরুপায়। তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।'

॥ নবম ॥

দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রশান্ত

সন্ধ্যার পরে অরুণ একখানা সোফার উপর দুই পা ছড়িয়ে কোনও সাপ্তাহিক কাগজের ছবির পাতার পর পাতা ওলটাচ্ছে আর মনে মনে বিরক্ত ভাবে বলছে—'আজকালকার বাংলা কাগজওয়ালাগুলো ভাবে, পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সিনেমার যত রাবিস, অ-রাবিস, কম-রাবিস, বেশি-রাবিস নট-নটীদের ছবি দিলেই অনায়াসে গ্রাহকদের পকেট-কাটা চলবে, পত্রিকার সঙ্গে সুলেখকদের সম্পর্ক রাখবার একটু দরকার নেই'—এমন সময়ে হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঝড়ের মতন প্রবেশ করলে প্রশান্ত।

অরুণ সোফার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল।

প্রশান্ত ধপ্পাস করে একখানা কৌচের উপরে বসে পড়ে হাঁ-করা মুখে বেজায় হাঁপাতে লাগল।

অরুণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কী হয়েছে প্রশান্তবাবু, অমন কাতর ভাবে হাঁপাচ্ছেন কেন?'

প্রশান্ত ম্লান হাসি হেসে হাঁপ থামাবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে!'

—'বলেন কী মশাই, আপনার এই বয়সে দৌড় প্রতিযোগিতা!'

—'সত্যি তাই। ভীষণ প্রতিযোগিতা!'

—'জিতল কে?'

—'আমি।'

—'কী লাভ হল?'

—'পৈতৃক প্রাণ।'

—'বুঝলুম না।'

—'বোঝবার কথা নয় মশাই, ভাববার কথা।'

—'কীসের ভাবনা?'

—'আমার পিছনে প্রাণঘাতী শত্রু লেগেছে।'

—'কে? দীনুডাকাত?'

—'না মশাই, না! আপনার বন্ধু দীনু আমার বন্ধু না হলেও এমন নিম্নশ্রেণির শত্রু নয়।'

—'নিম্নশ্রেণির শত্রু আবার কী?'

—'যে প্রাণে মারবার চেষ্টা করে।'

—'বলেন কী! আপনার এমন শত্রুও আছে?'

—'আছে বই কি!'

—'সে কে?'

—'মহাদেও।'

—'মহাদেও? যে পাষণ্ড আপনার কঙ্কালকে পাতাল রাজ্যের বাসিন্দা করতে চেয়েছিল?'

প্রশান্ত চমকে উঠে বললে, 'আপনি কেমন করে জানলেন? এ খবর তো খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়নি!'

অরুণ মুখ টিপে হেসে বললে, 'খবরের কাগজে না বেরুলেও অনেক খবর জানা যায়। এই যে আজ সকালে আপনি চা পান করেছেন, ডাল-ভাত-ঝোল খেয়েছেন, তা কি আমি জানি না? কিন্তু এ খবর কি খবরের কাগজে বেরিয়েছে?'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, 'ভুল। আজ অমাবস্যা, আমি ডাল-ভাত-ঝোল ছুঁইনি।'

—'কিন্তু চা খেয়েছেন তো?'

—'তা খেয়েছি। আর এক 'কাপ' পেলেও খেতে পারি। অনেকটা পথ দৌড়তে হয়েছে কিনা!'

—'শ্রীধর! অ শ্রীধর! শ্রীধর হে! আরে, সাড়া দাও না কেন বাবা? বলি, সন্ধ্যা হতেই নাক ডাকানো বুঝি?'

উপর থেকে শ্রীধরের সাড়া এল—'না গো ছোড়দা, নাক আমার বোবা হয়েই আছে। কী বলছ?'

—'খুব ভালো করে এক 'কাপ' চা তৈরি করে আনো। মনে রেখো, প্রশান্তবাবু খাবেন। বড়ো যে-সে লোক নন, চা খারাপ হলে তোমার নামে জরুরি ওয়ারেন্ট বেরুবে।'

প্রশান্ত দীন ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'আমার পাতাল প্রবেশের কাহিনি আপনি কী করে জানলেন বলবেন না? দীনুডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?'

—'আপনার পাতাল-প্রবেশের পর? না?'

—'তবে?'

অরুণ জানে, সেদিনকার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে বরুণের সঙ্গে শ্রীধরও—প্রশান্তর যা অজ্ঞাত। তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বললে, 'এর বেশি আর কিছু শুনে কাজ নেই। কিন্তু ওকথা থাক। আজকের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা কী?'

প্রশান্ত তখন নাচার হয়ে ও-প্রসঙ্গ ত্যাগ করে বললে, 'সন্ধ্যার পর থানা থেকে বেরুলুম। স্থির করলুম, শ্রীচরণ-ভরসা করেই বাসায় ফিরব। পূর্ণ 'ব্ল্যাক আউটে'র রাজত্বে কলকাতার সমস্ত পথই আজকাল অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে উঠেছে, জানেন তো? চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকেও আন্দাজে আঁধারে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে অগ্রসর হতে হয়। খানিক পরে একটা বড়ো রাস্তা পার হবার দরকার হল। রাস্তায় নেমে ওপাশের ফুটপাথের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছি, হঠাৎ wrong side দিয়ে একখানা মোটর ঘণ্টায় হয়তো পঞ্চাশ মাইল বেগে হুড়মুড় করে একেবারে আমার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল। ভাগ্যে আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলুম, কোনও রকমে লাফ মেরে ফুটপাথে উঠে পড়ে এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলুম। ফিরে মোটরের দিকে তাকাবার আগেই সেখানা বায়ুবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তারপরেই লক্ষ্য করলুম, সেখানে অন্ধকার প্রায় মিলিয়ে জন-তিনেক লোক ঠিক মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতবড়ো একটা দুর্ঘটনার উপক্রম দেখেও তারা একটুও নড়ল না, আমার কাছে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না, কোনওরকম আগ্রহই প্রকাশ করলে না—যেন একটা মানুষের দেহ চোখের সামনে জড়পিণ্ডে পরিণত হওয়া ধর্তব্যেরই মধ্যে গণ্য নয়! মোটরচালক যে স্বেচ্ছায় আমার উপরে এসে পড়েছিল, মনে স্পষ্ট এই ধারণা হল। আমি যে মরলুম না সেটা তার হাতযশ নয়, আমারই পরমায়ুর জোর। তার উপরে এই লোকগুলোর সন্দেহজনক ব্যবহার দেখে আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম। লোকগুলোর নিশ্চেষ্টতা অমনি দূর হয়ে গেল, তারাও আসতে লাগল আমার পিছনে পিছনে। আমি ধীরে চলি, তারাও ধীরে চলে; আমি জোরে চলি, তারাও জোরে চলে; আমি দাঁড়াই, তারাও দাঁড়ায়। তারা আমারই অনুসরণ করছে।

'একটা সরু গলিতে ঢুকলুম। পিছনে পিছনে তারাও ঢুকল। খালি ঢুকল না, আরও বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, তার উপরে এই পথিকহীন গলি। গতিক সুবিধের নয় দেখে ছুটতে আরম্ভ করলুম—আমার পকেটে একটা

পেনসিল-কাটা ছুরি পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু যেমনি ছোটা, পিছনে অমনি রিভলভারের আওয়াজ! সঙ্গে সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ! তারপরেই আবার আমার পিছনে পদশব্দ! কিন্তু আমি তখন পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। গলি থেকে বেরিয়ে সামনে আপনার বাড়ি দেখে এইখানেই ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়েছি। এই হচ্ছে আমার দৌড় প্রতিযোগিতার বিবরণ।'

অরুণ অবাক হয়ে সব শুনে বললে, 'আপনার বিশ্বাস এইসব ব্যাপারের পিছনে আছে মহাদেও?'

—'তা নয়তো কী? আমার ওপরে তার বিজাতীয় রাগ হবার কারণ আছে। প্রথমত, আমি তার দুটো বড়ো বড়ো আস্তানা আক্রমণ করেছি। দ্বিতীয়, এতদিন সে নিরাপদে সকলের চোখের আড়ালে অজ্ঞাতবাস করছিল, কিন্তু আমার জন্যে আজ তার আসল স্বরূপ জাহির হয়ে পড়েছে—'

অরুণ বাধা দিয়ে বললে, 'আমি এ কথার প্রতিবাদ করি। মহাদেওকে খুঁজে বার করেছে বরুণ।'

প্রশান্ত হেসে বললে, 'বেশ, তাই। তৃতীয়ত, মহাদেওয়ের পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর পুলিশের কাজ রীতিমতো সহজ হয়ে পড়েছে। আমি মহাদেও আর তার দলের গতিবিধির অনেক খবরই পাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই তার হাতে হাতকড়ি পরাতে পারব। মহাদেও এটা আন্দাজ করতে পেরেছে। কাজেই সে আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে চায়।'

এমন সময়ে কিছু জলখাবার ও চায়ের 'ট্রে' নিয়ে শ্রীধর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে এবং 'ট্রে'-খানা টেবিলের উপরে রাখলে।'

প্রশান্ত স্তম্ভিত চোখে দেখলে, 'ট্রে'র উপরে খাবারের রেকাবি ও পিরিচ পিয়ালার সঙ্গে রয়েছে একখানা নীলরঙের খাম।

সে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আবার নীল চিঠি!'

শ্রীধর গম্ভীর অথচ সহজভাবেই বললে, 'ওই নীল খামখানা ঘরে ঢোকবার দরজার সামনে পড়েছিল।' বলেই চলে গেল।

প্রশান্ত বললে, 'খামের উপরে আমারই নাম। পত্র লেখক কে, তাও বুঝতে পারছি। অরুণবাবু, আপনার বাড়িতে আমি এলেই দীনু কেমন করে জানতে পারে বলুন দেখি?'

—'কে জানে!'

—'সত্যি মশাই, এই নীলপত্রবৃষ্টি দেখে দেখে ক্রমেই আমি শ্রান্ত হয়ে পড়ছি। আর ভালো লাগে না।'

—'আমারও মতে, এ যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

—'এ তো চিঠি নয়, শমন। নতুন বিপদের অগ্রদূত।'

—'চিঠিতে বিপদের কথা না থাকতেও পারে। একবার পড়েই দেখুন না।'

—'দেখি।'

চিঠিখানা এই—

'ভায়া অশান্ত,

তোমার গদাই-লস্করি চাল দেখলে কারুর কোনওদিন সন্দেহ হবে না যে, ব্যাঘ্র-তাড়িত হরিণের মতন কত দ্রুতবেগে তুমি দৌড়তে পারো! আজ আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হল।

একটা পরামর্শ নাও। যতদিন-না মহাদেও ধরা পড়ে, তুমি পদব্রজে পথ চোলো না। আজ কী হত বলো তো? ভাগ্যে আমি আর আমার দুই বন্ধু মহাদেওয়ের চ্যালাদের উপরে লক্ষ রেখেছিলুম, তাই আজ ইহলোকের সঙ্গে তোমার সকল সম্পর্ক ঘুচে যায়নি। গলির ভিতরে ঢুকে তারা একবারের বেশি রিভলভার ছোড়বার অবকাশ পায়নি—আমাদের পাল্লায় পড়ে হয়েছিল পপাতধরণীতলে!

তারপর তুমি আহত হয়েছ কি না জানবার জন্যে ছুটে গিয়ে দেখি, শত শত হস্তের ব্যবধানে কোথায় তুমি—কোথায় আমি! শাবাশ ভায়া, আশ্চর্য তোমার retreat করবার ক্ষমতা! তুমিই বঙ্গবীর!

দীনবন্ধু'

পত্র পাঠ করে প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'অরুণবাবু, দীনুর সঙ্গে দেখা হলে জানাবেন, সে যেন আমাকে আরও-বেশি কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধবার চেষ্টা না করে।'

—'কেন বলুন তো?'

—'কারণ কৃতজ্ঞতা-ঋণ স্বীকার বা পরিশোধ করবার শক্তি আমার নেই।'

—'নেই?'

—'না। আমি সরকারের চাকর। নিমকের মর্যাদা মানি। দীনুকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হাতে পেলে তাকে আমি মুক্তি দিতে পারব না।' এই বলেই প্রশান্ত হঠাৎ উঠে চা ও খাবার স্পর্শ না করেই উত্তেজিত ভাবে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ দশম ॥

মহেন্দ্রনারায়ণ

তমলুক। এখানকার উপপীঠের অধিষ্ঠাত্রী বর্গভীমাদেবীর নাম বাংলা এবং বাংলার বাইরে দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। দেবমূর্তির শত্রু কালাপাহাড়ও বর্গভীমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। এবং পাছে দেবী অসন্তুষ্ট হন সেই ভয়ে বর্গি-দস্যুরা পর্যন্ত কোনওদিন তমলুকে এসেও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপরে অত্যাচার করেনি।

মন্দিরের কাছে রূপনারায়ণ নদ। আগে এখানে 'কপালমোচন' নামে সরোবর ছিল, এখন তা রূপনারায়ণের গর্ভে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজও বারুণীর দিন তমলুকের রূপনারায়ণে অবগাহন করলে কপালমোচন তীর্থস্নানের ফল হয়। তাই ওই সময়ে নানা দেশ থেকে অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ এখানে পুণ্যসঞ্চয় করতে আসে।

দক্ষযজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়ে শিব করলেন দক্ষবধ। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপে দক্ষের মস্তক বা কপাল শিবের হাতে সংলগ্ন হয়েই রইল। শিবের মহা বিপদ! কত তীর্থে ঘুরলেন, কিন্তু সেই অস্বস্তিকর নরকপালের কবল থেকে অব্যাহতি নেই। অবশেষে বিষ্ণুর পরামর্শে তমলুকের সরোবরে এসে স্নান করবার পর শিবের হাত থেকে দক্ষের মস্তক বিচ্ছিন্ন হল এবং সেইদিন থেকে সরোবরের নাম হল 'কপালমোচন'।

এবারে বারুণী উপলক্ষে তমলুকে এসেছেন আসামের এক মস্ত বাঙালি জমিদার, নাম তাঁর মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি। একখানি উদ্যান-সংলগ্ন বাড়ি ভাড়া নিয়ে মাসাধিক কাল তিনি এখানে বাস করছেন।

এর মধ্যেই মহেন্দ্রনারায়ণের অর্থ, দান ও দরাজ হাতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে। তাঁর বাড়িতে রোজ শত শত গরিবের পাতা পড়ে। বর্গভীমাদেবীর মন্দিরে রোজ তিনি পুজো পাঠান অনেক টাকার। স্থানীয় দীনদরিদ্রদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেই তিনি নিজেই ব্যস্ত হয়ে তাদের কুটিরে ছুটে যান এবং সাহায্য করে আসেন মুক্তহস্তে। এক মাসের মধ্যেই তিনি নাকি জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

লোকে বলে, মহেন্দ্রনারায়ণের জামার বোতামে ও হাতের আংটি-দুটিতে যেসব হিরা আছে, তারই মূল্য তিন লক্ষ টাকা।

মহেন্দ্রনারায়ণের সহধর্মিণী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান এবং তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজনও নেই। মৃত্যুর সময়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নাকি দেশের ও দশের হিতে তিনি দান করে যাবেন।

তমলুকে তাঁর সঙ্গে আছে কেবল কয়েকজন কর্মচারী, দারোয়ান ও বেয়ারা।

মহেন্দ্রনারায়ণের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। যেন পাকা আমটি, সুন্দর গৌরবর্ণ। ফোকলা বদনবিবরে একটিমাত্র দাঁতের অস্তিত্ব নেই। বয়সাধিক্যের জন্যে দেহখানি সামনের দিকে দুমড়ে পড়েছে। একমাথা ও একমুখ দীর্ঘ শ্বেত কেশ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এখনও সতেজ। লাঠি না ধরে হাঁটতে পারেন না বটে, কিন্তু বেশভূষায় যুবাজনোচিত শৌখিনতা ও বিলাসিতা আজও তিনি ত্যাগ করতে পারেননি।

বারুণীর দুই দিন আগে তাঁর ম্যানেজার এসে খবর দিলে, এক পুলিশ কর্মচারী দেখা করতে চায়।

পুলিশ কর্মচারীটি আর কেউ নয়, আমাদের প্রশান্ত!

প্রশান্তের পরিচয় পেয়ে মহেন্দ্রনারায়ণ সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি ডিটেকটিভ? কলকাতা থেকে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এতবেশি সৌভাগ্যের কারণ কী?'

—'আপনার সমূহ বিপদ।'

—'বিপদ! কী বিপদ?'

—'আজ রাত্রে আপনি খুন হতে পারেন।'

বিষম উত্তেজনায় বয়সের ভার উপেক্ষা করে বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, কিন্তু

তারপরেই দুমড়ে পড়তে বাধ্য হয়ে আবার আসনগ্রহণ করলেন। দন্তহীন মুখব্যাদান করে ঘাড় নেড়ে, অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'খুন? আমি হব খুন? অসম্ভব! আমার তো শত্রু নেই!'

—'সাধুদের মধ্যে আপনার শত্রু হয়তো নেই। কিন্তু অসাধুরা লোভে পড়লে কারুকে বন্ধু বলে ভাবে না।'

—'এমন অসাধু কে?'

—'মহাদেও মিশিরের নাম শুনেছেন?'

—'না।'

—'খবরের কাগজে পড়েননি?'

—'না। পয়সা খরচ করে মিথ্যেকথা পড়ে লাভ কী?'

—'ঠিক। আমিও মানি। কিন্তু কাগজওয়ালারা মহাদেও সম্বন্ধে ঠিক খবরই দিয়েছে।'

—'এক আনা সত্যের খাতিরে পনেরো আনা মিথ্যাকে সহ্য করা অসম্ভব। মহাদেও মিশির কে?'

—'ডাকাত।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। চারিদিকে দেশে দেশে সে ডাকাতি করে বেড়ায়। ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে খুন না করেও ছাড়ে না।'

—'বাবা!'

—'সেই মহাদেও স্থির করেছে, আজ রাত্রে এই বাড়িতে ডাকাতি করবে।'

—'আপনারা কেমন করে খবর পেলেন?'

প্রশান্ত মুরুব্বিয়ানার চালে রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'পুলিশের খবর পাবার হাজার উপায় আছে!'

খানিকক্ষণ নীরবে ভেবে মহেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আমার এতগুলো দরোয়ান কী করতে আছে? ঘাস কাটতে?'

—'মশাই, মহাদেও আর তার দলের কথা আপনি জানেন না। তারা বন্দুক-রিভলভার নিয়ে ডাকাতি করে, পুলিশকেও তারা গ্রাহ্য করে না। নরহত্যায় তাদের বিকট আনন্দ!'

মহেন্দ্রনারায়ণের মুখে-চোখে ফুটল ভয়ার্ত বিস্ময়ের চমক। কম্পিত, দুর্বল কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তাহলে আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তমলুক ছাড়বার ব্যবস্থা করছি।'

—'সর্বনাশ!'

—'কীসের সর্বনাশ? আমি এখনই পালাব।'

—'আরে পালাবেন কী মশাই?'

—'পালাব না তো বুড়োবয়সে অপঘাতে মারা পড়ব নাকি?'

—'না, না, আপনার পালানো-টালানো হবে না।'

—'দেখুন পালাই কি না। পালাবই পালাব।'

—'মশাই, আপনাকে এইখানেই থাকতে হবে।'

—'বিলক্ষণ। জবাই হবার জন্যে?'

—'আমরা আছি, ভয় কী?'

—'ভরসাই বা কীসের?'

—'আমরা এখানে পাহারা দেব।'

—'কিন্তু মহাদেও যদি পাহারা ভেদ করে আমার কাছে গিয়ে হাজির হয়?'

—'অসম্ভব।'

—'কেন অসম্ভব?'

—'আমার সঙ্গে থাকবে তিন ডজন লোক, সবাই সশস্ত্র।'

—'বুঝেছি, আপনি আমাকে গোরু বা ছাগল রূপে এখানে বন্দি করে রাখতে চান!'

—'মানে?'

—'শিকারে গিয়েছেন?'

—'গিয়েছি।'

—'শিকারিরা বাঘকে লোভ দেখাবার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় একটা গোরু কি ছাগল বেঁধে রেখে দেয়। বাঘ যখন আসে, ছাগলের মনের অবস্থা কী-রকম হয় জানেন?'

—'ও হো, আপনি এই কথা বলতে চান? তা—'

—'ছাগল করে ব্যা ব্যা, বাঘ করে গাঁ গাঁ, শিকারির বন্দুক ডাকে গুড়ুম গুড়ুম তারপর দেখা যায় শিকারির বন্দুক ফসকে গেছে, আর বাঘ সরে পড়েছে ছাগলকে মুখে করে।'

—'ভয় নেই, আমরা আট-ঘাট বেঁধে তৈরি হয়ে থাকব।'

—'সময়ে সময়ে দেখা যায়, শিকারির বন্দুক ফসকায়নি, বাঘ মরেছে—কিন্তু ছাগলকে মেরে। শিকারির লাভ হল, কিন্তু ছাগলের কী লাভ? না মশাই, বুড়োবয়সে আমি ছাগল হতে রাজি নই।'

—'আপনি আমাদের উপরে নির্ভর করুন, আপনার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেব না।'

—'কেন বাজে স্তোকবাক্য শোনাচ্ছেন মশাই? অসুর সংহারের জন্যে দধীচি মুনি নিজের বুকের অস্থি দান করেছিলেন। আমি বড়োজোর অর্থদান করতে পারি, অস্থিদান করবার শক্তি আমার নেই।'

—'আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে অর্থ বা অস্থি কিছুই দান করতে হবে না। আপনি আজ খালি দয়া করে ঘটনাস্থলে হাজির থাকুন।'

তবু মহেন্দ্রনারায়ণ হতাশভাবে ক্রমাগত মাথা নাড়েন এবং থেকে থেকে আরও বেশি দুমড়ে পড়েন। প্রশান্তর আশ্বাস-বাণী শুনে কিছুতেই উৎসাহিত হবার লক্ষণ দেখান না।

অবশেষে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর প্রশান্ত তাঁকে রাজি করাতে পারলে। তখনকার মতন বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত মনে মনে বললে, 'এখনই সব পণ্ড হতে বসেছিল আর কী। বুড়ো থুথুড়ো, শ্মশানের যাত্রী, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও এত মরবার ভয়।'

॥ একাদশ ॥

রাতের অতিথি

রাত। আবার চাঁদ-হারানো মেঘলা রাত—যার নিশ্ছিদ্র কালিমা দেখলে চোর-ডাকাতরা খুশি হয়ে ভাবে, তাদের পরে দেবতাদের করুণার সীমা নেই।

কিন্তু যারা এমন রাতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শিকারে পরিণত হতে অগ্রসর হয়, তারা ভুলেও মনে আনে না যে, এই আঁধারে শিকারিদেরও লুকিয়ে থাকবার সুবিধা আছে কতখানি।

দেবতারা ঘুমন্ত নন, নির্বোধও নন। ধর্মের কল বাতাসে নাড়বার জন্যে এই দেখতে-নিরাপদ অন্ধকারের টোপ ফেলে তাঁরা অসাধুদের গর্তের ভিতর থেকে বাইরে টেনে আনেন।

মফস্‌সলের অন্ধ রাত্রি। শহরে বসে আমরা তার নিবিড়তা অনুভব করতে পারব না যথার্থভাবে। তারই কালো পক্ষপুটের মধ্যে লুকিয়ে উদ্দাম হাওয়া চ্যাঁচায় হত্যাকারী উন্মত্তের মতন, বুড়ো বুড়ো গাছের দল সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করে আর্তনাদ করতে থাকে হিংস্র প্রেতাত্মাদের মতন, প্রকাণ্ড রূপনারায়ণের প্রচণ্ড তরল দেহ বিপুল জলোচ্ছ্বাসে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলে পরলোকের খেয়ায় মৃত্যুদূতের গর্জন-স্বরের মতন।

আরও কত ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি! জাগছে ঝিল্লিদের ঝরঝরে ঝাঁজরা কণ্ঠের কর্কশ ঝি-ঝি-ঝি-ঝি, জাগছে ওঁচা প্যাঁচাদের চেরা গলার চ্যাঁ-চ্যাঁ চিৎকার, জাগছে ব্যাদড়া বাদুড়দের বন্য ডানার ঝটাপট ঝটাপট এবং জাগছে কোন দূরে শ্মশান-শিবাদের পৃথিবী-স্তম্ভিত-করা ক্ষুধিত ক্রন্দন-কোলাহল।

কালো রাতে দিকে দিকে কালো ছায়া, দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত, ভয়ংকরের আবির্ভাব। মানুষ তাই সৃষ্টির আদিম কাল থেকে এই কৃষ্ণা রাত্রিকে অভিনন্দন দিতে রাজি হয়নি। এরই নিষ্ঠুর কবল থেকে উদ্ধার করেন, তাই সূর্যই হয়েছেন মানুষের প্রথম দেবতা।

গভীর রাত যখন ঝিম-ঝিম-ঝিম-ঝিম করে নীরব সুরে কাঁদতে কাঁদতে ঝিমিয়ে পড়েছে, আচম্বিতে মহেন্দ্রনারায়ণের উদ্যানবাটীতে জাগ্রত হয়ে উঠল বিচিত্র এক নাটকীয় দৃশ্যের সাংঘাতিক অভিনয়। এক মুহূর্তে রাত্রির অন্ধ ঘোমটা গেল টুটে, পৃথিবীর সকল বিজনতা গেল ছুটে।

মহাদেওর কাছে তৃতীয়বার ঠকবে না বলে প্রশান্ত আজ সব দিক সামলে অবতীর্ণ হয়েছে ঘটনাক্ষেত্রে।

মহেন্দ্রনারায়ণের বাসাবাড়ির ভিতরে-বাহিরে সে রেখেছিল পুলিশের সেপাইদের সন্তর্পণে লুকিয়ে।

মহাদেওর সাঙ্গোপাঙ্গরা মস্তবড়ো একটা ঢেঁকি নিয়ে যে-মুহূর্তে মহেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির সদর দরজাটা সশব্দে ভেঙে ফেললে, অমনি তারা হল দুই দিক—অর্থাৎ বাড়ির ভিতর-বাহির—থেকে আক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে পেট্রলের লণ্ঠনের তীব্র আলোকে চারিদিকের অন্ধকার হয়ে পড়ল যেন মরণাহত।

ঘন ঘন বন্দুক ও রিভলভারের গর্জন, হুঙ্কার ও আর্তনাদ, গুরুভার দেহপতনের শব্দ, দ্রুত পদধ্বনি!

সকলের মাথার উপরে জেগে আছে সুদীর্ঘ এক দানব-দেহ। ধারালো দাঁত-বার-করা কাটা ঠোঁট, ক্রুদ্ধ সাপের মতন তীব্র-তীক্ষ্ণ-ক্রুর চোখ! দেখলে প্রাণ আঁতকে ওঠে! রিভলভারের গুলিতে, প্রবল পদাঘাতে, লৌহবৎ মুষ্টির তাড়নায় কয়েকজন লোককে ধরাশায়ী করেও সে যখন দেখলে, এদিক-ওদিক থেকে আরও নতুন নতুন শত্রুর আবির্ভাব হচ্ছে, তখন একান্ত নিরুপায়ের মতন পশ্চাৎপদ হল—কারণ তার রিভলভার এখন গুলিশূন্য হয়ে মৃত্যু ছড়াবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রশান্ত উন্মত্তের মতন চিৎকার করে বললে, 'ধর, ধর! ওই মহাদেও, ডাকাতের সর্দার! আগে ওকে ধর!'

মহাদেও তখন এক এক লাফে তিন-চারটে সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে উপরে উঠছে—কেউ তাকে ধরতে পারলে না।

দোতলার বারান্দায় কাঠের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহেন্দ্রনারায়ণ—সেখানে আলো নেই।

মহাদেও তাঁকে দেখতে পেলে না—দেখবার অবসরও ছিল না। সে দোতলার ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ধরে তিরবেগে অদৃশ্য হল। তারপরেই দম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ!

রুদ্ধশ্বাসে প্রশান্ত বারান্দার উপরে এসে উঠল—তার ডান হাতে তখনও ধূমায়মান রিভলভার, বাম হাতে প্রজ্জ্বলিত টর্চ!

টর্চের আলোতে দেখলে, বারান্দার এক কোণে লাঠির উপরে আরও-বেশি দুমড়ে পড়ে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মহেন্দ্রনারায়ণ শিবনেত্র হয়ে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন! প্রায় ভির্মি যাবার অবস্থা আর কী!

প্রশান্ত বললে, 'মহাদেও ওপরে উঠেছে। কোন দিকে গেল সে?'

মহেন্দ্রনারায়ণ জবাব দেবেন কী, একান্ত অসহায় ভাবে মাটির উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, সটান লম্বা হয়ে মূৰ্ছিত হতে আর দেরি নেই।

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি কাছে এসে তাঁকে চাঙ্গা করবার জন্যে বারকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'আরে মশাই, এখন অজ্ঞান-টজ্ঞান হলে চলবে না। মহাদেও কোনদিকে গেল, দেখেছেন?'

তবু মহেন্দ্রনারায়ণের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না, থর থর কম্পিত হাত তুলে উপরে-ওঠবার সিঁড়ির দিকে কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

প্রশান্ত তাঁকে ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে তিন-চারটে সিঁড়ি পেরিয়ে অদৃশ্য হল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন পুলিশের লোক দোতলায় এসে হাজির। মহেন্দ্রনারায়ণ তাঁদেরও পথ দেখিয়ে দিলেন। তারপর মেঝের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু প্রশান্ত উপরে উঠে দেখলে, ছাদের সিঁড়ির চিলের কোঠার দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ!

সে গর্জন করে বললে, 'ভাঙো দরজা!

দুম দুম দুম! পদাঘাতের পর পদাঘাত—পদাঘাতের পর পদাঘাত! মিনিট দেড়েকের মধ্যেই দরজা পড়ল ভেঙে।

প্রকাণ্ড ছাদ—একসঙ্গে সেখানে বসিয়ে হাজার লোক খাওয়ানো যায়। কিন্তু শূন্য ছাদ করছে ধু ধু। সেখানে জনপ্রাণীকে আবিষ্কার করা গেল না।

প্রশান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতন ছাদের উপরে ছুটাছুটি করতে লাগল। কোথায় গেল মহাদেও? হাতের মুঠোর ভিতরে এসেও ফাঁকি দিয়ে পালাল? ছাদের ইটগুলোর ফাঁকে সে কি অদৃশ্য হল কোনও জাদুমন্ত্রবলে? এবারেও অক্ষম হয়ে আমায় কি আত্মহত্যা করতে হবে?

এমনি ভাবনা ভাবতে ভাবতে ছাদের ধারে এসে প্রশান্ত দেখলে, বৃহৎ একটা গাছের মাথা ছাদ ছাড়িয়েও উপরে উঠেছে এবং তারই কতকগুলো মোটা মোটা ডাল প্রায় বাড়ির দেওয়ালকে এসে স্পর্শ করেছে।

এখান দিয়ে পালাবার খুব সুবিধা! প্রশান্ত হেঁট হয়ে নীচের দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখবার চেষ্টা করলে।

ঝুপসি গাছ, তার তলদেশ চোখের আড়ালে। টর্চের শিখাও সেখানে পৌঁছায় না।

কিন্তু গাছের তলা থেকে একটা সন্দেহজনক শব্দ তার কানে এল। সেখানে কারা যেন ধস্তাধস্তি করছে! কে যেন কঠিন স্বরে কথা কইছে!

প্রশান্ত আর দাঁড়াল না। 'সবাই আমার সঙ্গে এসো' বলে বেগে ছুটে সিঁড়ি ধরে আবার নীচের দিকে নামতে লাগল।

ওদিকে মহাদেও ছাদ থেকে গাছের উপরে গিয়ে পড়ল এবং তারপর তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নেমে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল—

—এবং সঙ্গে সঙ্গে দু-খানা পাথরের মতন কঠিন বাহু তাকে প্রায় যেন লুফে নিলে!

তার বিস্ময়ের প্রথম চমক ছোটবার আগেই ভয়ংকর এক আঘাতে সে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল আচ্ছন্নের মতন। সে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ক্ষীণভাবে অনুভব করলে, অত্যন্ত কৌশলী ও দ্রুত হস্তে কে যেন হাত ও পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলছে! মুহূর্ত-পরেই তার আচ্ছন্ন ভাব গেল ছুটে। তাড়াতাড়ি সে ওঠবার চেষ্টা করলে, পারলে না!

অন্ধকারেই কে চাপা গর্জন করে বললে, 'চুপ করে শুয়ে থাক। তুই আমার বন্দি!'

মহাদেও দাঁত ঠোঁট কামড়ে বাঁধন ছেঁড়বার জন্যে বৃথা চেষ্টা করতে করতে বললে, 'কে তুই?'

—'যম! তুই আমার সুনামে কালি দিতে চেয়েছিলি তাই আজ তোর এই দুর্দশা!'

—'কে তুই? কে তুই?'

—'পুলিশের কাছে প্রথম তোর খবর পাঠিয়েছিলুম আমিই! গঙ্গার বুকে গোয়েন্দা প্রশান্তকে তোর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলুম আমিই। তোর বুকে লাথি মেরে তোকে জলে ফেলে দিয়েছিলুম আমিই। তোর আস্তানায় বন্দি হয়েও তোকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে ছিলুম আমিই। তমলুকে এসে তুই লুকিয়ে আছিস খবর পেয়ে প্রশান্তকে এখানে ডেকে এনেছি আমিই! আর আজ তোকে শিশুর মতন কাবু করেছি আমিই!'

মহাদেও দাঁত কড়মড় করতে করতে বললে, 'কে তুই? তোর নাম কী?'

—'আমার নাম দীনুডাকাত।'

বিপুল বিস্ময়ে ভয়ানক চমকে আবার ওঠবার চেষ্টা করতে করতে মহাদেও বললে, 'কী। কী বললি?'

—'আমি দীনুডাকাত! আমার নাম নিয়ে তুই ছেলেখেলা করেছিস, তাই তোর এই দুর্দশা!... ওই প্রশান্ত আসছে! আমি চললুম—তোর ফাঁসিকাঠের দোলনার ব্যবস্থা করে!'

দীনুডাকাতের মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল—প্রাণপণে চিৎকার করে মহাদেও বলে উঠল, 'দীনুডাকাত পালায়! ধর, ধর—দীনু ডাকাত পালায়!'

প্রশান্ত হন্তদন্তের মতন ছুটে এসে সচমকে বললে, 'কে? কে পালায়?... ...আরে, এই যে মহাদেও! কী আশ্চর্য, এর হাত পা যে বাঁধা!

মহাদেও বিষম চিৎকার করে বললে, 'দীনুডাকাত—দীনুডাকাত! আমার এ-দশা করবার শক্তি আছে কেবল দীনুডাকাতের!'

প্রশান্ত হতভম্বের মতন বললে, 'এখানেও দীনুডাকাত?'

মহাদেও ছটফট করতে করতে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুই প্রশান্ত গোয়েন্দা তুই তো ছার পতঙ্গ, তোর সাধ্য কি যে আমার মতন মাতঙ্গকে ধরিস? আমাকে ধরেছে দীনুডাকাত!'

প্রশান্ত বললে, 'কোথায় তোর দীনুডাকাত?'

—'ওইদিকে পালিয়েছে!'

—'কোন দিকে?'

—'ওইদিকে। দীনুডাকাতের সঙ্গে যদি ফাঁসিকাঠে চড়তে পারি সে আমার সৌভাগ্য!'

প্রশান্ত ভয়ংকর চটে উঠে বললে, 'কী বললি তুই হারামজাদা? তোর সঙ্গে দীনুডাকাত চড়বে ফাঁসিকাঠে? আকাশের চাঁদ নামবে জোনাকির পাশে?'

মহাদেও টিটকিরি দিয়ে বললে, 'আরে কেয়াবাত—কেয়াবাত! দীনুডাকাত বলতে যে অজ্ঞান দেখছি! সে কত ঘুষের টাকা দেয়? আমি তার ডবল টাকা দেব—আমার হাতপায়ের দড়ি খুলে দাও দেখি মানিক!'

মহাদেওয়ের মুখের উপরে সজোরে এক পদঘাত করে প্রশান্ত চেঁচিয়ে বললে, 'এই সেপাইরা! হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? খোঁজ—খোঁজ—দৌড়ে যা, ধরে আন দীনু-ডাকাতকে! যে দীনুডাকাতকে ধরতে পারবে, আমি নিজে তাকে দু-হাজার টাকা বকশিশ দেব! একসঙ্গে দীনু আর মহাদেও! এদের দুজনকে যদি কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি অমর হব!'

সেপাইরা বন্দুক আন্দোলন করে বিপুল উৎসাহে ছুটে গেল দিকে দিকে।

কিন্তু প্রশান্ত কিছুমাত্র আশ্বস্ত হল না। নিজের মনে-মনেই বললে, 'হাতের মুঠোর ভেতরে পেয়েও যাকে বারে বারে হারাই, সেই দীনুডাকাতকে ওরা ধরবে? ধ্যেৎ, আমার কেবল পুরস্কার ঘোষণাই সার!

হ্যাঁ, প্রশান্তর অনুমান মিথ্যা নয়, তার কেবল পুরস্কার ঘোষণাই সার হল, দীনুডাকাতের পাত্তা মিলল না।

কিন্তু পরদিনই ডাকযোগে দীনুর বদলে এল দীনুর এক পত্র। সেই নীল চিঠি।

পত্রের ভাষা এই:

'অশান্তভায়া,

আমার বাক্যরক্ষা করেছি। তোমার করকমলে মহাদেওকে দিয়েছি উপহার। সাবধান, সে যেন তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ না দেখায়।

প্রস্তুত হয়ে থাকো। নকল দীনু ধরা পড়ল। এইবারে আসল দীনবন্ধু করবে আত্মপ্রকাশ। এবারে আমি তো আর তোমাকে সাহায্য করব না, দীনবন্ধুর দিকে তোমার পঙ্গু বাহু বিস্তার করে তাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে তো?

গর্দভিরাজ, তুমি গতকল্যও আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছিলে, এমন সন্দেহ তোমার হয়েছে কি?

তুমি অন্ধ। বার বার আমাকে সামনে পেয়েও দেখতে পাওনি। বুড়ো জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণকে জানো? সে আমি। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলে বোধহয়?

ফোকলা মহেন্দ্রনারায়ণের ভূমিকায় আমার অভিনয় নিশ্চয়ই নিতান্ত মন্দ হয়নি? 'স্টেজে' নামলে আমি যে শিশির ভাদুড়ীর চেয়ে কম নাম কিনতুম না, এ সম্বন্ধে তুমি আমাকে একখানি প্রশংসাপত্র দিলে পরম আনন্দিত হব। দেবে?

আমার আসল চেহারার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তুমি হয়তো চিনতে পারতে, কী বলো? কিন্তু আসল চেহারা আমি কারুকে দেখাই না।

চরের মুখে খবর পেয়েছিলুম, কলকাতার পুলিশকে অত্যন্ত জাগ্রত দেখে মহাদেও এসে লুকিয়েছিল তমলুকে। আমি জানতুম, 'স্বভাব না যায় মলে'। মহেন্দ্রনারায়ণের মতন একটা মস্ত এবং সুলভ শিকারকে হাতের কাছে হাজির দেখলে মহাদেও লোভ সংবরণ করতে পারবে না কিছুতেই।

যা ভেবেছিলুম, তাই। আমার সাহায্যে তোমার মতন তৃতীয় শ্রেণির গোয়েন্দার গৌরববর্ধন করবার জন্যে সে যেচে দিয়েছে ফাঁদে পা। অতএব, জয় অশান্ত-গোয়েন্দার জয়।

আশা করি, এর ফলে হবে তোমার পদ-বৃদ্ধি—যদিও চতুষ্পদের পদবৃদ্ধি আমি পছন্দ করি না। ইতি

দীনবন্ধু'

পত্র পাঠ করে প্রশান্তর কণ্ঠদেশ বিশুষ্ক হয়ে গেল সাহারার মতন। অস্থির কণ্ঠে সে হাঁকলে, 'জল। শিগগির এক গেলাস জল।'